শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম-জীবনী

অলোক রায়
অশোক উপাধ্যায়
সম্পাদিত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১৩১৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২২
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৮
চতুর্থ সংস্করণ ১৩৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স

মুদ্রক
অরুণকুমার হেঁস (মণ্টু)
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত রচনা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য ও যথার্থ জীবনী আজও লেখা হয় নি। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য কেউ সংগ্রহ করে রাখলে পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা সম্ভব হতো। কিন্তু জীবিতকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চরিত রচনায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন,

> আমি বলিলাম, 'আমার ইচ্ছা, আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি?' বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা ত সহজ নহে! জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়।' ('বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯৩-৯৪)।

বলাবাহুল্য, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 'নোট' নেওয়ার সুযোগ পান নি। অন্যদিকে একাধিক জন তাঁদের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তাঁর মৃত্যুর অনতিপরে জীবনী রচনা করতে নিষেধ করেন এবং তিনি চেয়েছিলেন দৌহিত্রদের মধ্যে কেউ তাঁর জীবনী রচনা করে—

> The most important matter which I have got to communicate to others is the fact that when on the 6th of April, but two days before he breathed his last, I met Bankim in his bedroom he confided to me the request, 'let not my biography be written by anyone except one of my two grand-sons'. I am not aware what may have led him to entertain a feeling of this kind; but I can only express my hope that if my countrymen have any

regard for Bankim they will religiously observe the injunction. (Jogendrachandra Ghosh, 'In Memory of Bankim Chandra Chatterjee', April 27, 1894, দ্র. বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত বঙ্কিম-কণিকা, ১৩৪৮, পৃ. ৪৪)

মাতামহদের স্বর্গারোহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লেখে। ঠিক দ্বাদশবৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, দেশের লোক তখন হইতে সেই সাহিত্য-সম্রাটকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষিজ্ঞানে অধিকতর ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে মহাপুরুষ কি উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনচরিত দ্বাদশবর্ষ লিখিতে নিষেধ করিয়া যান, সে রহস্য সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা কঠিন,...আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল।...তাঁহার স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে আমাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে কিছু বিলম্ব আছে। (দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-চরিত', বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), আষাঢ় ১৩১৮, পৃ. ১৮৫)।

কিন্তু দীর্ঘদিনের ব্যবধানে জীবনচরিত রচনার যেমন বহু উপাদান বিনষ্ট হয়েছে, তেমনি দৌহিত্রদের মধ্যে কেউই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিস্তৃত জীবনচরিত' লিখে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের তথাকথিত 'স্বরচিত আত্মচরিত' প্রকাশিত হলেও পরবর্তী জীবনীকারের সুবিধা হতো, কিন্তু সেই আত্মচরিতের স্বরূপ ও অস্তিত্ব নিয়েই নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দিব্যেন্দুসুন্দর বঙ্কিমের 'স্বরচিত আত্মচরিতে'র কথা বলেছেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী রচনাকালে জানিয়েছেন,

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়াছে যে তিনি নাকি আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন। একথা সত্য নহে। তিনি জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা গল্পচ্ছলে বলিতেন। তাঁহার বড় জামাতা 'প্রচার' সম্পাদক স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা অবলম্বন করিয়া একখানি জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য অতঃপরে রাখালবাবুর পুত্রগণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। হেমেন্দ্রবাবু কতদূর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অসমাপ্ত হস্তলিখিত পুস্তকখানি মহানুভব হেমেন্দ্রবাবু আমাকে দিয়া চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করিয়াছেন। যদিচ ইহার কোন কোন ঘটনা শচীশবাবুর পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এই খাতাখানির মূল্য খুবই বেশি।

শরৎকুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পূজ্যপাদ মাতামহ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ('প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৬৮, পৃ. নয় আনা-দশ আনা)।

কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে অন্যত্র মন্তব্যসহ এই ধরনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন,

বঙ্কিম নিজেও স্বরচিত জীবনাখ্যানে লিখিয়াছেন—'যেদিন বারুইপুর হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করি, আমার জীবনের প্রথম অঙ্কের এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অঙ্কের যবনিকা পতিত হয়। আমার জীবনে এমন দিন আর কখনও ফিরিয়া আসে নাই।' (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১৩১)

তখন বোঝা যায় না, কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের 'লেখা', না রাখালচন্দ্রের 'লেখা'। আবার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিণত বয়সে মতিলাল দাশকে বলেন,

আত্ম-চরিত বলে যেটি সাধারণে প্রচার সেটি একেবারেই আত্ম-চরিত নয়; আমি তা দেখেছি এবং পড়েছি আর তার থেকে সার-সংকলন করেছি। সেটা ইংরেজীতে ফুলস্ক্যাপ কাগজে হাফ-মার্জিনে লেখা, তাতে কয়েকটা philosophical thesis আছে এবং তাঁর জীবনের কয়েকটি বড় বড় ঝগড়ার কথা আছে। তাতে নফর ভট্ট মুন্সেফের সঙ্গে ডারুইনতত্ত্ব নিয়ে ঝগড়ার কথা, কর্ণেল ডাফিনের সঙ্গে বিবাদের ইতিহাস—বাকল্যাণ্ডের সঙ্গে কলহ-বৃত্তান্ত, হেম কর ও রামশঙ্কর সেনের সহিত মনোমালিন্যের গল্প আছে। (মতিলাল দাশ, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', বঙ্গশ্রী, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ. ৪০৯)।

'আত্মচরিত' হোক বা না হোক, জীবনের কয়েকটি ঘটনা এবং 'philosophical thesis' তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজী'তে কোনো সময়ে লিখেছিলেন। একে আত্মচরিতের খসড়া বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু এর সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের উদ্ধৃত 'বাংলা'য় 'স্বরচিত সংক্ষিপ্ত জীবনাখ্যান'কে মেলানো যায় না।

দিব্যেন্দুসুন্দর যে আত্মচরিতের কথা বলেন তার সন্ধান আজও মেলে নি। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একজন দৌহিত্র (নীলাব্জকুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র) নীলাদ্রিনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন,

পূজ্যপাদ দাদামহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র কোন আত্মজীবনী লিখিয়া যান নাই। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ জুলাই ১৯৩৮, ২২ আষাঢ় ১৩৪৫)।

শচীশচন্দ্রের বক্তব্য সত্য হলে, বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজী'তে সামান্য কিছু অংশ লিখেছিলেন, কিন্তু সেই অংশটুকুও মুদ্রিত না হওয়ায় আত্মচরিতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রও খুব বেশি রক্ষিত হয় নি, অন্তত বেশকিছু চিঠি যে চিরতরে বিলুপ্ত সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। শচীশচন্দ্র নাকি মতিলাল দাশকে বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি চিঠি তাঁর আছে, কিন্তু "সেগুলিকে আমি পুড়িয়ে ফেলব, কিছুতেই কাউকে দেব না।' (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃ. ৪০৮)। এইভাবে বঙ্কিম-জীবনী রচনার বহু উপাদান ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে অথবা তাঁর আত্মপরিজনেরা নষ্ট করেছেন।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, কোনো একদিন তাঁর জীবনী লেখা হবে, এবং তখন তথ্যের অভাবে তার মধ্যে স্থান পাবে নানা জনশ্রুতি ও কল্পিত-জল্পনা। মৃত্যুর পর বারো বছর বা তিরিশ বছরের (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'বিশ্বস্তসূত্রে অবগত' হওয়া) মধ্যে জীবনী লিখতে নিষেধ করার সংগত কারণ আমরা বুঝতে পারি না। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লেখার সময়ে (দীনবন্ধুর মৃত্যুর তিন / চার বছর পরে লেখা) ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন,

> দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে, কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রযোজন হয়, কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইয় অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই;—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে। ('রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী': ১৮৭৭, দ্র. বিবিধ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩১০, পৃ. ৭৯)।

কিন্তু 'প্রকৃত জীবনচরিত' না হলেও তিনি দীনবন্ধু বা সঞ্জীবচন্দ্রের (মৃত্যুর চার বছর পরে) 'জীবনী' লিখেছেন, যা পরবর্তীকালে ঐ দুজনের জীবনী রচনায় প্রভূত সহায়তা করেছে। অন্যদিকে দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে, এবং সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষেত্রে এ কথা পুরোপুরি সত্য,

> তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য। ('৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী': ১৮৯৩, দ্র. বিবিধ, পৃ. ১৪৮)।

ভূমিকা

জীবনী রচনার জন্য কিছুটা কালগত ব্যবধান প্রয়োজন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনা 'সবিশেষ জানে' এমন ব্যক্তির পক্ষে জীবনচরিত লেখা কাম্য।

তবে জীবনচরিত বলতে বঙ্কিমচন্দ্র 'জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতি মাত্র' বোঝেন না। তিনি জীবনচরিতের মধ্যেও লেখক বা কবির 'অন্তর্জীবন প্রকটনে যত্নবান' হয়েছেন। (অবশ্য যেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা, সেখানে অন্তর্জীবন প্রকটনও সম্ভব নয়)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী রচনাকালে তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

> কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ('ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব': ১৮৮৫, দ্র. বিবিধ, পৃ. ১৩১)।

বঙ্কিমচন্দ্র এই 'উদ্দেশ্য' নিয়েই দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে তাঁর জীবনী আজও লেখা হয় নি।

প্রমথনাথ বিশী অত্যন্ত সংগত কারণেই 'বঙ্কিম-সরণী'র সূচনায় মন্তব্য করেন,

> বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য জীবনী এ পর্যন্ত লিখিত হল না। অবশ্য জীবনী নামে অনেক গ্রন্থ আছে, তাদের মূল্য অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, কোনোখানিই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবনের যোগ্য নয়। এ সব গ্রন্থের অধিকাংশই হয় তথ্য ও ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ, নয় অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য গালগল্প ও কিংবদন্তীর সংগ্রহ। কোন লেখকের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত না করেও নিরপেক্ষ পাঠক বলতে বাধ্য হবে যে, প্রচুর তুষের মধ্যে কখনো কখনো সত্যের দানা আছে সত্য, কিন্তু সে সব এতই অল্প যে, সমস্ত সংগ্রহ করলেও মুষ্টিমেয় হবে কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়ার

পক্ষে সে মুষ্টিমেয় দানা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। (বঙ্কিম-সরণী, ১৩৪৫. পৃ. ১)।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্র (দ্র. গোপালচন্দ্র রায়, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৪৫) এ পর্যন্ত যা মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে তাঁর যথার্থ সত্য-পরিচয় মেলে না। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লেখার সময়ে তিনি সামান্য বংশপরিচয় দিয়েছেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারে আছে পড়াশোনার কিছু খবর আর সরকারি নথিপত্রে আছে চাকরির বিবরণ। এ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী সংকলন করা সম্ভব (যার সূচনা 'শনিবারের চিঠি'র বঙ্কিম সংখ্যায়, আষাঢ় ১৩৪৫, জুন ১৯৩৮) কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'যোগ্য জীবনী' লেখা দুরূহ।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথা এক হিসাবে খুবই মূল্যবান, যেমন 'নারায়ণ' পত্রিকার বঙ্কিম-স্মৃতিসংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২২) প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ললিতচন্দ্র মিত্র, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, কিংবা তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' [১৯২২] পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নতুন কয়েকটি রচনার সঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, কালীনাথ দত্তের প্রবন্ধ। এ ছাড়া নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তাঁদের স্মৃতিকথায় কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে যা লিখেছেন, তার মধ্যে 'নখদর্পণে বিম্বিত' জীবন্ত মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা হলেও তাঁর জীবনী লেখার বিশেষ চেষ্টা হয় নি (বিরল ব্যতিক্রম বলেই 'সখা' পত্রিকায় ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা উল্লেখ-যোগ্য)। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৬৮-১৯৪৪) 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত' (১৩১৮) গ্রন্থটি এক হিসাবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার প্রয়াস। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় (১৩২২) এবং তৃতীয় (১৩৩৮) সংস্করণে শুধু তার আকার বৃদ্ধি ঘটে নি (তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থের নামান্তরও ঘটেছে), নতুন অনেক তথ্যের সংযোজনে বইটি ক্রমে বঙ্কিম-চর্চায় অপরিহার্য পরিগণিত হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ কালে মূল গ্রন্থের পাঠ (তৃতীয় সংস্করণ) অপরিবর্তিত রেখে গ্রন্থের পরিশিষ্টে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নবাবিষ্কৃত অনেক তথ্য এবং সংশোধিত হয়েছে শচীশচন্দ্রের কিছু ভ্রম-

ভূমিকা

প্রমাদ [দ্র. প্রাসঙ্গিক তথ্য]

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শচীশচন্দ্র পিতৃব্যের জীবনী রচনার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। পিতা এবং খুল্লতাতদের কাছ থেকে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের কিছু ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শীও বটে। পারিবারিক চিঠিপত্র দেখার সুযোগও ছিল তাঁর বেশি। সর্বোপরি শচীশচন্দ্র নিজের সামর্থ্যানুযায়ী সাহিত্যসৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে তিনি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লেখেন তখন অনেকেই গ্রন্থটিকে স্বাগত জানান।

শচীশচন্দ্র একাধিক উপন্যাস লিখলেও, পরবর্তীকালে তাঁর খ্যাতি নির্ভর করেছে 'বঙ্কিম-জীবনী'র উপর। বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখা তিনটি সংস্করণে ক্রমশ সংশোধিত ও সংযোজিত 'বঙ্কিম-জীবনী' সেকালের চরিতসাহিত্যের ধারায় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে গ্রন্থ পরিকল্পনার মৌলিক ত্রুটি তৃতীয় সংস্করণেও দূর করা সম্ভব হয় নি। আসলে যা শুরু হয়েছিল 'বঙ্কিম-কাহিনী' হিসাবে, পরে তা বঙ্কিমজীবনী ও সাহিত্যালোচনায় রূপান্তর লাভ করায় গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হয় নি। একদিকে 'জীবনী' অংশটি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণতা পায় নি, তেমনি অন্যদিকে পরবর্তী অংশও গ্রন্থে অপরিহার্য বিবেচিত হয় না। প্রথম সংস্করণে শচীশচন্দ্র জানিয়েছিলেন,

> অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যে জিনিসটা শেষে দেওয়া উচিত, তাহা আমি মধ্যে দিয়াছি; যে গল্পটা গোড়ায় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমায় বাধ্য হইয়া শেষে দিতে হইয়াছে। আমি যথাস্থানে সকল জিনিস সাজাইতে পারিলাম না। তা'ছাড়া 'কাহিনী' স্বতন্ত্রভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।...'জীবনী' যদি কখনও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে 'কাহিনী'কে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'বঙ্কিম-কাহিনী'র সূচনা গ্রন্থারম্ভে স্থান পেয়েছে, শুধু শেষ দুটি অনুচ্ছেদ বর্জিত। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, বিবাহ, দুর্গেশনন্দিনী রচনা প্রভৃতি ছাব্বিশটি প্রসঙ্গ 'বঙ্কিম-কাহিনী'তে স্থান পেয়েছে। পরে সেগুলি জীবনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও গ্রন্থের শেষে নতুন অনেক কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে, যেমন 'ক্রীড়ক বঙ্কিমচন্দ্র', 'ক্রোধী বঙ্কিমচন্দ্র', 'সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি। কিন্তু এইসব অংশে গল্পকথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল ও বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে নি।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শচীশচন্দ্র লিখেছেন,

> বিশ বৎসর পূর্বে যখন আমি সপ্তমীতে প্রথম অর্ঘ্যদান করি, তখন বলিয়া-

ছিলাম, পূজা করিবার আমার সাধ আছে, কিন্তু উপকরণ নাই। এখনও যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না; তবে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কতকগুলি নূতন কথা, তথ্য ও প্রবন্ধ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ সংগ্রহ করলেও শচীশচন্দ্র কোনোদিনই প্রতিমায় প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি, ফলে চরিতকারের প্রাণে 'ভক্তি' থাকলেও তাঁর 'মহাপূজা' সার্থকতা লাভ করে নি। অবশ্য হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি (১৭.১২.৩৮) থেকে মনে হয় 'উপাদান' সংগ্রহই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—'জীবনী' রচনা নয়—

বঙ্কিম-জীবনী লিখিবার উপযুক্ত পাত্র আপনি, আমি যেখানি লিখিয়াছি সেখানি জীবনচরিত নয়, জীবনীর উপাদান মাত্র। সেখানি লেখা না থাকিলে আজ কেহ যে জীবনচরিত লিখিতে পারিতেন তাহা মনে হয় না। আপনি বঙ্কিম-জীবনী লিখুন। (দ্র. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১৩৬৮, পৃ. ।।০)।

তবে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আমরা দেখি শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী' কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার যখন লেখেন,

বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়, অনাত্মীয় নব্যলেখকেরা বঙ্কিমচরিত লিখিবার সময়, একটু দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত যেন লেখনী চালনা করেন। আমরা কল্পনা-প্রিয় জাতি, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমরা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না,—এইরূপ একটা জাতীয় বা বিজাতীয় কলঙ্ক যে আমাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে, বঙ্কিমবাবুর মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কনে, সেই কলঙ্ক যেন স্পষ্টীকৃত করা না হয়। (দ্র. 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৮ পৃ. ৫০৫)

তখন শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনীর' কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা না হলেও তার প্রতি ইঙ্গিত অস্পষ্ট ছিল না (১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের তথ্যবিচ্যুতির তীব্র প্রতিবাদ অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধে আছে)। তারকনাথ বিশ্বাস যখন 'বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা' (১৩২৬) লেখেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শচীশচন্দ্রের লেখায় যে সব 'ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়' তার প্রতিবাদ করা। গ্রন্থের সূচনায় তিনি লেখেন,

বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর একটি জনরব উঠিয়াছিল যে, তিনি স্বীয় জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা একটি নির্দিষ্ট সময় গত না হইলে প্রকাশিত হইবে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত ছিলাম। তাহার পর দেখিলাম, তাঁহার সুযোগ্য

ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। ভাবিলাম, ঘরের ছেলে ঘরের অনেক কথাই অবগত ; সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবুকে সাধারণে ভাল করিয়া জানিবে ও চিনিবে। কিন্তু কৈ, পুস্তক মধ্যে সেই সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে ত ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রকে।...সত্য বটে বঙ্কিমবাবুর উদ্দীপ্ত যৌবনকালের কথা শচীশবাবুর জানা অসম্ভব, কেননা কোথায় থাকিতেন তিনি, আর কোথায় থাকিতেন বঙ্কিমবাবু ; সুতরাং অনেক বিষয়ে তাঁহাকে বঙ্কিমবাবুর বন্ধু বান্ধব বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহার উপর, শোনা কথার উপর আবার তিনি স্থানে স্থানে অযথা বর্ণ বৈচিত্র্য সম্পাদনে আসল খাস্তা করিয়া ফেলিয়াছেন। ('বঙ্কিমবাবুর জীবন-কথা', তারকনাথ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩২৬, পৃ. ২৫৯)।

অবশ্য তারকনাথের থেকে আরও কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন অমলচন্দ্র হোম। লক্ষণীয়, তারকনাথের রাগের কারণ দিগম্বর বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন, অমলচন্দ্রের রাগের কারণ কালীনাথ দত্ত সম্বন্ধে শচীশচন্দ্রের মন্তব্য। অমলচন্দ্র হোমের মতে,

সাহিত্যসম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি তাঁহার পিতৃব্যদেবের 'জীবনী' প্রকাশ করিয়াছেন। এই জীবনীতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট। কর্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মময় জীবন যে ঘটনাবহুল হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশেই কোন মহাপুরুষের মহত্ত্ব ও জীবন লোকচক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে না ; বিশেষতঃ যদি জীবনী-সন্নিবিষ্ট ঘটনাগুলির মধ্যে কোন একটা শৃঙ্খলা না থাকে। এইরূপ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাঠ করিয়া জীবনী বর্ণিত ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা জানা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এমন করিয়া জানাকে যে তাঁহাকে ঠিক জানা হইল এ কথা কোন প্রকারেই বলা যাইতে পারে না।...আমরা আশা করিয়াছিলাম গ্রন্থকার শচীশবাবু ভিতরের দিক হইতেই আমাদের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দিবেন। কিন্তু তিনি তেমন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই। ক্ষোভ এই যে, তাঁহার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হইল না ; বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের অনেক ঘটনা জানিলাম বটে কিন্তু তাঁহার যথার্থ মূর্তি আমাদের নিকট প্রকাশ হইল না। (জাহ্নবী, চৈত্র ১৩১৮, পৃ. ৩৮১)

তারপর শচীশচন্দ্রের তথাকথিত রচনা-'পদ্ধতি'র ত্রুটি, বক্তব্যগত এবং তথ্যগত

ভ্রান্তি প্রদর্শন।

বলাবাহুল্য, এই ধরনের সমালোচনা সত্ত্বেও 'বঙ্কিম-জীবনী'র উপযোগিতা হ্রাস পায় নি। বরং দেখা গেছে, প্রথম সংস্করণ গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় সাতাত্তর বছর পরে সার্থকতর বা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বঙ্কিম-জীবনী আজও রচিত হয় নি। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সার্ধজন্মশতবর্ষ পালনকালে শচীশচন্দ্রের গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন।

আমরা শচীশচন্দ্রের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীর তিনটি সংস্করণের ভূমিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে স্থাপন করেছি। বিভিন্ন সংস্করণের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয়—

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কলিকাতা, ইউনিভার্সাল লাইব্রেরি। বঙ্গাব্দ ১৩১৮। মূল্য দুই টাকা। ১২+৪৫৮+৮০ পৃষ্ঠা। [উৎসর্গ] বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালীর হাতে অর্পণ করিলাম।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন চরিত। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি। [দ্বিতীয় সংস্করণ] বঙ্গাব্দ ১৩২২। মূল্য তিন টাকা। [১৬+৮৬৪ পৃষ্ঠা। উৎসর্গ। সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা (সেন)। ব্রজসুন্দর, আমার এ পূজার নির্মাল্য তোমায় দিয়া তৃপ্তি—তাই তোমায় দিলাম। তোমার শচীশ।

বঙ্কিম-জীবনী। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কলিকাতা, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স। [তৃতীয় সংস্করণ]। আষাঢ় ১৩৩৮। তিন টাকা। ৮+৫১৯ পৃষ্ঠা। উৎসর্গ। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালীর হাতে অর্পণ করিলাম। শচীশ।

'হুগলী কলেজ রেজিস্টার' (১৯৩৬) থেকে আমরা জানতে পারি, শচীশচন্দ্রের জন্ম ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আদালতে সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার পদ লাভ করেন। সাব রেজিস্ট্রার পদ থেকে অবসর গ্রহণ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। নিতান্ত তরুণ বয়সে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তারপর কিছুদিন সাহিত্যসাধনায় বিরতি। মধ্যবয়সে আবার নতুন উদ্যমে লিখতে সুরু করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর শচীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'শোক-সংবাদ' থেকে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা জানতে পারি—

গত সোমবার ১১ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টার সময় [২৬শে ভাদ্র ১৩৫১]

ভূমিকা

৺বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। শচীশচন্দ্র বাঙ্গালা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ও সুসাহিত্যিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। 'হিন্দু-মুসলমান', 'মতিঝিল', 'হীরাঝিল' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় শচীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। শচীশচন্দ্র আজীবন বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিম-জীবনী, রাজা গণেশ, বীরপূজা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, ২৯ ভাদ্র ১৩৫১, বৃহস্পতিবার, পৃ. ৫, তৃতীয় স্তম্ভ)।

অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত শোক-সংবাদ, দ্র. মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৫১, পৃ.৫১০ ; ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৫১, পৃ. ৩৫৫)।

নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করলেও শচীশচন্দ্র ছিলেন মুখ্যত ঔপন্যাসিক। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে দেখে মনে হয়, ইতিহাসচর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। অধুনা বিস্মৃত, কিন্তু একদা জনপ্রিয় শচীশচন্দ্রের এই কয়টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—

জীবনীমূলক উপন্যাস : শ্রীসনাতন গোস্বামী (১৯২৪), মহাত্মা তুলসীদাস (১৯২৫)।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : বীরপূজা (১৯০৫), বাঙ্গালীর বল (১৯০৬), রাজা গণেশ (১৯০৯), রাণী ব্রজসুন্দরী (১৯১৮), মেঘমালা (১৯৩৭ ?), দেবপতি (১৯৩৭ ?)।

গার্হস্থ্য উপন্যাস : বঙ্গসংসার (১৯০৭), নীরদা (১৯০৮), বারি-বাহিনী (১৯১৯), বেলমতিয়া (১৯২৬), অমরনাথ (১৯২৯ ?), প্রণবকুমার।

ভ্রমণমূলক উপন্যাস : কুঞ্জের ঝঙ্কার।

ইতিহাস : য়ুরোপে মহাযুদ্ধ, ১৯০০-১৯১৯ খৃষ্টাব্দ (১২৩৭ ?)।

জীবনী : বঙ্কিম-জীবনী (১৯১১)।

বিবিধ : ভীষণ কুমারী (১৮৮৩), পূজার মালা (১৯১১ , পত্নী সুরেশ্বরী দেবী রচিত কয়েকটি গল্প ও স্বরচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন)।

গ্রন্থাবলী : বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির থেকে প্রকাশিত শচীশ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড— বীরপূজা, প্রণবকুমার, রাজা গণেশ, বারি-বাহিনী। দ্বিতীয় খণ্ড—বাঙ্গালীর বল, অমরনাথ, মহাত্মা তুলসীদাস, শঙ্করনাথ, অন্তরীণের বধূ, সরলা, বিল্বতনয়া। (শেষ চারটি উপন্যাস সম্ভবত স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি)।

গ্রন্থসম্পাদনায় আমার সহযোগী শ্রীঅশোক উপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'র পাঠনির্ধারণ, মুদ্রণ-সংশোধন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যসংগ্রহের অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তথ্যসংগ্রহে সহায়তা করেছেন ড. স্বপন বসু, ডঃ দেবাশিস বসু, শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলকুমার পাল ও শ্রীদেবব্রত বসু। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যাপত্র ও প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘরের (রাজশাহী, বাংলাদেশ) সহকারী পরিচালক ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির কর্মী শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গ-পত্রের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন। নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীঅমিত রায়, শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, ড. বারিদবরণ ঘোষ, শ্রীবিনয়ভূষণ রায়, শ্রীমৃদুলকান্তি বসু, শ্রীমোহিত রায়, শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য। নির্দেশিকা রচনায় ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আমার অন্যতম সহায় ছিলেন শুভ্রা রায়, শুক্লা দত্ত এবং অনুপরঞ্জন চক্রবর্তী। খ্যাতনামা শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা বঙ্কিমের একটি প্রতিকৃতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সংরক্ষিত। ওই প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে তৈলচিত্রটির একটি ফটো মুখপত্রে মুদ্রিত হলো। সকলকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

১৩ আষাঢ় ১৩৫৯

অলোক রায়

ভূমিকা

নিদ্রাঘোরে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ দুর্গোৎসব করিবার বাসনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গতি নাই; ভিক্ষা তাহার উপজীবিকা। তবু সে নিরস্ত হইল না। নিজে মাটী কাটিয়া আনিয়া প্রতিমা গড়িল—লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিল—বহুক্রোশব্যাপী পথ হাঁটিয়া গঙ্গাজল মাথায় করিয়া বহিয়া গৃহে আনিল। কিন্তু ডাকের গহনা দিয়া প্রতিমা সাজাইতে পারিল না—আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণের সেবার্থ অর্পণ করিতে পারিল না—ঢাক ঢোল বাজাইয়া গ্রাম মাতাইতে পারিল না। ব্রাহ্মণ শুধু প্রাণ ভরিয়া পূজাটি করিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখিলাম, আমারও সেই দশা। আমি কোনও রকমে প্রতিমাখানি গড়িলাম, কিন্তু তাহাকে ত সাজাইতে পারিলাম না। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু উপযুক্ত আহার্য্য দিয়া মহদ্জনের সেবা করতে পারিলাম কই? নৈবেদ্য সাজাইতে গিয়া দেখিলাম, ঘরে চাল নাই; হোম করিতে গিয়া দেখিলাম, পাত্রে ঘি নাই; বলি দিতে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে ছাগ নাই। তবে এ ধৃষ্টতা কেন? যে সামর্থ্যহীন, তার মহাপূজা করিতে যাওয়া কেন?

কেন, তা' বলিব! বলিব বলিয়াই এ দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিয়াছি। গত ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে একটি সভা আহূত হয়। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমি অনুরুদ্ধ হই। পাঠ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু লোকের ভাল লাগিয়াছিল কি না জানি না। অবশেষে আমার দুই চারিজন বন্ধু সেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিতে আমায় অনুরোধ করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম। কিন্তু ছাপিতে দিবার পূর্ব্বে প্রবন্ধটিকে অনেক বাড়াইলাম। প্রবন্ধের নাম দিলাম—"বঙ্কিম-কাহিনী"। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে "কাহিনী" যখন ছাপা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন কয়েক জন উদারচিত্ত ভদ্র ব্যক্তির গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেন, কেহ বা প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। আমি একটু ভীত হইলাম, কেন না, এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ 'ক' 'খ' শেষ করিয়া রামায়ণ ধরিয়াছেন—কেহ বা 'ক' 'খ' আরম্ভ

করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা জানাইয়াছেন। সুতরাং আমার ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যাহা হউক আমি পিছাইলাম না। ভাবিলাম, তবে কাহিনীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জীবনী লিখিব। ভাবিলাম, যে চরণে একটি ক্ষুদ্র বনফুল অর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, সে চরণে আরও দুইটা ফুল, চন্দনের সহিত মিশাইয়া দিই না কেন?

আমার বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিলেন। আমি তখন বুকের ভিতর এক অভূতপূর্ব্ব দৈবশক্তি অনুভব করিলাম। তিন মাসের মধ্যে এই জীবনী লিখিয়া শেষ করিলাম। সমস্ত দিন উপকরণ-সংগ্রহার্থ ঘুরিয়া রাত্রে বসিয়া দুই চারিখানি কাগজ লিখিতাম। পরদিন প্রাতে তাহা ছাপাইতে দিয়া আবার উপাদান সংগ্রহকরণাভিলাষে বহির্গত হইতাম। এইরূপে পুস্তকখানি তিন মাসের মধ্যে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যে জিনিসটা শেষে দেওয়া উচিত, তাহা আমি মধ্যে দিয়াছি; যে গল্পটা গোড়ায় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমায় বাধ্য হইয়া শেষে দিতে হইয়াছে। আমি যথাস্থানে সকল জিনিস সাজাইতে পারিলাম না।

তা' ছাড়া "কাহিনী" স্বতন্ত্রভাবে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু উপায় নাই। "জীবনী" জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে "কাহিনী" মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে "কাহিনী"কে কিছু কাল এই ভাবে থাকিতে হইবে। "জীবনী" যদি কখনও পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে "কাহিনী"কে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে।

ত্রুটী পদে পদে; ছাপাইতে দিয়াও নিস্তার নাই। আমি লিখিয়া দিলাম '**nothing**' ছাপা হইল '**noth**'—('কাহিনী' ১৬ পৃষ্ঠা)। লিখিলাম '*জন্য* দিগ্‌দিগন্ত', ছাপা হইল '*জন্যগ্‌*, দিদিগন্ত'—('কাহিনী' ৫১ পৃষ্ঠা)। লিখিয়া দিলাম 'স্বমগমঃ', ছাপা হইল 'স্ব সগমঃ'—('জীবনী' ৯২ পৃষ্ঠা)। এইরূপ কয়েকটা ভুল রহিয়া গেল।

আরও এক গুরুতর ত্রুটী রহিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র বেদ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন—হিন্দু উৎসবাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সে সকল ইংরাজি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। "**Adventures of a young Hindu**" নামে একটি গল্প, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমি অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল; কিন্তু এ যাত্রা তাহা বলা হইল না। নানা কারণ বশতঃ অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল—সংগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

ভূমিকা

"Rajmohan's Wife" নামক একটি গল্প বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন। ইহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, এবং Indian Field নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পটি সম্পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং তাহার মূল্য বেশী আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবু আমি উক্ত পত্রের জন্য নানা দিকে সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কোথাও তাহা পাই নাই। অবশেষে বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। British museumর কর্ত্তা Fortescue সাহেব উত্তরে জানাইয়াছেন, Indian Field কয়েক সংখ্যা মাত্র তথায় আছে, কিন্তু উক্ত গল্প যে সংখ্যায় থাকা সম্ভব, সে সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিবার সময় এখনও সমাগত হয় নাই। কতকগুলি ঘটনা এমনই ভাবে অপরের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে, সে সকল ঘটনার আমি উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কাহারও মনঃপীড়া দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। যদি অজ্ঞাতসারে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইয়া থাকি, তবে তিনি যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করেন।

আর একটি কথা না বলিয়া উপসংহার করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সকল গল্পে আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, অথবা কোনও ঘটনা উল্লেখযোগ্য মনে করি নাই, সে সকল গল্প বা ঘটনা এ পুস্তকে স্থান পায় নাই। যাহা আমি বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিয়াছি, অথবা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তবে সকল ঘটনাগুলি যে খাঁটী সত্য, অথবা অতিরঞ্জিত নয়, সে কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কয়েক জন ভদ্র মহোদয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাহায্য না করিলে এ গ্রন্থ লিখিয়া উঠিতে পারিতাম কি না সন্দেহস্থল। নিম্নে তাঁহাদের নাম দিলাম:—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, এম, এ (বেঙ্গল লাইব্রেরী), শ্রীযুক্ত কিরণনাথ ধর, এম, এ (ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী), ও Mr. E. W. Madge (Imperial Library);—এতদ্ব্যতীত গভর্মেণ্ট বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি।

১৮ নং নবীন সরকারের লেন,
নেবুবাগান, কলিকাতা।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের বক্তব্য

এবারেও মনোমত করিয়া সাজাইতে পারিলাম না। তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শক্তি সামান্য—বিঘ্ন বিপুল। বারান্তরে—যদি আমার ভক্তি থাকে—তবে নূতন সাজে আমার এ প্রতিমাকে সাজাইব।

গ্রন্থের আকার প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে, বাধ্য হইয়া মূল্যও বাড়াইতে হইল। ইতি—

দেওঘর
১৩২২।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নবমীর অর্ঘ্য

জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ দশবৎসর হইল নিঃশেষ হইয়াছে। দশবৎসর পরে আজ আবার নৈবেদ্য সাজাইয়া আনিয়াছি। জানি না দেবতা ও তাঁহার ভক্তের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব কি না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি সপ্তমীতে প্রথম অর্ঘ্যদান করি, তখন বলিয়াছিলাম, পূজা করিবার আমার সাধ আছে, কিন্তু উপকরণ নাই। এখনও যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না; তবে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কতকগুলি নূতন কথা, তথ্য ও প্রবন্ধ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা অসত্য ও অসুন্দর তাহা বরণডালায় স্থান পায় নাই। যাহা অসুন্দর তাহা বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ছিলেন মহান্—সকল বিষয়ে বরেণ্য। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার শতমুখী প্রতিভা তাঁহাকে অতি-মানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। অনেকেই হয়ত জানেন না তিনি কত বড় হিন্দু ছিলেন অন্তরে অন্তরে কত বড বাঙ্গালী ছিলেন, গৃহে ও বাহিরে কত বড় মানুষ ছিলেন। তিনি হিন্দুকে আপন জন বলিয়া জানিতেন, বাঙ্গালীকে সোদর-তুল্য জ্ঞান করিতেন, যে মানুষ হইত তাহাকে অন্তর মধ্যে গ্রহণ করিতেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন; চিনিয়া তাঁহাকে সম্রাটের সিংহাসনে বসাইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছিলেন। গভর্মেণ্টও তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন।—অল্পকালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে রায় বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও

বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিয়াছিলেন। তাই একদা তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি করিতে করিতে এত কেতাব লিখিলেন কিরূপে? আমার আলমারির একটা তাক (Shelf) যে তাঁ'র কেতাবে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল।' বিস্ময়ের কথা হইলেও, জগতের অধিকাংশ কবি বা ঔপন্যাসিক জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য একটা না একটা পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পুরাকালের কথা ধরিতেছি না, তখন রাজা মহারাজারা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ ও আশ্রয় দিতেন। সে দিনও বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য একখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের বাঙ্গালা দেশের লেখকদের জীবিকার জন্য একটা না একটা কিছু করিতে হইয়াছে। নবীনচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, হেমচন্দ্র উকীল; ভূদেবচন্দ্র স্কুল ইন্‌স্পেক্টার; মধুসূদন কেরাণী, দ্বিভাষী (Interpreter), পরে ব্যারিষ্টার, দীনবন্ধু ডাকঘরের Superintendent—এইরূপ অনেক লেখকই চাকরি করিতে করিতে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সকলে রবীন্দ্রনাথ বা রামমোহন রায় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। যুরোপেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। Sterne, Swift পাদরীর কাজ করিতে করিতে বহু অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। Charles Kingsley, Baring-Gould সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। Charles Lamb ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া অফিসে, Anthony Trollope ডাকঘরে, Austin Dobson ব্যবসা সম্বন্ধীয় Boardএ কার্য্য করিতেন। Fielding একজন বেতনভুক্ ম্যাজিষ্ট্রেট, Sir Walter Scott দীর্ঘকাল ওকালতীর পর জজের কেরাণী, Parry একজন প্রসিদ্ধ জজ। Morris, Richardson দোকানদার ছিলেন; Sir Thomas Browne, Smollett প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। Burns লাঙ্গল ও কলম দুই চালাইতেন; Mark Twain মুদ্রাযন্ত্র ও কলম দুই ধরিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, বহু যশস্বী লেখকের একটা না একটা পেশা ছিল। এবং তাঁহারা জীবিকা উপার্জ্জনের কার্য্যে রত থাকিয়াও প্রত্যেকে যে সব মহামূল্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা সংখ্যায় কম নহে। তবে বাঙ্গালা দেশে জীবিকা উপার্জ্জনের কার্য্যে রত থাকিয়া কোন লেখক বেশী পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সংখ্যায় যেমন বেশী, গৌরবেও তেমনি বড। তাঁহার রচনার মধ্যে এক পৃষ্ঠাও নাই যাহা পরিত্যক্ত হইতে পারে।

এই অতি-মানবের চরণে ইহা আমার শেষ অর্ঘ্য দান।

সমুদ্র-সৈকত, পুরী
১৩৩৮ আষাঢ়

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সূচনা	১
কাঁটালপাড়া ও গৃহদেবতা	৩
বংশ-পরিচয়	৭
মাতা-পিতা	৯
যাদবচন্দ্র—আত্মজীবনী	১১
বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম	১৮
শৈশব	১৮
বিবাহ	২২
ইংরাজি শিক্ষা	২৪
সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী—কৈশোরে	২৯
বাল্যরচনা	৩৩
কবির লড়াই—প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যে	৫১
রচনা—ষোড়শ বৎসরে	৫৪
হুগলি কালেজে	৫৬
প্রেসিডেন্সি কালেজে	৫৯
চাকরী—যশোহর ও নাগোয়ায়	৬৪
" —খুলনায়	৬৬
" —বারুইপুরে	৭৩
" —বহরমপুরে	৭৫
" —হুগলিতে	৮৪
" —হাবড়ায়	৮৯
পিতার মৃত্যু	৯২
চাকরী—কলিকাতায়	৯৬
" —যাজপুরের পথে	৯৯
" —হাবড়ায় (দ্বিতীয়বার)	১০১
" —আলিপুরে ও বিদায়	১০৩
জীবনের শেষ কয়েক বৎসর	১০৮
মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্ন্যাসী	১১৫
দেহত্যাগ	১১৮
শোকোচ্ছ্বাস	১২৩
জন্মকুণ্ডলী	১৩৩
উপাধি	১৩৪
প্রতিমূর্ত্তি	১৩৬
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য	১৩৮
বঙ্গদর্শন	১৫৪
পুস্তকাবলী	১৫৮
বঙ্কিমচন্দ্র—বিশ্লেষণ	১৬২
" —সমাজ সংস্কারক	১৬২
" —কবি	১৬৪
" —ঔপন্যাসিক	১৬৫
" —স্বদেশভক্ত	১৬৮
" —সমালোচক	১৭০
" —ধর্ম্মোপদেষ্টা	১৭৮
উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র	১৮৪
পুস্তক লিখিবার প্রণালী	১৯১
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ	১৯২
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস	১৯৩
উপন্যাসের বৈচিত্র্য	১৯৪
উপন্যাসেরপরিচয়—দুর্গেশনন্দিনী	১৯৪
" —কপালকুণ্ডলা	২০২
" —বিষবৃক্ষ	২০৩

" —আনন্দমঠ ২১৩
" —বন্দে মাতরম্ ২১৬
" —আনন্দমঠের পরিত্যক্ত অংশ ২২১
" —রাধারাণী ২২৬
" —রাজসিংহ ২২৬
" —যুগলাঙ্গুরীয় ২২৬
" —চন্দ্রশেখর ২২৮
" —কৃষ্ণকান্তের উইল ২৩১
" —দেবীচৌধুরাণী ২৪২
" —ইন্দিরা ২৪৩
" —মৃণালিনী ২৪৭
" —সীতারাম ২৫৪
কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব ২৫৫
অপ্রকাশিত রচনা—নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী ২৫৭
" —বর্ষার মানভঞ্জন ২৫৯
" —বাঙ্গালার সাহিত্য ২৬১
" —ভিক্ষা ২৭১
বিদ্যাশিক্ষা ২৭৪
সাহিত্য—নানা কথা ২৭৮
পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত ২৮৯
বঙ্কিমচন্দ্র—সংসার ও সমাজে ২৯৬
" —পুত্ররূপে ২৯৬
" —ভ্রাতৃরূপে ২৯৮
" —পিতৃরূপে ২৯৯
" —বন্ধুরূপে ৩০০
" —কর্ম্মচারিরূপে ৩০৪
ক্রীড়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৩০৬
ক্রোধী বঙ্কিমচন্দ্র ৩০৬
সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র ৩০৮
কর্ত্তব্যজ্ঞান ৩০৯
বক্তৃতাশক্তি ৩১০
বঙ্কিমচন্দ্র ও থিয়েটার ৩১১
তামাক ও চা ৩১৪
সমুদ্রযাত্রা ৩১৫
অবরোধ-প্রথা ৩১৮
সাম্য ৩১৯
বহুবিবাহ ৩২২
স্ত্রীশিক্ষা ৩২৩
বিধবাবিবাহ ৩২৪
ধর্ম্ম ৩২৭
ধর্ম্মমত ৩২৯
মসী-যুদ্ধ ৩৩৪
" —বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ৩৩৬
" —বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু ৩৩৭
মসী-যুদ্ধ—বঙ্কিমচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৩৩৯
" —বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৩৪১
" —বঙ্কিমচন্দ্র ও অধ্যাপক হেষ্টি ৩৪৭
বৈদিক সাহিত্য ৩৭১
হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তির কথা ৩৭৪

সংযোজন

প্রাসঙ্গিক তথ্য ৩৯৩
নির্দেশিকা ৪৩৩

যৌবনে : দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে

ললিতা।

পুরাকালিক গল্প।

তথা।

মানস।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রচিত

কলিকাতা।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৫৬

[ললিতা ও মানসের আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি]

ললিতা (১৮৫৬) : আখ্যাপত্র

দুর্গেশনন্দিনী।

ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

মৃজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, নং ৫৮।৫

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৬৫।

মূল্য—১৲ এক টাকা।

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) : আখ্যাপত্র

দুর্গেশনন্দিনী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—দেবমন্দির।

৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমত ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী : উৎসর্গপত্র

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

দুর্গেশনন্দিনী : প্রথম পৃষ্ঠা

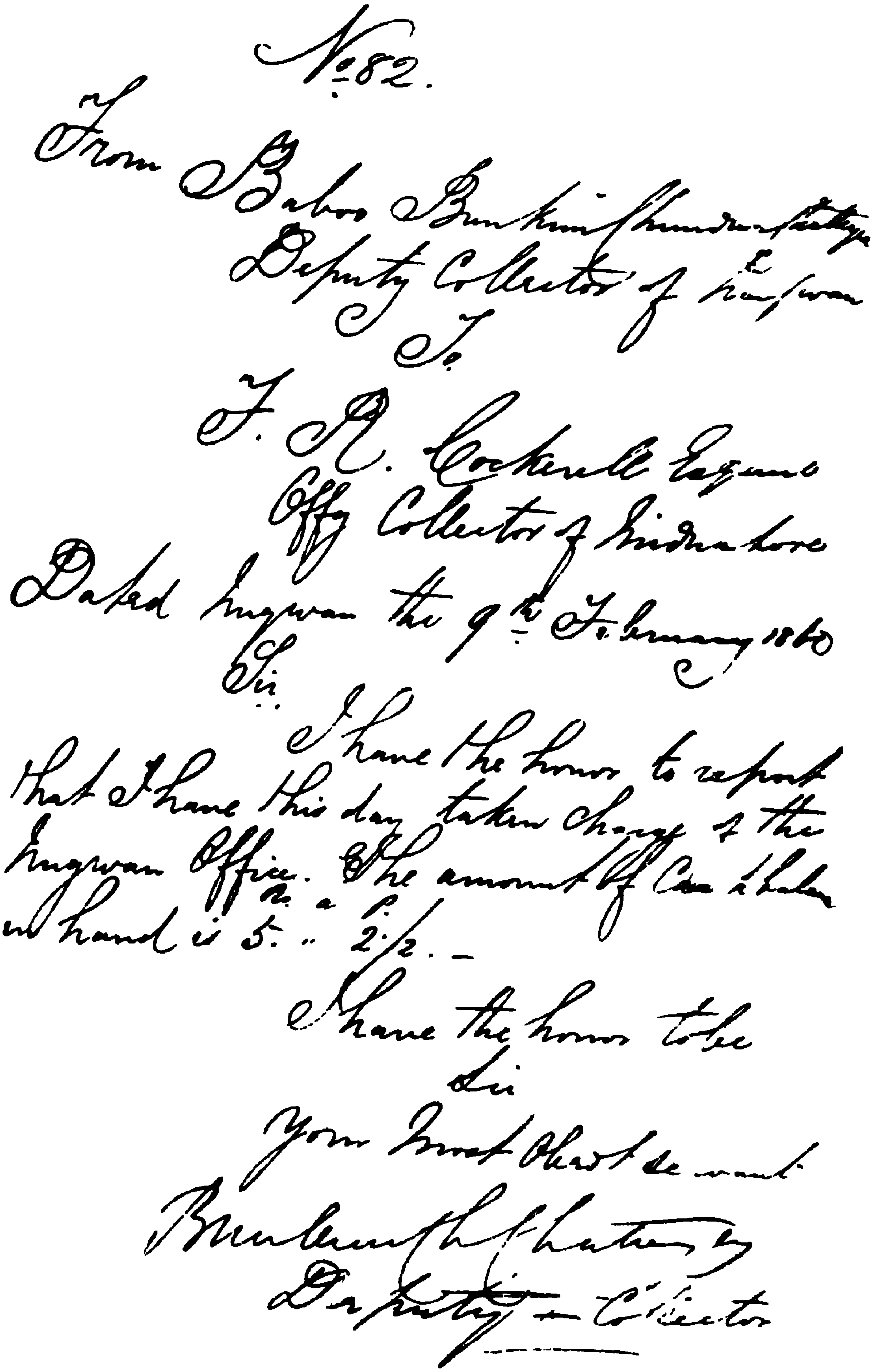
No. 82.

From Baboo Bunkim Chunder Chatterjee
Deputy Collector of Negwan
To
J. R. Cockerell Esquire
Offg Collector of Midnapore
Dated Negwan the 9th February 1860
Sir,

I have the honor to report that I have this day taken charge of the Negwan Office. The amount of Cash balance in hand is Rs. 5 .. a .. p. 2½.—

I have the honor to be
Sir
Your most Obedt Servant
Bunkim Chunder Chatterjee
Deputy Collector

সরকারি চিঠি (১৮৬০)

বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তাক্ষরের নমুনা নিম্নে দিলাম। পত্রখানি তিনি আমায় ১২৯৩ সালে লিখিয়াছিলেন। আমি তখন মেদিনীপুরে — বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায়।

কল্যাণবরেষু

তোমার কার্য্য কর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। আমরা সকলে ভাল আছি।

[illegible] যখন বড় [illegible] আমার মনে [illegible]

[illegible] ১০ [illegible]

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শচীশচন্দ্রকে লেখা চিঠি

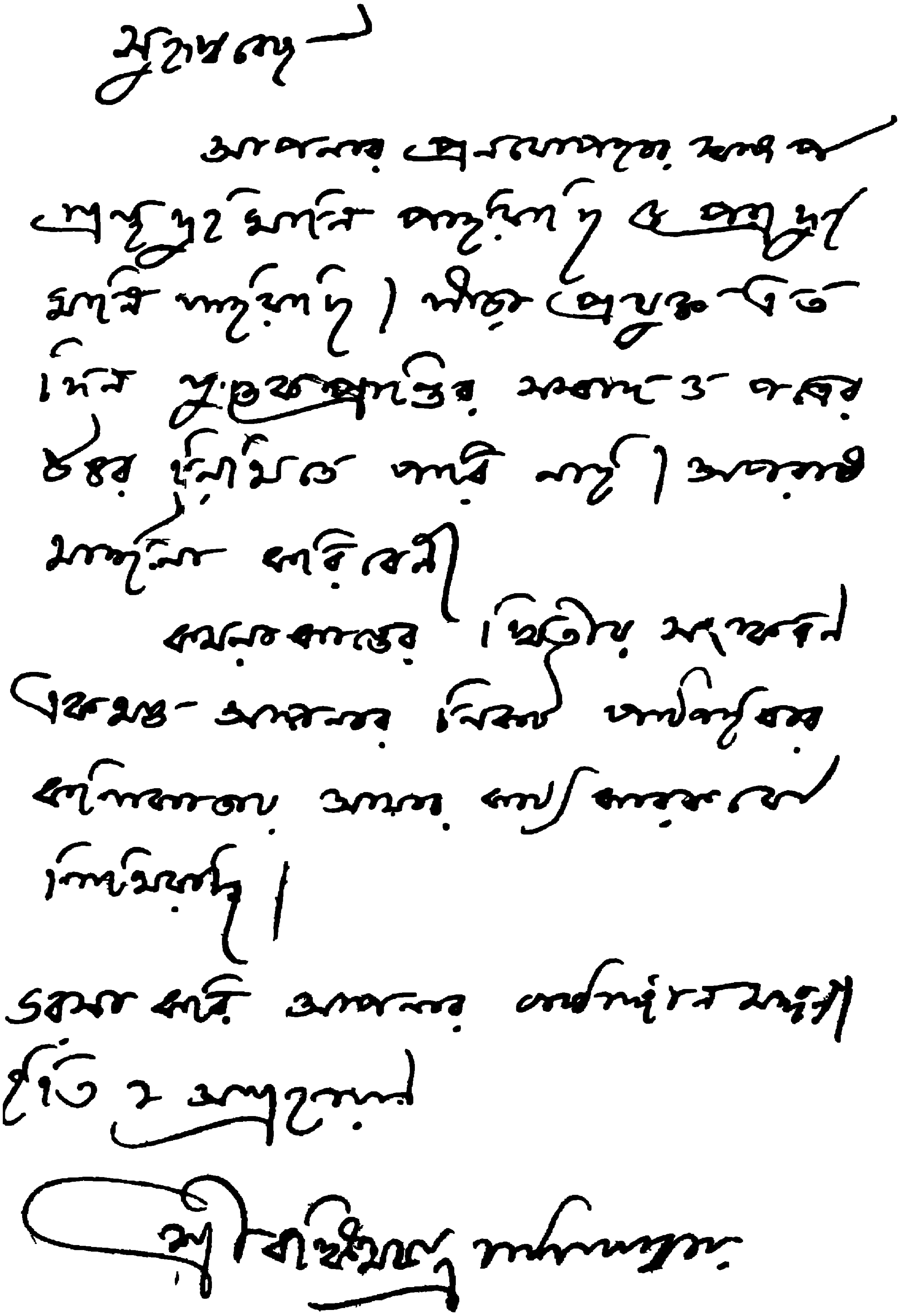

সুহৃদ্বরেষু —

আপনার প্রণয়োপহার স্বরূপ পুস্তক দুইখানি পাইয়াছি ও পড়িয়া খুসি হইয়াছি। শীঘ্র প্রত্যুত্তর দিতে দিন মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে ও পরের উত্তর দিতে পারি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ এক খণ্ড আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় আমার কার্য্যকারককে লিখিয়াছি।

ভরসা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। ইতি ২ অগ্রহায়ণ

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামদাস সেনকে লেখা চিঠি

Letters
on
Hinduism
Letter I Introductory

My dear J*******

I have undertaken
to give you in the form of
my views regarding Hinduism
in a number of letters, which
I promise at the outset, shall
be as few as ~~possible~~ the sub-
ject admits. The necessity
that there exists of bringing
the same views before ~~the~~
others of my educated coun-
trymen has compelled me
to travel beyond the ~~origin~~
~~al scope~~ limits to which the
controversy between you and
me would have restricted them,

পাণ্ডুলিপি-চিত্র : Letters on Hinduism

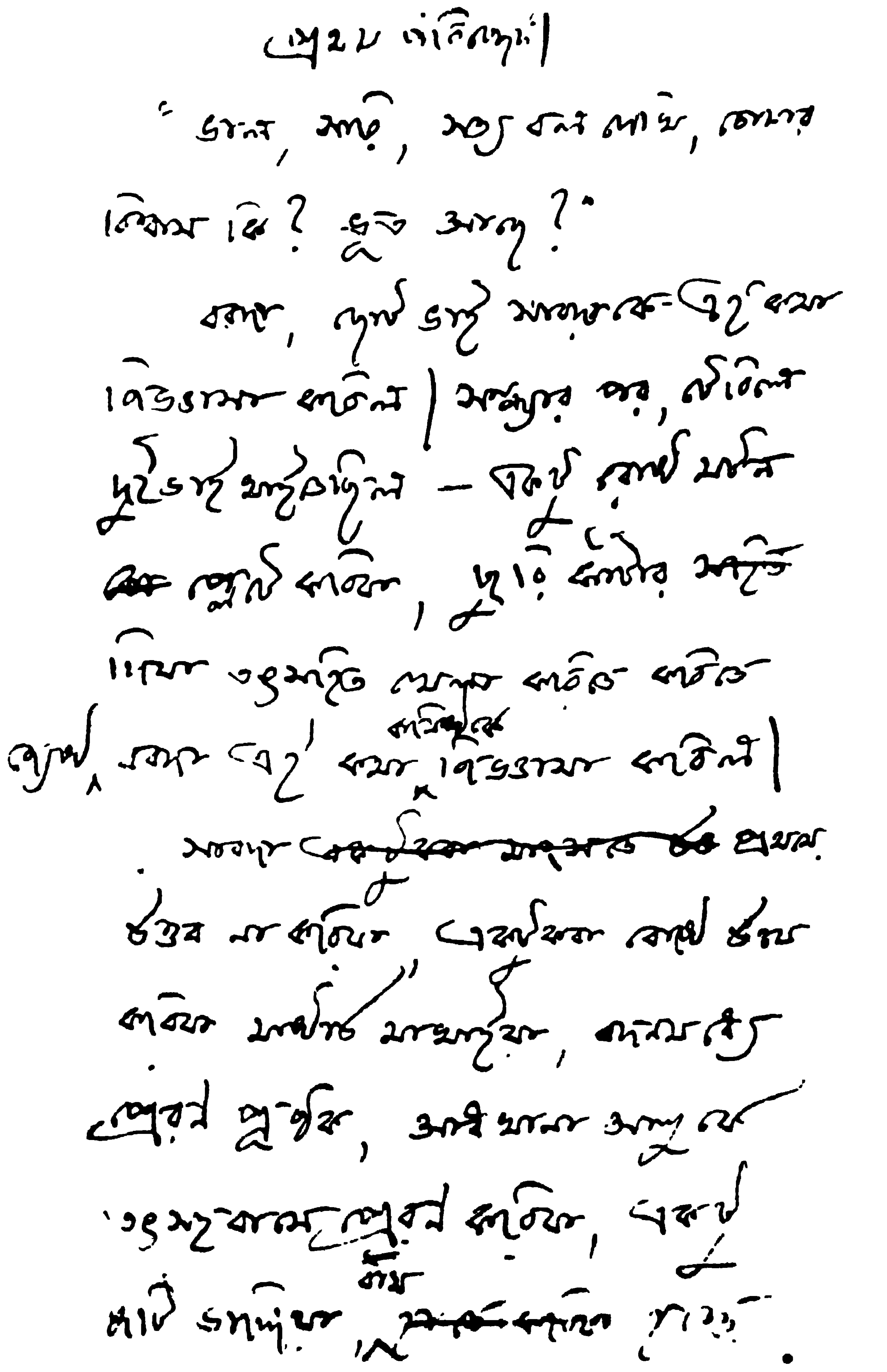

পাণ্ডুলিপি-চিত্র : নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী

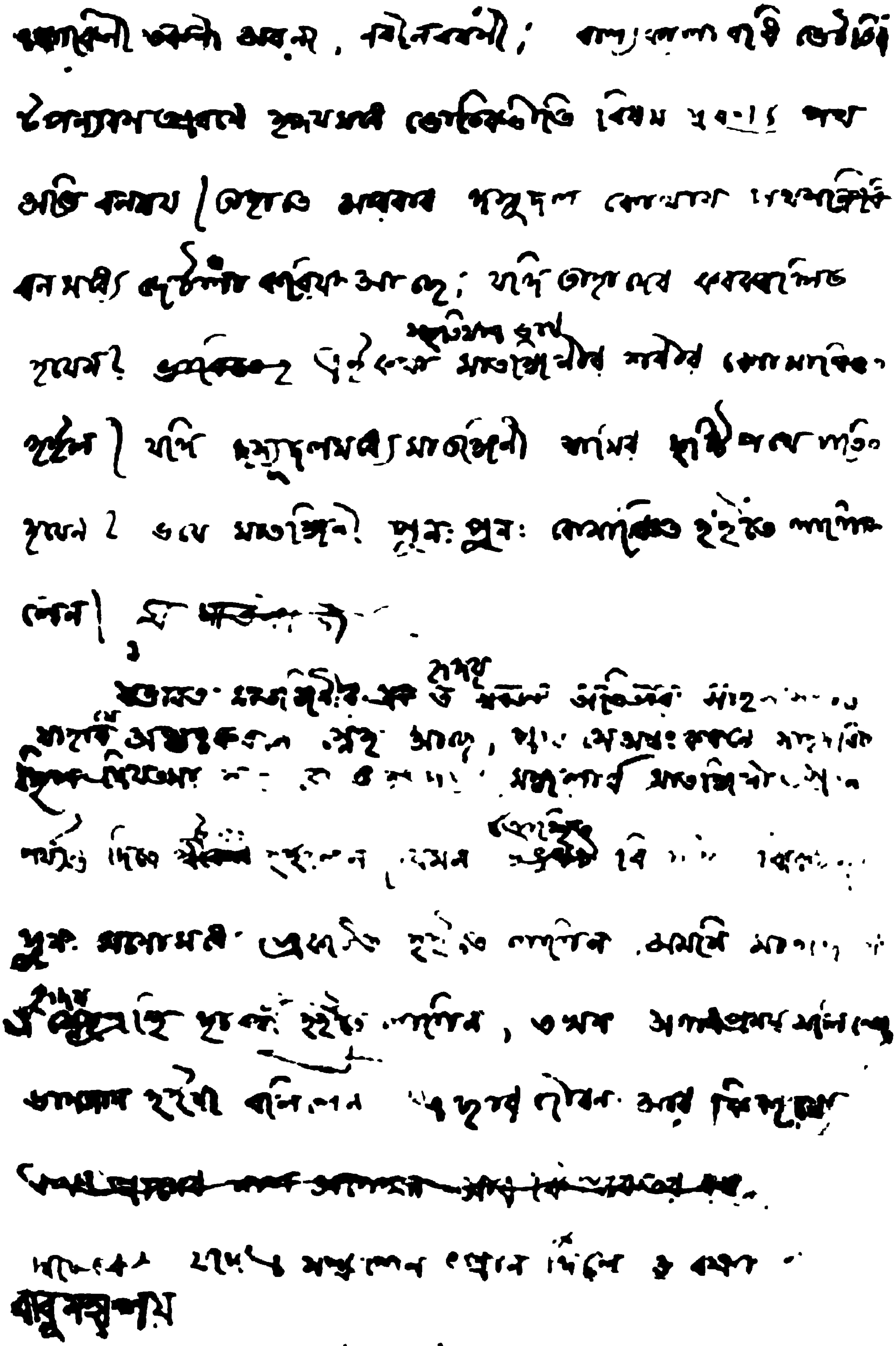

পাণ্ডুলিপি-চিত্র : বারি-বাহিনী

Not merely the Pincott of to-day, but any thoughtful person from the direction of Europe, who has ~~considered~~ the moral condition of the inhabitants of India, has had to certify to their good morals, and their progress in virtue. Recall to mind that ancient story, the scene where the ~~learned~~ Dandin stood before the great hero Alexander. In that thick lonely grove, under the shadow-spreading tree, half reclined on that bed of withered grass and leaves, the ~~learned~~

সংশোধিত প্রুফ

'বঙ্কিম-জীবনী'র লেখক

বঙ্কিম-জীবনী

সূচনা

আমার মনে হয়, পিতৃলোকে সময় সময় বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লবের ফলে মহাপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা—যাঁহারা পৃথিবীতে একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা—সমসময়ে পিতৃলোক ত্যাগ করিয়া পুনর্বায় ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইরূপে পৃথিবীতে সময় সময় প্রতিভার স্রোত বহিয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, এইরূপ একটা তরঙ্গ উঠিয়া একদিন উজ্জয়িনী-তট প্লাবিত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গশিরে কালিদাস, বররুচি, বেতাল-ভট্ট, ঘটকর্পর, শঙ্কু, বরাহমিহির প্রভৃতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ভারতবর্ষ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারাই হয়ত ভাসিতে ভাসিতে যুগযুগান্তরের পর ইংলণ্ডের তটে উপনীত হইয়া রাজ্ঞী এলিজ্যাবেথের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া দেখিলে আমার মনে হয়, এইরূপ একটা তরঙ্গশিরে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পুণ্যময় বাঙ্গালার তট উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তা'র পর ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইল। মহাপ্রেমিক, বিশ্বশিক্ষক, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া কত সার্ব্বভৌম, কত রঘুনন্দন, কত রঘুনাথ মুকুলিত হইল।

তাহার পর কিছু কাল ধরিয়া অনন্ত জলধিগর্ভে আর তেমন তরঙ্গ উঠিল না, আমরা উৎসুকনয়নে চাহিয়া রহিলাম—শুধু একটা চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইল। কিন্তু সে পৃথিবী-পরিপ্লাবী, প্রতিভা-বাহী তরঙ্গ দেখিলাম না। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। তাহার পর সহসা একদিন সিন্ধুবক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল—বিদীর্ণ জলধিবক্ষে প্রতিভার তরঙ্গ ছুটিল। দেখিলাম—রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি বাঙ্গালার বক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছেন।

তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত রত্নরাজি বেলাভূমি হইতে কুড়াইয়া গৃহে আনিতে না আনিতে গুরুগম্ভীর অম্বর-বিদারী গর্জ্জন পশ্চাতে শুনিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, পৃথিবী ও আকাশের সঙ্গমস্থল হইতে উত্থিত হইয়া এক মহাকায় তরঙ্গ বাঙ্গালার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশাকুলিত হৃদয়ে বেলা-ভূমি অভিমুখে আবার ছুটিলাম। দেখিলাম, উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গশিরে ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেব, গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দীনবন্ধু, গোবিন্দরায, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কাঁচড়াপাড়ায, কেহ বীরসিংহ গ্রামে, কেহ কাঁটালপাড়ায়, কেহ সাগরদাঁড়ি গ্রামে, কেহ গুলিটায়, কেহ কলিকাতায়, কেহ নন্নাপাড়ায়, সুবিধা ও সুযোগ মত অবতীর্ণ হইলেন। কাহারও ললাটে প্রভাকর, কাহারও নয়নে অশ্রুধারা, কাহারও হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি, কাহারও কণ্ঠে বৈজয়ন্ত-প্রতিঘাতী ভেরীনিনাদ, কাহারও মানসপটে

দশমহাবিদ্যার অতুলনীয় রূপ, কাহারও হস্তে "বিশ্বনাথ ট্রাষ্টফণ্ড"-অঙ্কিত পতাকা, কাহারও পদতলে নাট্যসিংহাসন, কাহারও আলিঙ্গন-বদ্ধ বাহুপাশে "সমাজ", কাহারও উদ্যতহস্তে নীলকর-মথন দণ্ড, কাহারও কণ্ঠে যমুনার কুলু কলু ধ্বনি, কাহারও হস্তে রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য শঙ্খ।

বাঙ্গালার এই পরিপ্লাবন—এই প্রতিভা-তরঙ্গের গর্জ্জন, পৃথিবীর পশ্চিম তটেও প্রতিঘাত হইয়াছিল। শক্তি-উপাসক মহা-বৈষ্ণবের বন্দে মাতরম্ ধ্বনি, কোটি কণ্ঠে বাহিত হইয়া সুদূর নীলাম্বুরাশি সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু—কিন্তু যাঁহাদের তূর্য্যনিনাদে সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল, আজ তাঁহাদের কয়জন আছেন?—আজ তাঁহাদের কয়জন অনাথ কাঙ্গালের অশ্রুমোচন করিতে, অজ্ঞকে কৃষ্ণভক্তি দান করিতে, জীমূতমন্দ্রে নির্জীব হৃদয় অনুপ্রাণিত করিতে এ জগতে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহাদের সকলেই আমাদের ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আর কি তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন না? আমরা ব্যাকুলনয়নে আকাশ পানে চাহিয়া আছি, আর কি প্রতিভার তরঙ্গ বাঙ্গালায় প্রবাহিত হইবে না?

বঙ্কিম-জীবনী

প্রথম খণ্ড

কাঁটালপাড়া

জেলা চব্বিশ পরগণার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। বারাসত এই জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে বারাসত একটি জেলা ছিল, এক্ষণে একটি মহকুমা মাত্র। বারাসত হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে কাঁটালপাড়া অবস্থিত।

কাঁটালপাড়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কলিকাতা হইতে বেশী দূর নয়,—বার ক্রোশ মাত্র। রেলে এক ঘণ্টার পথ। কাঁটালপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা, উত্তরে নৈহাটী, দক্ষিণে ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী, পূর্ব্বে দেলপাড়া। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলপথ, কাঁটালপাড়াকে দ্বিখণ্ড করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাংশে চট্টোপাধ্যায়-বংশের বাস—পশ্চিমাংশে, গঙ্গার দিকে অন্যান্য ভদ্রলোকের বাস। এক্ষণে নৈহাটী ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত,—সে স্থান কাঁটালপাড়ারই অন্তর্গত।

গঙ্গার এক পারে কাঁটালপাড়া—অপর পারে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ায় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্রের বাসস্থান, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। আর একদিন, প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক পারে ভারতচন্দ্র রায়, অপর পারে রামপ্রসাদ সেন। তার আগে, চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক কূলে কাশীরাম দাস, অপর কূলে কৃত্তিবাস। আরও একটু দূরে—অজয়ের কূলে, একদিকে জয়দেব, অপরদিকে চণ্ডীদাসকে দেখিয়াছিলাম। চুঁচুড়া কাঁটালপাড়া, পাণ্ডুয়া হালিসহর, সিঙ্গি ফুলিয়া, কেন্দুবিল্ব নাম্নুর ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কোনও কালে বিলুপ্ত হইবে না।

কাঁটালপাড়া কত দিনের, তা' জানি না। কেমন করিয়া নামের সৃষ্টি হইল তাহাও বলিতে পারি না। কতকগুলি কাঁটাল গাছ আছে বটে, কিন্তু নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে যা' আছে, তদপেক্ষা কোনও মতে বেশী হইবে না। তবে পুরাকালে কি ছিল, তাহা বলিতে পারি না।

কাঁটালপাড়ায় দ্রষ্টব্য বড় একটা কিছুই নাই। অর্জ্জুনা দীঘি সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে। আমরা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছি, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিতে যাইবার সময় অর্জ্জুনার সন্নিকটে সসৈন্যে ছাউনি করিয়াছিলেন। রঘুদেব ঘোষাল নবাবসৈন্যের রসদ সংগ্রহ করিয়া নবাবের আনুকূল্য

করিয়াছিলেন।

আর দেখিবার আছে,—রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ। তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। সে আজ বহুদিনের কথা। আমি দেড় শত বর্ষের আগেকার কথা বলিতেছি। তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে আলিবর্দ্দি খাঁ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইংরাজ কলিকাতায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া ভারতব্যাপী রাজ্যের সূচনা করিতেছেন। মির্জাফর তখন সামান্য সেনানী। সিরাজউদ্দৌলা বালক মাত্র।

সে সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রামজীবনের শ্বশুর রঘুদেব ঘোষাল কাঁটালপাড়ার মধ্যে জনৈক সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার গৃহ তখন ক্ষুদ্র, আড়ম্বরশূন্য,—বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। তাঁহার ঠাকুরমন্দির বা অতিথিশালা ছিল বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বাগান ও পুষ্করিণী যথেষ্ট ছিল। বহুকালের অর্জ্জুনা দীঘি তখন ঘোষাল মহাশয়ের সম্পত্তি।

এমনিই দিনে—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে—একদা অপরাহ্নে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া পুষ্করিণী তটে তরুচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর একটি দীর্ঘবিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভজীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণ, রাধাবল্লভ প্রাপ্তি সম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামক কোনও সন্ন্যাসী, রাধাবল্লভ বিগ্রহকে আপন ঝুলিতে রাখিয়া দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বলরাম ব্রহ্মচারী, উক্ত বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনিও তাঁহার সহোদরের ন্যায় ঠাকুরকে ঝুলিতে লইয়া দেশভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তথায় সাহার পুকুর নামে একটী জলাশয় ছিল। সেই জলাশয়ের পাড়ের উপর মাধবীবৃক্ষ-তলে ঠাকুর নামাইয়া ব্রহ্মচারী স্থানান্তরে গমন করেন। প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, যে ঠাকুর পশ্চিমমুখী ছিলেন, সে ঠাকুর পূর্ব্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের তথায় অবস্থান করিতে বাসনা হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে তথায় রঘুদেব ঘোষালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেলেন। জানি না, নবাবের নিকট তিনি কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। নবাব কয়েক দিবস পরে ব্রহ্মচারীকে ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরাধিপতিকে অনুজ্ঞা করেন, এই ব্রহ্মচারী যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা গ্রাহ্য করিবে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা পাইয়া বলরাম ব্রহ্মচারীকে কাঁটালপাড়া গ্রামে দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর, দশ বিঘা দেবোত্তর, দশ বিঘা জমাই জমী দান করেন।

এই জমী পাইয়া ব্রহ্মচারী কাঁটালপাড়ায় ঘর বাঁধিলেন ও বাস করিতে

লাগিলেন। পরে পাট্টাদার দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাইয়া লক্ষ্মণপুর, এবং দোগাছা দেবোত্তর লযেন। কিছুকাল পরে রঘুদেব ঘোষালকে মন্ত্র প্রদান করেন; এবং দেহান্তরের অনতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঠাকুর ও জমী-জমা দান করেন।"

তা'র কযেক বৎসর পরে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরফলকে দুই ছত্র লিখিত ছিল।—

বাণ সপ্ত কলা শকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৬৭৫ শকে রঘুদেব কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইযাছিল। সে আজ ১৫৮ বৎসরের কথা।

১২৫৩ সালে মন্দির ভাঙ্গিযা যায। পরে ১২৫৭ সালে পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্র বহু অর্থব্যয়ে মন্দির সংস্কার করিযা দেন।

এই রাধাবল্লভ কতদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না,—কত সন্ন্যাসীর হাত ঘুরিযা অবশেষে চট্টোপাধ্যায বংশের হাতে পডিযাছেন, তাহা নির্ণয করিয়া বলা অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্য জীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পডিযাছিলেন।

রাধাবল্লভ জীউ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিযা গিযাছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"বঙ্কিমবাবুর বাডী আমার বাডী হইতে বেশী দূর নয়। নৈহাটি ষ্টেসন হ'তে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাডী প্রায তত্টুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাডীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি মুডাগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশযরা রাধাবল্লভের সেবাইতে, একঘর ফুলে, আর একঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশযদের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উহ্ দের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা তত ভাল নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাডীতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্ব্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয। রথখানি পিতলের, বেশ বড। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে মেজে চক্চকে করিয়া লওয়া হয। রথের সময় বঙ্কিম-বাবুদের বাডীর দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটী মেলা হয, প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রী হয়, তেলেভাজা পাঁপোর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট দশখানা বড বড ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়িমুড়কি, মটরভাজা চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে খিরোর ও খাজা থাকিত; এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারী দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানারকম বাঁশী, কাগজের পুঁতুল, কাঠির উপর

লাফ দেওয়া হনুমান্, কটকটে ব্যাঙ্ কিনিতে পাওয়া যায়। এসব ত গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারী জিনিস এই মেলায় বিক্রী হয়—নানারকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফলসার গাছ এবং গোলাপ যুঁই জাঁতি বেল নবমালিকা কামিনী গন্ধরাজ মুচুকুন্দ বক্ কুরচি কাঞ্চন টগর সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আটদিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনও গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুঁতুল নাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের পুঁতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন, এসব ত ছিলই; তার উপর একটা মোকদ্দমার সঙ্ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল, জজসাহেব রায় দিলেন, আসামীর ফাঁসী শাস্তি হইল, ফাঁসীও হইল। ফাঁসীকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া এক রকম পদার্থ বাহির হইতে দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর এক রকম সঙ্ ছিল—আহ্লাদে পুঁতুল। তার এক গাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে। রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ী, একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ী বলিলে অনেকেই মনে করেন কৃষ্ণ রথের সময় মাসীর বাড়ী যাইতেন; সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল; কুঞ্জ ছিল; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ী হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক্ নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল গুণ্ডিচা, অর্থে কুঁড়ে ঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ী লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ী লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আটদিন থাকেন; দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে, সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারী যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা ত প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক চমৎকার হইয়া যায়; কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তা ছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালাটালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালাখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত,—এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্ত্তন

প্রভৃতি হইত। এখন দুই একদিন যাত্রা হয় মাত্র, আগে আটদিনই খুব জম্‌জমাট থাকিত।"

বংশ-পরিচয়

বংশ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধে আমি দক্ষ হইতে পরিচয় দিলাম :

দক্ষ
|
সুলোচন
|
বাসুদেব (মতান্তরে মহাদেব)
|
নাবি (মতান্তরে হলধর)
|
নারো (মতান্তরে কৃষ্ণদেব)
|
বরাহ
|
শ্রীকর অধ্বর্য্যু (মতান্তরে শ্রীধর)
|
বহুরূপ
|
গাহী
|
অবসথী সর্ব্বেশ্বর
|
তেকড়ি
|
সিদ্ধেশ্বর
|
লক্ষ্মীধর
|
দিগম্বর

- জগন্নাথ
  - শ্রীগর্ভ (চৈতন্যদেবের সমকালীন)
    - ভগবান্
      - অবসথী গঙ্গানন্দ
        - কৃষ্ণবল্লভ
          - নন্দগোপাল বা নন্দকিশোর
            - রামকান্ত
              - রামজীবন (ভঙ্গ)
                - রামহরি
                  - শিবনারায়ণ
                    - ৺কাশী
                    - ৺যাদবচন্দ্র
                      - ৺শ্যামাচরণ
                        - ৺কৃষ্ণচন্দ্র
                        - শচীশচন্দ্র
                          - মাধুরী
                          - হেমলতা
                          - পূর্ণিমা
                      - ৺সঞ্জীবচন্দ্র
                        - জ্যোতিশ্চন্দ্র
                      - ৺বঙ্কিমচন্দ্র
                        - ৺শরৎকুমারী
                        - ৺নীলাব্জকুমারী
                        - ৺উৎপলকুমারী
                      - ৺পূর্ণচন্দ্র
                        - বিপিন
                        - ৺নলিন
                    - ৺নবকৃষ্ণ
                  - জয়নারায়ণ
                - জগন্নাথ

দক্ষ ৯৯৯ সংবৎ—৮৪২ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ষাট বৎসর।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বংশ-পরিচয় দিব।—"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো।* তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় পাইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।"

মাতা-পিতা

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা পিতা সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিব। যাঁহার অস্থি হইতে দম্ভোলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার একটু পরিচয় প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতা কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। কিন্তু এমন মাধুর্য্যময়ী, এমন করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা তপ্তকাঞ্চনগৌরবর্ণ—দীর্ঘকায়—তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন—মহিমামণ্ডিত—তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র অতি সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের জনক-জননীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আমায় বলিয়াছেন, "যাদবচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র অপবিত্র ভাব দেখি নাই; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর বদনে যা' কিছু দেখিয়াছি, সমস্তই পবিত্র।"

যাদবচন্দ্র ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছিলেন।

যাদবচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে জগন্নাথদর্শনে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ দারোগাগিরি করিতেন। পুলিশের দারোগা নহে, নিমকীর দারোগা। যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে থাকিয়া কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তখন তাঁহার কর্ণমূলে এক স্ফোটক দেখা দেয়। স্ফোটক ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল—কর্ণমূল পচিতে লাগিল। চিকিৎসকেরা **Gangrene** বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে যাদবচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনেরা

* কোন্নগরের সন্নিকট।

দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আর কোনও আশা নাই। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে যাদবচন্দ্রের দেহ বৈতরণীতীরে লইয়া যাওয়া হইল।

বৈতরণীর খেয়া ঘাটের পার্শ্বে যাদবচন্দ্রের দেহ রক্ষিত হইল। চিতা সজ্জিত হইল। যাদবচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা ও বন্ধু বান্ধবেরা কাঁদিয়া আকুল। সেই ক্রন্দন-রোলের মধ্যে সহসা গুরুগম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ শ্রুত হইল—"স্থিরো ভব।"

সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় জটাজুটধারী মহাতেজোদীপ্ত প্রশান্তবদন সন্ন্যাসী মুমূর্ষু যাদবচন্দ্রের নিকটে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসীকে দেখিবা-মাত্র সকলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। বিপদের সময় সন্ন্যাসীকে দেখিলে কে আশান্বিত না হয়?

যাদবচন্দ্রের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "এ ব্যক্তি মরে নাই—এক্ষণে মরিবেও না। কেন ইহাকে আনিলে?"

বলিয়া তিনি মুমূর্ষুকে তীক্ষ্ণনয়নে লক্ষ্য করিলেন। যে কারণেই হউক সত্বর যাদবচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চার হইল। ক্রমে তিনি উঠিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে একটু জল লইয়া যাদবচন্দ্রের মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন করিলেন। স্বল্পকালমধ্যে যাদবচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার জীবনদাতা সন্ন্যাসীর চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া সকাতরে বলিলেন, "ঠাকুর, আমাকে মন্ত্র দান কর।"

সন্ন্যাসী মন্ত্রপ্রদান করিতে প্রথমে অসম্মত হইলেন; পরে যাদবচন্দ্রের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া মন্ত্রদানে সম্মত হইলেন। কিন্তু সেদিন সন্ন্যাসী মন্ত্র দেন নাই, যাদবচন্দ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলে, শুভদিনে শুভক্ষণে জনশূন্য বৈতরণী-তীরে বসিয়া যাদব-চন্দ্রকে দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষান্তে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী ও সুখী হইবে, তোমার ঔরসে পুণ্যময় সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। মান সম্ভ্রম ধন ধর্ম্ম, কিছুরই তোমার অভাব হইবে না।"

সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইয়া যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে আবার প্রভুর দর্শন পাইব?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "তোমার এ দেহে তুমি আমার তিন বার দর্শন পাইবে। একবার মধ্যজীবনে,—বিদেশে; দ্বিতীয় বার তোমার মৃত্যুর অষ্টাহপূর্ব্বে; তৃতীয় বার তোমার মৃত্যুর সময়।"

যাদবচন্দ্র বলিলেন, "আপনার অনুপস্থিতিতে এ দীর্ঘ সময় আমি কি লইয়া থাকিব ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী স্বীয় চরণ হইতে খড়ম জোড়াটি খুলিয়া যাদবচন্দ্রকে প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন, "এই খড়ম তুমি পূজা করিও—"

সন্ন্যাসী আর একটি জিনিষ যাদবচন্দ্রকে দিয়াছিলেন,—পৈতা। এ পৈতা জলা

হইতে প্রস্তুত নহে। আমি বাল্যকালে তাহা দেখিয়াছি। পার্ব্বত্য বৃক্ষবিশেষের ত্বক্ হইতে এই পৈতা নির্ম্মিত এইরূপ শুনিয়াছিলাম।

যাদবচন্দ্র এ পৈতা কখনও গলায় পরেন নাই; প্রাতঃ সন্ধ্যায় মস্তকে ধারণ করিতেন। খড়ম চিরদিন—প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া পূজা করিয়াছিলেন। অবশেষে ১২৮৭ সালে যখন তাঁহার পবিত্র দেহ গঙ্গাতীরে নীত হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে পৈতা ও খড়মও গিয়াছিল। তিন জিনিষ এক চিতায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল।

যাদবচন্দ্র

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্র স্বহস্তে আত্ম-জীবনী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। কোনও কোনও অংশ পাঠকের বিরক্তি-উৎপাদনের ভয়ে পরিত্যাগ করিলাম।—

"সন ১২০১ সালে ১৮ই পৌষ তারিখে আমি জন্মিয়াছি। জন্মাবধি ১৫।১৬ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতাম, যে হেতু আমার ধাত বড় শ্লৈষ্মিক ছিল। এ জন্য স্বর্গীয় পিতা মাতা সর্ব্বদা আমাকে নিকটে নিকটে রাখিতেন। স্বল্প সময়ে পাঠশালায় লেখাপড়া করিতাম, কিন্তু গুরুমহাশয় প্রভৃতি আমাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না।

নবম বৎসরে উপনয়ন হয়। দশম বৎসরে কর্ণমূল ফুলিয়া আমার জ্বর বিকার হয়। কর্ণমূলে অস্ত্র হইলে গলার ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। এতাদৃশ ঘা হইয়াছিল যে, ঐ রোগে গঙ্গাযাত্রা হেতু উপর হইতে আমাকে বাহির-বাটীতে আনা হইয়াছিল, পরে পরমায়ু থাকায় রক্ষা পাইলাম।

১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কিতাবাদি লেখা পড়া যাহা শিক্ষা হইবার হইল। ১২ বৎসর বয়সে পার্শি পড়িতে আরম্ভ করি। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উহা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস পাঠান্তর উহা ভাল লাগিল না; পুনরায় পার্শি পড়িতে আরম্ভ করিলাম; কৃতবিদ্য হওনের অত্যল্পকাল বাকী থাকিতে, অর্থাৎ আল্লামি, উর্কি, হাফেজ এই তিন কেতাব বাকী থাকিতে আমার হামসবক (সহপাঠী) এবং পরমবন্ধু বিষ্ণুমোহন মিত্রের ভ্রাতা মথুরমোহন মিত্র ও মধুসূদন মিত্র লোকান্তরে গমন করিলেন। আমার পড়িতে আর ইচ্ছা হইল না। আমি বাটীতে না জানাইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম, এবং ভগবতীচরণ মিত্রের নিকটে পরিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহপাত্র হইলাম। তিনি পার্শি, ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই মাস কাল আমাকে পড়াইলেন বটে, আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগিল না, আমার মন, সর্ব্বদা উচাটন থাকিত। পরে বাটী আসিয়া, ছয় মাস পর্য্যন্ত ব্যায়াম যোগ করিলাম।

রোগের উপশম হইলে ৺জগন্নাথ-দর্শনের ইচ্ছা করিলাম। পিতা মাতা প্রভৃতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কটক অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নারায়ণ-গড়ের সরহদ্দে 'ব্রহ্মচারী লীলা বানৃদির' সন্নিকটে যেখানে রাস্তার উপর পুল আছে, সেখানে পৌঁছিয়া রৌদ্রে কাতর হইয়া পড়িলাম। একখানি ধুতি উড়ানি, আর কাপড়ের খোঁটে কয়েকটি টাকা বাঁধা ছিল। সে সব রাখিয়া জলে নামিলাম। অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া শীতল হওনান্তর ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলাম যে, বস্ত্র ও টাকা নাই।

বড় ক্ষুধা হইয়াছিল। পয়সার অভাবে আহার্য্য কিনিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা ২।৩ টার সময় কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী ঠাকুরচরণ রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কটক জেলার রডাই নামক এক আডঙ্গের পোক্তানি দারোগা। তিনি আপন কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে?'

উত্তরে আমূল সকল কথা বলিলাম। পরিচয় দিলাম। পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সস্নেহে আমার হস্ত ধারণান্তর কহিলেন, 'তুমি কাশীর ভাই? বেশ আমার সঙ্গে এস। এই স্থানে লোক ঠেঙ্গাইয়া মারে, তুমি কেমন করিয়া এতক্ষণ বাঁচিয়া আছ ইহাই আশ্চর্য্য।'

পরে রড়াই পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া লোক-সঙ্গে দিয়া ভদরক মোকামে দাদার নিকট পাঠাইলেন। দাদা আমার প্রতি দৃষ্টিমাত্র বুঝিলেন, আমি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন।

কয়েক রোজ ভদরকে থাকিয়া কটকে গেলাম। তথায় বিশ্বমোহন মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন; জানিলেন, মথুরের বন্ধু যাদব। অনেক রোদন করিলেন। দুই দিবস আমাকে দেখিলেন না। ভিন্ন ঘরে মথুরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সেই স্নেহে রাখিলেন।

কয়েক দিবস পরে শোক শান্তি হইলে তিনি আমাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। সদরআলা জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নীলমণি আর তাঁহার পারিষদ নবীন গাঙ্গুলী, নিমকির দেওয়ানের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বসু ও হরিহর রায় প্রভৃতি কয়েক জন শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমার ঈপ্সিত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলাম।

জগন্নাথদেবের রত্নবেদীর চতুষ্পার্শ বড় অন্ধকার-ময়। লোকের ভিড়ও খুব। প্রদক্ষিণ করিবার সময় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিল। কম্পিতকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিলাম, নীলমণি দাদা, আমি মরিলাম।

নীলমণি ও নবীন বড় জোয়ান ও সাহসী। তাঁহারা সেই রত্নবেদীর দেওয়ালে আমাকে ঠেলা দিয়া রাখিয়া দুই জন দুই দিকে হস্ত প্রসারিয়া দাঁড়াইলেন। সে স্থানে

কেহ আসিতে পারিল না। পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম; তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে শূন্যভরে লইয়া অক্ষয় বট তলায় ফেলিলেন। অনেকক্ষণ জল সেচন ও ব্যজন করিতে করিতে আমার চৈতন্য হইল। আমার সঙ্গীদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে দিবস আমার প্রাণ রক্ষা হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে দাদার কর্ম্মোন্নতি ঘটিল। তাঁহার সেই পদে আমি ১৮১৭* খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে নিযুক্ত হইলাম। হরিনাথ সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। এই আঠার বৎসর বয়সে আমি বৈতরণী নদীর কিনারায় যাজপুর মোকামের নমক চৌকীর দারোগা হইলাম। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে একবার কিছু দিনের জন্য দাদার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হই। ঘোড়ায় চড়িয়া আমায় তদারক করিতে হইত। এক দিবস তদারকে বহির্গত হইয়াছি। কোনও এক সরাইয়ের কিঞ্চিৎ দূরে একটা কাঁটাজঙ্গল ছিল। ঘোড়া ক্ষেপিয়া সেই জঙ্গলে আমাকে ফেলিয়া দিয়া একটা পদাঘাত করিল; দ্বিতীয় পদাঘাত সময়ে তাহার কদমে কি বাজিল,—সে কাত্‌ হইয়া অন্যদিকে পড়িল। আমার সঙ্গী চাপরাশি ছুটিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিল—ডাকিল, উত্তর পাইল না। পারে কাঁটাজঙ্গল কাটিয়া আমাকে বাহির করিয়া সরাইতে লইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইল। কয়েক দিবস তথায় থাকিলাম। ঘোড়া আর দুই এক কদম মারিলে বাঁচিতাম না, দিগম্বর মিত্রের পুত্রের ন্যায় হইতাম।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বালিহন্তায় বদলি হইলাম। প্রবাদ আছে, এইখানে বালিরাজার মৃত্যু হয়। এই চৌকিতে আসিতে না আসিতে শুনিলাম, সমুদ্রের লোণা সৈবালিতে দরিয়া কিনারায় অনেক মানুষ গোরু ভাসিয়া যাইতেছে। তা'তে সরকারি নমকের ক্ষতি হয়। আড়ঙ্গ মুড়মালঙ্গ ও সাত ভেয়ে তদারকের ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়। আমি মুড়মালঙ্গে পৌঁছিয়া তিনশত মণ চোরাই নমক মায় কিস্তি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। দরিয়ার একস্থানে যথায় মাইপহরা নামক বাতিঘর আছে, তাহারই সন্নিকটে—দরিয়ার উপকূলে—মুড়মালঙ্গ।

* * * *

কটক পৌঁছিলে চার্লস বিচর সাহেব এজেন্ট আমার প্রতি তুষ্ট হন। সেই সময় বিষ্ণুমোহন মিত্র (ভদরক মোকামের রিটেল গোলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) কর্ম্ম হইতে অপসৃত হন। সাহেব আমাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কিছু দিন কাজ করিবার পর কটক জেলা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল; ভদরক রিটেল গোলা বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। সার জন্‌ ডাউনি সাহেব তথাকার এজেন্ট হইলেন। অম্বরি ফেকরত নামক কোনও ব্যক্তি দেওয়ান হইলেন। তিনিই কর্ত্তা। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ভদরক-গোলা বড় উপার্জ্জনের স্থান। তখন তিনি আমাকে বরখাস্ত

* ১৮১২ হওয়া সম্ভব; কেন না, ১৮১২ সালে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর।

করিয়া আমার স্থানে তাঁহার ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া এক রোবকারি লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন, যাদবচন্দ্র বালক এবং অনুপযুক্ত—এতাদৃশ ভারি কর্ম্মের যোগ্য নহেন। আমার বদ্‌লি দারোগা আসিয়া পৌঁছিল। আমার জিম্মায় তহবিলে তখন সাত আট হাজার টাকা ছিল। তহবিল বুঝিয়া লইবার সময় নূতন দারোগা আপন তসবি অর্থাৎ জপের মালায় সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, কাগজ কলমে না লিখিয়া জপের মালায় সংখ্যা রাখিলে ভুল হইবে। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অবশেষে টাকার রসিদ দিবার সময়, তিনি দস্তখতের স্থানে নামের মোহর করিয়া কহিলেন, "আমরা এইরূপে দস্তখত করিয়া থাকি, তুমি রিপোর্ট করিলে জানিতে পারিবে।"

আমি ঐ রসিদ রিপোর্ট সহ পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিলাম যে, "আমার স্থানে যে ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি তহবিলের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় জপের মালায় সংখ্যা রাখেন, এবং রসিদে দস্তখত না করিয়া নামের মোহর দিয়াছেন। ইহা হুজুরে মঞ্জুর হইবে কি না জানি না।" তখন উইলিয়ম বেলেন্ট সাহেব কমিশনর ছিলেন। তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া আমাকে তলব করিলেন, এবং আমার সাক্ষাতে উইলি সাহেবকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিকে সারথা আড়ঙ্গে পোক্তানি দারোগাগিরি কর্ম্মে বাহাল কর।"

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি সারথা আড়ঙ্গে বাহাল হইলাম। তথায় একদিন ডোঙ্গায় করিয়া একটা লোণা নদী পার হইতেছিলাম। সহসা ডোঙ্গা উল্টাইয়া গেল, আমি ডুবিয়া গেলাম। মাঝি রক্ষা করিল, নতুবা সে যাত্রা মরিতাম। ১৮২৪ সালে দনমঙ্গল আড়ঙ্গে, ১৮২৫ সালে অন্য একটা আড়ঙ্গে বদলি হই। তৎকালে ব্রজমোহন ঘোষাল নমকির দেওয়ান। তাঁহার অত্যাচারে আমি তিষ্ঠিতে না পারিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। ১৮২৭ সালে ডাউনি সাহেব আমাকে তলব করিয়া মলঙ্গ আড়ঙ্গের দারোগাগিরি কর্ম্ম দেন। তথায় ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করি। ঐ সময় হেন্‌রি রিকেট সাহেব বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন। ব্রজমোহন ঘোষালের দৌরাত্ম্যের কথা তিনি অবগত ছিলেন। এমন সময় ডাউনি সাহেব বদলি হইলেন, এবং রিকেট সাহেব তাঁহার স্থানে নমকির এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। নিমকি এলাকায় ছোট বড় ছয় শত কর্ম্মচারী ছিল, প্রায় সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ব্রজমোহন সস্‌পেণ্ড হইলেন। ব্রজনন্দ দাস নামে একজন বাঙ্গালী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। আমিও অপরাধী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার বিচার হয় নাই।

আমার অপরাধের বিচার জন্য রিকেট সাহেব আমাকে বালেশ্বরে তলব করিলেন। আমি তিন শত বেহারা মালঙ্গি লইয়া হাজির হইলাম। আমার মুহুরি দুই জনে ভয়ে হাজির হইল না। সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঘুস লইয়া থাক?"

উত্তর। না; আর ঘুস লইয়া কে কোথায় স্বীকার করিয়া থাকে?

সাহেব আরও রাগিয়া কহিলেন, 'হলপানে হলপ করিয়া বল।'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাপ্রসাদ বা গঙ্গাজল যবন-স্পৃষ্ট হইলে মহত্ত্ব হারায়। এ হলপ লইয়া শতবার বলিতে পারি, যে হেতু ইহার মহত্ব নাই। কিন্তু আসল হলপ, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ, আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা অপেক্ষা অন্য হলপ বড় নয়, শাস্ত্রে এইরূপ বলে।'

সাহেব। তুমি কি পণ্ডিত ?

আমি। পণ্ডিত নহি, পণ্ডিতসমাজে বাস করি।

সাহেব। মণ্ডলঘাট পণ্ডিত সমাজ ?

আমি। মণ্ডলঘাটে পণ্ডিত লোক আছে বটে, কিন্তু সেটা চাসা-গ্রাম। আমার বাসস্থান গঙ্গার ধারে—হুগলির নিকট। তথায় অনেক পণ্ডিত ও সভ্যলোক আছেন।

সাহেব। ব্রজমোহন ঘোষাল তোমার কে ?

আমি। কেহ নহে—আমার সঙ্গে কোন সুবাদও নাই।

সাহেব। তোমাকে কে চাকরী দিয়াছে ?

আমি। কটক জেলার এজেন্ট চার্লস বিচর সাহেব।

সাহেব। কতদিন চাকরী করিতেছ ?

আমি। দশ বৎসর।

হলফ মকুব হইল।

দাদন করিতে করিতে সাহেব মলঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা ১৬ কুড়ি খোরাকি নমক পাও, তাহা ওজনে ৮ মণ। আর গাছা নমক ৮ মণ পাও। এই ১৬ মণ নমক তোমরা কি কর ?'

উত্তর। আমরা খাইয়া থাকি।

সাহেব সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি বলিলাম, 'মলঙ্গি লোক আপন আপন প্রাপ্য এক বিন্দুও খায় না ; দোকানি নমক হইতে দৈনিক খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। খোরাকি নমক বিক্রয় করে।'

সাহেব। তোমার জানত বিক্রয় হয় ?

আমি। হাঁ ; বরং আমি আপন দস্তখত মোহরে ছাড় চিঠি দিয়া বিক্রয় করাই।

সাহেব। সরকারের চাকর হইয়া তুমি এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাক ? তোমায় সসপেণ্ড করিলাম।

আমি। আপনি সব করিতে পারেন, কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করিতে দিতে আজ্ঞা হয়।

সাহেব। কি, বল।

আমি। মালঙ্গি লোক অতি দুঃখী ; পরিধানে বস্ত্র নাই—এক টুকরা ন্যাকড়া অবলম্বন, দেহে বা কেশে তেল নাই—রুক্ষ অপরিষ্কার, আহার্য্য—ভাত,

পুঁইডাঁটা, কাঁকড়া আর লবণ। আট মাস পোক্তানে থাকে, চারি মাস ছুটি পায়। এই চারি মাস ঘরে গিয়া চাষ করে। জমিদার খাজনার জন্য পীড়ন করিলে চাষের ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দেয়। তখন আহারের উপায় আর থাকে না।* * যে সকল স্থানে নমক দুষ্প্রাপ্য, অথবা মহার্ঘ, সেই সকল স্থানের মলঙ্গির নামে আপন দস্তখত মোহরে ছাড চিঠি লিখিয়া দিয়া থাকি। ইহা অমুক আইনের অমুক ধারার বিধান অনুসারে অবিধি নয়। ফলে তাহারা বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমিদারের খাজনা দিতে এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়।* * *

রিকেট সাহেব প্রজাপালক, ন্যায়বান্, তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিয়া মালঙ্গিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত টাকা এই দারোগাকে ঘুষ দিয়া থাক? আর ইহার উপর তোমাদের কোনও নালিশ আছে?'

সকলে এক জবানে কহিল, "কোনও নালিশ নাই, আমরা ঘুষ দিই না।"

তিন জন মালঙ্গি কহিল, 'এক দিবস আমরা দৈনিক খাইবার নমক (এক এক সের হইবেক) লইয়া যাইতেছিলাম। দারোগা তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোক করিয়া লইলেন; এবং চাপরাসি মহসিল দিয়া বালেশ্বর লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। পরে চাপরাসিকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন। চাপরাসি আমাদিগকে সরকারি গোলায় লইযা গিয়া আপনার খাবার নমক হইতে তিন জনকে তিন সের নমক দিল, এবং আমাদিকে বাটিতে রাখিয়া আসিয়া কহিল, 'এমত কর্ম্ম আর করিও না।' অন্য মালঙ্গিরা ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল, তাদের কিছু হ'ল না। আমরা ধরা পড়িলাম। তাই এ শাস্তি। অতএব ইনি পক্ষপাত।'

সাহেব হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীর বদনে কহিলেন, 'দারোগা বাবুকে আর এখানে রাখিব না।'

কথিত তিন জন মালঙ্গি শ্রবণমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বলিল, 'এ দারোগা না থাকিলে আমরা পোক্তান করিব না।'

এই কথা শুনিবামাত্র তিন শত মালঙ্গি একেবারে হরিবোল দিয়া উঠিল। সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এই দারোগা তোমাদের থাকিবেক।' পরে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি অত্য মাক্সুল হইতে, কিন্তু তুমি প্রজাপালক ও সত্যবাদী; যদি তোমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। তুমি ব্রজমোহন ঘোষালের আত্মীয় হইলে বোধ হয় ক্ষমা করিতে পারিতাম না। আগামী সালে তোমায় বড় আড়ঙ্গের কর্ম্ম দিব। তুমি আট মাস কর্ম্ম করিয়া চার মাস আমার হুজুরে হাজির হইবে। রিটেল গোলার নমক চালানি যাহা ব্রজমোহনের ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম। ইহাতে বৎসরে দেড় হাজার টাকা কিফাত পাইবা।'

* * * * *

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের কালেক্টরি তহবিল তছরুপাত হইল। খাজাঞ্চিকে বরতরফ করিয়া কালেক্টার ইষ্টেনীফোরত সাহেব, গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাইকে খাজাঞ্চিগিরি কর্ম্ম দিলেন। কিন্তু গভর্মেণ্ট ইষ্টেনীফোরত সাহেবকেও সরাইলেন। তাঁহার স্থানে ডনেলি সাহেব আসিলেন। রিকেট সাহেব কমিশনার হইলেন। তিনি ডনেলি সাহেবকে আদেশ করিলেন, 'গোঁসাইকে তাড়াইয়া যাদবচন্দ্রকে সেই স্থানে নিযুক্ত করিবে।'

১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সাল দুই বৎসর খাজাঞ্চিগিরি কর্ম্ম করিলাম। ডনেলি সাহেব সন্তুষ্ট হইযা হেড কেরাণি জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায এবং আমার নাম কমিশনারের নিকট পাঠাইযা ডিপুটি কালেক্টরির পদের জন্য রিকমেণ্ড করিলেন। রিকেট সাহেব জগবন্ধুব নাম কাটিযা আমাকে রিকমেণ্ড করিলেন। ১৮৩৮ সালে জানুয়ারী মাহায় আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলাম।

১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, হিজলি ও অন্যান্য স্থানে বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সালেব নভেম্বর মাহায চব্বিশ পরগণায বদলি হইলাম। একবার খাড়িজুড়ি বন্দোবস্ত করিতে গিযা বনের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িযাছিলাম। বাঘ ১০।১২ হাত তফাতে ছিল। সঙ্গের লোক চীৎকার করাতে বাঘ পলাইয়া গেল।

১৮৫২ সালে বর্দ্ধমানে বদলি হই। ১৮৫৩ সালে হুগলি আসি। তথা হইতে আবাব বর্দ্ধমান। অবশেষে ১৮৫৭ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কবি। পেন্সন্ হয মাসিক ২২৫ টাকা। এক্ষণে আমার চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—ডিপুটি কলেক্টর, মধ্যম শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র—ডিপুটি কলেক্টর, পবে রেজিষ্ট্রার, তৃতীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র—ডিপুটি কলেক্টর, চতুর্থ শ্রীপূর্ণচন্দ্র—রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত আছেন, ৪২ বৎসর চাকুরী করি। এক্ষণে আমার বযস ৭৯ বৎসর।

ইতি ১৫ই বৈশাখ ১২৭৯ সাল।*"

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ কৃষ্ণ-দশমী তিথিতে। তখন তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর।

* আত্মজীবনীর কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। স্থানে স্থানে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সকল শব্দ পড়িতে না পারায় এরূপ করিতে হইয়াছে।

এই আত্মজীবনীতে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই এবং যে ঘটনা হইতে তাঁহার গুরুলাভ হয়, সে ঘটনারও কোনও উল্লেখ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম

বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৬১ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন—খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮। সময়—১৩ই আষাঢ়—ইংরাজী ২৭শে জুন—রাত্রি ৯টা। আষাঢ় মাসের রজনী হইলেও আকাশ তখন নির্ম্মল ও মেঘশূন্য ছিল। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জননী প্রসববেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা কাহাকেও তিনি বলেন নাই। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে প্রসববেদনা বাড়িয়া উঠিল। তখন সূতিকাগার পরিষ্কৃত হইল, এবং ধাত্রী ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক ছুটিল। পাড়াগাঁয়ে ধাই, Midwifery পড়ে নাই—শিক্ষাও পায় নাই। মহাঅস্ত্র বাকারির ছাল লইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, এবং পরীক্ষান্তে মহাগম্ভীর বদনে বলিলেন, "আজ রাতে প্রসব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

তা'র ক্ষণকাল পরেই সূতিকাগার প্রকম্পিত করিয়া সহসা শঙ্খধ্বনি হইল। পুত্র দেখিতে কেহ কেহ সূতিকাগারে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন, সূতিকাগার আলো করিয়া নব প্রসূত সন্তান মাতৃঅঙ্কে শায়িত রহিয়াছেন।

শৈশব

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবের কথা বড একটা কেহ অবগত নহে। যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা একে একে অপসৃত হইয়াছেন। যাহা শুনা যায়, তাহা জনশ্রুতিমাত্র। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলিতে সাহস হয় না। দুই চারিটা কথা যাহা আমি বাল্যকালে গুরুজনদের নিকট শুনিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পঞ্চম বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের 'হাতে খড়ি' হয়। 'খড়ি' দিলেন, আমাদের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য। বালক বঙ্কিম কম্পিত হস্তে খড়ি উঠাইয়া লইয়া বঙ্গসাহিত্য গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিক্ষার ভার গ্রাম্যপাঠশালায় গুরুমহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইল। গুরুমহাশয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। বঙ্কিমচন্দ্র এই সরকার মহাশয়ের চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে অঙ্কিত করিতে ছাড়েন নাই। —"গ্রাম্য কথা"র গুরুমহাশয়কে যখন ভোদার সুপণ্ডিতা জননীর সঙ্গে 'ভূত' শব্দ লইয়া মহাকলহে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিলাম,

তখন রামপ্রাণ সরকারের কথা স্বতঃই আমার মনে পড়িল।

গুরুমহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য ; যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপর তাঁহার জীবিকা কতকটা নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের সম্পত্তি। পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।

'ক' 'খ' পড়াইতে গিয়া গুরুমহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন, পূর্ব্বজন্মান্তরীণ স্মৃতি, অথবা অসামান্য প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহায্য করিতেছে। যে বর্ণমালার পরিচয় করিতে সাধারণ বালকের পনর দিন, এক মাস লাগে, সে বর্ণমালা বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে পঞ্চম বৎসর বয়সে শিক্ষা করিলেন। তখন 'বর্ণপরিচয়' ছিল না, 'শিশুবোধক' ছিল। 'অলস' 'অবশ' তুল্য বাক্যাবলী শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দুই এক দণ্ড মাত্র লাগিয়াছিল। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তৎকালে গুরুমহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'অলস' 'অবশ' পড়িলেই 'যশম' 'পশম' পড়া হইল—পাতা উল্টাইয়া যান।" গুরুমহাশয়, 'গীত' 'কীট' আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তত্তুল্য কথাগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে শিক্ষা করিয়া নূতন কিছু শিখিতে চাহিলেন। গুরুমহাশয় সাতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা বঙ্কিম, এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব ?"

তা'র আট নয় মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে পিতার কাছে চলিয়া গেলেন। যাদবচন্দ্র তখন তথায় ডিপুটী কালেক্টার।

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে আসিয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ইংরাজি বর্ণমালা শিক্ষা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কয় দিন লাগিয়াছিল, তাহা জানি না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দেব্‌রা থানার জনৈক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একদা স্কুলের সম্মুখস্থ পথ দিয়া জনৈক খোট্টা বানর লইয়া ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বানর দেখিতে ছুটিলেন। তৎপ্রতি নিমেষশূন্য নয়নে চাহিতে চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাঁদরটাকে এনে, আমাদের কেলাসে ভর্ত্তি ক'রে দিলে হয় ; দেখি ইংরাজি শিখ্‌তে পারে কিনা।"

বঙ্কিমচন্দ্র বাঁদর দেখিয়া যখন ক্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি শিক্ষক কর্ত্তৃক পাঠে অমনোযোগিতার জন্য বিশেষরূপে ভৎ´সিত হইলেন। তিরস্কৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যুদ্দীপ্তনয়নে শিক্ষকের পানে একবার চাহিলেন, তা'র পর তাঁহার স্থানে বসিয়া এক সপ্তাহের পাঠ এক ঘন্টায় আয়ত্ত করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বালকসুলভ কোনও ক্রীড়ার অনুরাগী ছিলেন না। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া বালকেরা কতরকম ছুটাছুটি খেলা করিত, কত রকম ব্যায়াম করিত ; বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সে সব খেলায় অভিনেতৃরূপে, অথবা দর্শকরূপে যোগদান করিতেন না। তিনি তাস খেলিতে ভালবাসিতেন ; বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দুই তিন জন সমবয়স্ক

বালক লইয়া তিনি তাস খেলিতে বসিতেন। এ অভ্যাস মেদিনীপুরে ছিল, এবং হুগলি কালেজে বিদ্যাধ্যয়নকালেও ছিল। যাদবচন্দ্র ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণায় বদলি হইয়া আসেন, এবং তিন বৎসর পরে বর্দ্ধমানে বদলি হ'ন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে আর পিতার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে ঘুরিতে হয় নাই। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাল্য কথা' সম্বন্ধে পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"সে কালের পল্লীগ্রামমাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে। হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ সন্তান, বড রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, "লেখ্ লেখ্ শূয়াররা" বলিয়া চীৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়োকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন, "'মারি' 'মারি', আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ী তাস খেল্‌তে যাও নাই?" বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত কোন কোনদিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টি-সাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেই জন্য দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত, সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি কাহাকে ভাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। স্কুলে, কলেজে, তাঁহার সমধ্যায়ীদিগের উপর ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখক হইলেন, তখন অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক একজনই বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে, রমেশচন্দ্র দত্ত,

চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাঙ্গালা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্য্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম, কোন একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমত সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক, ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাততাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটি জুতা পায়ে ফট ফট শব্দে পলাইলেন। এক ব্যক্তি এক বাজরা বেগুণ লইয়া নৈহাটীর বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তা ঘাট নির্জ্জন হইল। সকল বাটীর দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ীর দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরুমহাশয় প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া আমাদের বাটীর দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন, সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্ম্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত, কিন্তু পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যে স্থানে সূর্য্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙ্গায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার গোরারা আমাদের গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমত সময়ে একদল গোরা আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থির ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলাইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটীর উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে "বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটা এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখ্‌তে চায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই

ঝারা ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না, একজন ভাল Executive Officer ছিলেন, তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি পিতৃদত্ত একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটিতে কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী আসিয়া, উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতের ভয় করেন নাই; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে, একদল ডাকাত আমাদের বাটীতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটী ছিলেন না, জেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে স্ত্রীলোকেরা ও আমরা চার ভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন, কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইব না।" পিসেমহাশয় বলিলেন "তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক্।" বঙ্কিম বলিলেন, "কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়ীতে ত অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগ্দি যাহারা এক একজন লাঠিয়াল, ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য কি যে ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়।" তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বঙ্কিমেরই পরামর্শ মতে কার্য্য হইল। কয় রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ী পাহারা দিত। ডাকাত আসিয়া ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলিয়া ডাকিত।"

বিবাহ

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর। কাঁটালপাড়ার নিকট নারায়ণপুর গ্রামে একটি পরমসৌন্দর্য্যময়ী বালিকা ছিল। তাহার পিতার নাম, নবকুমার চক্রবর্ত্তী। বালিকার বয়স তখন পঞ্চম বৎসর মাত্র। পঞ্চম বৎসর হইলেও বালিকার রূপের বিভা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ পঞ্চমবর্ষীয় বালিকার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বালিকার যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি একদিন অনবধানপ্রযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িয়া পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার শোণিততুল্য পাণ্ডুলিপি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি অতিশয়

ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া পুতুলকে শোয়ালে না কেন?" সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, "আমি কাগজগুলো আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।" বঙ্কিমচন্দ্র অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি কি মনে কর, আমি আর লিখিতে পারি না! আজই লিখিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র নির্জ্জন কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সে দিন রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। অনুতপ্তা বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, লিখেছি কি না।" জানি না, বঙ্কিমচন্দ্র সে দিন কি লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাইশ বৎসরে পদার্পণ করেন, তখন তিনি বিপত্নীক হ'ন। ফুটিবার আগেই ফুল শুকাইয়া গেল।—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা পত্নী ষোড়শ বৎসর বয়সে জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন যশোহরে। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষকে তিনি অশ্রুজল দেখান নাই। বুঝি গর্ব্ব অন্তরায় হইত। তিনি বাল্যকালে লিখিয়াছিলেন,—

"—মনে করি কাঁদিব না রব অন্ধকারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার॥"

—তিনি যৌবনে বা প্রৌঢ়ে মানুষকে কখনও নয়নাশ্রু দেখান নাই বলিয়া আমার মনে হয়।

মাসের পর মাস গড়াইয়া চলিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহিত করিতে কেহ সমর্থ হইল না। পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন নাই, অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের আদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় মাতাপিতাকে ভক্তি করিতে আমি বড় একটা কাহাকেও দেখি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন মাতাপিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিবাহে সম্মত হইলেন। তখন চারিদিকে পাত্রী অনুসন্ধানের ঘটা পড়িয়া গেল। কয়েকজন ঘটক নিযুক্ত হইয়াছিল। সঞ্জীবচন্দ্র একটী সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। ক'নে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাহার গর্ব্ব অত্যধিক। সঞ্জীবচন্দ্র যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মামার বাড়ী কোথায়?" তখন সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়াছিল, "কে জানে বাপু কোথায়! আমি সেখানে কখনও যাই না।" সঞ্জীবচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন।

তার পর পাত্রী অনুসন্ধানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। একখানা বাসোপযোগী বড় বোট ভাড়া করা হইল। স্থির হইল, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র, নৌকা আরোহণে পাত্রী অনুসন্ধানার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। জানি না, কি মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গী হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাসমাদরে তাঁহাকে বজরায় গ্রহণ করা হইল।

তারানাথ অথবা তারাচাঁদ নামধেয় হালিসহরনিবাসী জনৈক ভদ্রসন্তান, একটি পাত্রীর কথা লইয়া কাঁটালপাড়ায় কযেক দিন যাতায়াত করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহার কথায় কাণ দেন নাই। অবশেষে যখন সাহিত্য-রথিত্রয় পাত্রী অনুসন্ধানে মহাডম্বর সহকারে যাত্রা করিলেন, তখন তারানাথ পূর্ব্বোক্ত পাত্রী দেখিবার জন্য তাঁহাদের হালিসহরে নামিতে অনুরোধ করিলেন। হালিসহর কাঁটালপাড়া হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হালিসহরের সন্নিকটে বাঁশবেড়িয়া। আমার মনে হইতেছে, এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়। নৌকারোহিরা তারানাথের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হালিসহর অতিক্রম করিয়া চলিলেন, এবং দীনবন্ধু বাবুর শ্বশুরালয়ে রাত্রিযাপন করিবার মানস করিলেন।

বাঁশবেড়িয়াতেও তারানাথ গিয়া উপস্থিত; এবং মেয়ে দেখিবার জন্য তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন, বলিলেন, "এত নিকটে যখন আসিয়াছি, তখন দেখিয়া গেলে ক্ষতি কি? অন্ততঃ তারানাথের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব।"

তিন জনে মেয়ে দেখিতে আসিলেন। মেয়ে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হইল। মেয়ে কিন্তু রুগ্ন, শীর্ণকায়—রোগশয্যা হইতে সম্প্রতি উঠিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্র আদৌ মেয়ে পছন্দ করিলেন না। কিন্তু তাহাতে আসিয়া গেল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি ইহাকে বিবাহ করিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিপত্নীক হইবার আট মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সেই মেয়ে—সেই স্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা পত্নী—রাজলক্ষ্মী দেবী।

ইংরাজি শিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি শিক্ষা মেদিনীপুর স্কুলে আরম্ভ হয়—প্রেসিডেন্সি কালেজে শেষ হয়। মধ্যকাল আট নয় বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। সে সময় **Entrance** বা **First Arts** বা **B. A** পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই। তখন

Junior, Senior Scholarship পরীক্ষা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর হইতে আসিয়া একাদশ বৎসর বয়সে হুগলি কালেজে স্কুল বিভাগে ভর্ত্তি হইলেন।

সেখানে তাঁহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও মেধা শক্তি শিক্ষকদের চিত্তাকর্ষণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা একবার শুনিতেন তাহা শীঘ্র ভুলিতেন না। যে প্রকৃতির অঙ্ক একটা কষিয়াছেন, সে প্রকৃতির অঙ্ক আর তাঁহাকে কষিতে হইত না। তিনি নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারিতেন না। যখন বিদ্যালযে Keightly, Elphinstoneর ইতিহাস পডান হইতেছে, তখন তিনি Hume, Macaulayর ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। যখন ক্লাসে Rule of Three শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি Discount কষিতেছেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

শুধু অগ্রণী নয়, তিনি কোন বন্ধনের মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাল্যকাল বা কৈশোরে তিনি দীর্ঘকাল একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। পাঠে তন্ময় হইয়া বেশীক্ষণ একাসনে বসিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যৌবনে এ চাঞ্চল্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হয়, এটা প্রতিভার চাঞ্চল্য। অনলরাশি হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত হইলে বসুধা যেমন ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠে, তেমনই সঞ্চিত শক্তিরাশি যতক্ষণ না নির্গমন পথ খুঁজিয়া পায়, ততক্ষণ মহাশক্তিশালী ব্যক্তিকে অস্থির করিয়া তুলে। প্রৌঢেও বঙ্কিমচন্দ্রের চাঞ্চল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই; তবে কতকটা সংযত হইয়াছিল; এমন কি লিখিতে লিখিতে তিনি বহুবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেন—বহুবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতেন। শয্যায় বসিয়া থাকিলেও ক্ষণে ক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেন। কাছারিতে রাজকার্য্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার সময়ও তিনি প্রথম প্রথম নিয়ত হস্তপদ সঞ্চালন করিতেন। ক্রমে এ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে এ চাঞ্চল্য বড একটা দেখি নাই; তবে শেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু ছিল বলিয়া মনে হয়।

স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকাবলীর মধ্যে মন আবদ্ধ রাখিতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সমর্থ হইতেন না; তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত। হুগলী কালেজের সুবৃহৎ লাইব্রেরি মন্থন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, কাব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক কোথায় পডিয়া রহিল; গৃহে বা বিদ্যালয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সে সকল পুস্তকের পানে ক্ষণেকের জন্যও চাহিয়া দেখিতেন না। তবে যখন বাৎসরিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্য পুস্তক ঝাড়িয়া গুছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিতেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে সচরাচর দেখা যাইত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের নিকট কৈশোরে পাঠশিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এক্ষণে জীবিত নাই; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও কেহ জীবিত ছিলেন না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী কালেজে আমার পঠদ্দশায় শুনিয়াছি। কোন শিক্ষক বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য প্রতিভাবান্

ছাত্র, দ্বারকানাথ মিত্র ব্যতীত হুগলি কালেজে আর কেহ আসেন নাই। উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া তিনি বলিতেন, "মেধাশক্তিতে দ্বারকানাথ শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথের উপর যাইতেন।" আমরা মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাদের গল্প শুনিতাম। হুগলি কালেজ প্রায় পঁচাত্তর বর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সহস্র সহস্র ছাত্র আসিল, গেল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বারকানাথের তুল্য ছাত্র হুগলি কালেজে আর কখন আসেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোর বড় সুখে কাটিয়াছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে সকল সময়ই তিনি পুস্তক লইয়া বিভোর থাকিতেন। তিনি এক সময় পরিণত বয়সে জনৈক সহপাঠীর নিকট বলিয়াছিলেন, "আমি পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ জগতে আর কিছুতেই পাই না।" যৌবনের শেষভাগে বহরমপুরে অবস্থান কালে তিনি মুন্সেফ নফরবাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, "পুস্তক লিখিয়া আমি যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

অপরাহ্নটুকু বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কাজের জন্য রাখিতেন। ছুটাছুটি অথবা ব্যায়াম করিতেন না। তিনি একটি বাগান করিয়াছিলেন; সেই বাগানে অপরাহ্ন অতিবাহিত করিতেন। কোনও দিন খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। কোনও দিন বা তাস খেলিতে বসিতেন।

বাগান খানি বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে কয়েক বিঘা জমির উপর তিনি এক উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যানের নাম ছিল, ফুল-বাগান। বাগানের কিয়দংশে ফুলগাছ ছিল; অবশিষ্টাংশ ফলের গাছে সমাচ্ছাদিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজের উদ্যান হইতে ভাল ভাল গাছ আনিয়া 'ফুল-বাগানে' স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন।

এই বাগানের মধ্যে অর্জ্জুনা দীঘীর তটে তিনি একখানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত, লতাগুল্ম-সমাচ্ছাদিত। যেখানে গৃহ ছিল, সেখানে এখন কয়েকখানি ইট পড়িয়া আছে, তদ্ব্যতীত সে মনোহর ফুল-বাগানের— সে চারুদর্শন উদ্যান-বাটীর কোনও চিহ্ন নাই। আর চিহ্ন আছে, "কৃষ্ণকান্তের উইলে"; বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা যখন পড়ি, তখনই আমার অর্জ্জুনা দীঘীর কথা মনে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র এ উদ্যান ছাড়িয়া সময় সময় খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। খাল, গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা মাত্র; ভাটপাড়া ও কাঁটালপাড়ার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জলাভূমির মধ্যে দেহ সংগোপন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ হইতে খাল বেশী দূর নয়,—অর্জ্জুনা দীঘীর কিছু দক্ষিণ দিয়া খাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার পথটি বড় দুর্গম, ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্গম পথ একাকী অতিক্রম করিয়া কখন কখন খালের ধারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লতাবিতান তলে বসিতেন।

বসিয়া কখন 'শস্যশ্যামল' প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'তরঙ্গপরম্পরা-

বিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদমালা বিভূষিত' আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতেন, কখন 'জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থিরমূর্ত্তিতে' বসিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালার তরঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। কখন কখন বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার সময় খালের ভিতর নৌকা লইয়া যাইতেন। তীরবর্ত্তী গাছ সকল ঝুঁকিয়া পড়িয়া নৌকার উপর একটা অবিচ্ছিন্ন খিলান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত। সূর্য্যের আলোক তথায় অপরিস্ফুট। খালের দুই ধারের দৃশ্য কিছু কিছু ললিতায় আছে, কিন্তু এখানে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কখন কবিতা লিখিতেন না।

কবিতা লিখিতেন গৃহে, কবিতা লিখিতেন ফুলবাগানে। লিখিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছা হইত তখনই লিখিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন। শুনিয়াছি, সচরাচর তিনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পুস্তক ফেলিয়া শয়ন করিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কৈশোরে ও নবযৌবনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বলকায় ছিলেন। দুর্ব্বল হইলেও তিনি সাহসী ছিলেন। শুধু সাহসী নয়; আমার মনে হয়, তিনি বাল্যকাল হইতেই অদৃষ্টবাদী ছিলেন। খালের দুর্গম পথে সন্ধ্যার পর বড একটা কেহ যাইতে সাহস করিত না, সর্প শৃগাল তথায় যথেষ্ট ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন দিন এই পথে নির্ভীক হৃদয়ে সন্ধ্যার পর একাকী গৃহে ফিরিতেন। তাঁহার এ সাহস গঙ্গাপার হইবার সময়ও দেখিয়াছি। বাল্যকালে একদিন অপরাহ্নে হুগলি কালেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণবাবু ও জনৈক দরিদ্র আত্মীয় ছিলেন। নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন, আকাশের উত্তর প্রান্তে নিবিড মেঘ। মেঘ দেখিয়া অনেকেই নৌকা খুলিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের মাঝি মহেশ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, নৌকা ছাড়িব কি ?"

বঙ্কিমচন্দ্র আকাশপানে নেত্রপাত করিয়া বলিলেন, "ছাড়"। আত্মীয়টি তখন সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "না মহেশ, নৌকা ছেড় না—মেঘ উঠেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রতিবাদে কোনও উত্তর করিলেন না। মহেশ নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আর একদিন প্রাতঃকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া হুগলি কালেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। বৈশাখ মাস। কালেজ সকালে বসিত। ফিরিতে বেলা সাড়ে দশটা, এগারটা হইত। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কোনও দিন গঙ্গা হইতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিন বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী যাইবার মানস করিলেন; তদভিপ্রায়ে মাঝিকে তেল আনিতে পাঠাইলেন। ঘাটের উপরেই কলুর ঘর। মাঝি তেল আনিতে গেল। নৌকায় দুই ভাই ছাড়া আর কেহ রহিল না। বড় বড় ঢেউ আসিয়া নৌকায় লাগিতেছিল। এমন সময় একজন দুর্ব্বৃত্ত চুপি চুপি আসিয়া খোঁটা হইতে নৌকার দড়ি খুলিয়া দিল। দুই ভাই অন্যমনস্ক ছিলেন; প্রথমে তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন নাই। তার পর নৌকা যখন তীর ছাড়িয়া চলিল, তখন তাঁহারা

কিনারা পানে চাহিয়া দেখিলেন। যে দুর্ব্বৃত্ত এ কাজ করিয়াছিল, তাহার নাম আমার নিকট কেহ প্রকাশ করেন নাই। এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ভদ্রসন্তান এবং আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিল। সে যাহা হউক, নৌকা ক্রমে গভীরতর জলে গিয়া পড়িল; হালে বা দাঁড়ে মাঝি নাই। চারিদিক হইতে বড় বড় ঢেউ আসিয়া নৌকার উপর পড়িতে লাগিল। পূজনীয় পূর্ণচন্দ্র মহাভীত হইয়া পড়িলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের লেশ নাই। নৌকা কেমন ঘুরিতেছিল, তিনি হাস্যবদনে তাহাই দেখিতেছিলেন। পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র হাল ধরিতে জানিতেন, তিনি হাল ধরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তরঙ্গশিরে কর্ণধারহীন নৌকার উদ্দাম নর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন। পরে অন্য নৌকা আসিয়া তাঁহাদের বিপন্মুক্ত করিল। এ বিপদেও তাঁহাকে ভীত বা বিচলিত হইতে দেখি নাই।

যৌবনে খুলনায় অবস্থান কালে তাঁহার সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছি। রূপসা নদীর মোহনা পার হইবার সময় একদা আকাশে মেঘাড়ম্বর করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভীত না হইয়া নৌকায় উঠিলেন। দীনবন্ধুবাবু ও জনৈক ওভারসিয়ার তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। সহযাত্রীরা মেঘ দেখিয়া নৌকায় উঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিষেধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিষেধ না শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নৌকায় উঠিলেন, এবং প্রবল ঝড়ের মধ্যে প্রশান্তচিত্তে গল্প করিতে করিতে মোহানা পার হইলেন। প্রৌঢ়ে—বহরমপুর অবস্থান কালে—তাঁহার সাহস ও তেজের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এইরূপ দুর্ব্বল ক্ষীণকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস ও তেজ বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি। আমার মনে হয়, এটা শুধু সাহস নয়, এটা অদৃষ্টের উপর নির্ভরতা।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ঘোড়ায় চড়েন নাই। ভয়-প্রযুক্ত যে চড়েন নাই, এরূপ আমার মনে হয় না। একবার ঘোড়ায় চড়িয়া যদি ভয় পাইয়া দ্বিতীয়বার চড়িতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, তিনি ভীরু। আসল কথা আমাদের গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ঘোড়া ছিল না। ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষাও তাঁহাকে দিতে হয় নাই। সুতরাং ঘোড়ায় চড়িবার সুযোগ বা প্রয়োজন তাঁহার কোন কালে উপস্থিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বড় পাহাড়ে কখন উঠিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু বিখ্যাত কুতব মিনারে একবার উঠিয়াছিলেন। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে যে উঠিয়াছিলেন, তাহা "সীতারাম" পড়িয়া কতকটা বুঝিতে পারি, পর্ব্বতারোহণ তাঁহার শক্তিতে কুলাইত না, তাই বোধ হয় তিনি কখন উচ্চ পর্ব্বত-চুড়ে আরোহণ করেন নাই।

সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কালেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন আরও দুইটি প্রতিভাবান্ যুবক বাঙ্গালার দুইটি সুবিখ্যাত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। একজনের নাম দীনবন্ধু মিত্র, অপরের নাম দ্বারকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু বাবু কলিকাতা হিন্দু কালেজে পড়িতেন, দ্বারকানাথ কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতেন। দুই জনেই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দীনবন্ধু বাবু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নয় বৎসরের বড। দ্বারকানাথের বিশেষ কোনও পরিচয় জানি না।

এই তিনজন শক্তিশালী নবীন যুবকের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সত্বর পরিচয় হইল। সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা বড শোচনীয় ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই তখন সাহিত্য-সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন সম্রাট। তাঁহার একখানি কাগজ ছিল; তাহার নাম "সম্বাদ-প্রভাকর"। প্রভাকর দৈনিক ছিল—প্রভাকর মাসিক ছিল। প্রাত্যহিক, অর্থাৎ দৈনিক প্রভাকর রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হইত। দক্ষিণা, —"মাসিক মূল্য ১ তঙ্কা মাত্র"। প্রভাকর-যন্ত্র কলিকাতায় ছিল। কিছুকাল হেদুয়ার নিকটে থাকিযা হোগলকুঁড়িয়ায় উঠিয়া যায়।

গুপ্ত-কবি আরও একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তাহার নাম, "সাধুরঞ্জন"। "সাধুরঞ্জনে"র আকার ক্ষুদ্র ছিল, প্রভাকরেরও তাই। মোটে দুই খানা পাতা, তাও আবার দৈর্ঘ্যে ফুলস্কাপ কাগজের চেয়ে ছোট। ছাপা হইত ঘুঁড়ির কাগজে। সে রকম কাগজে এখন প্রুফও দেয় না।

দেশীয় সংবাদ পত্রের অবস্থা সে সময় কিরূপ ছিল ও কি ভাবে অবস্থা উন্নত হইল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে Contemporary Review* হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

"That the early growth of the native Press was but slow, can be judged from the fact that, in 1850, after 28 years of existence, there were but 28 vernacular papers in existence in all North India with an annual circulation of about 60 copies, while in 1878 there were 97 vernacular papers in active circulation, and in 1880 there were 230 with a circulation of 150,000 copies. The first

* Volume xxx vii ; Page 461.

vernacular newspaper was printed in 1818, at Serampur. In 1890-91, there were 463 vernacular papers."

আমি কিন্তু উপরের হিসাবে ততটা আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কেননা, দেখিতে পাই ১২৬০ সালের প্রারম্ভে অনেকগুলি বাঙ্গালা কাগজ বর্ত্তমান ছিল। নীচে তাহাদের হিসাব দিলাম :—

সংবাদ প্রভাকর	দৈনিক	সংবাদ পত্র।
" পূর্ণচন্দ্রোদয়	ঐ	ঐ।
" ভাস্কর	বারত্রয়িক	ঐ।
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা	পাক্ষিক	ঐ।
সংবাদ সাধুরঞ্জন	সাপ্তাহিক	সংবাদ পত্র।
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ	ঐ	ঐ।
বর্দ্ধমান জ্ঞান-প্রদায়িনী	ঐ	ঐ।
সংবাদ বর্দ্ধমান	ঐ	ঐ।
সংবাদ জ্ঞানোদয়	ঐ	ঐ।
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	ঐ	ঐ।
রসরাজ	অর্দ্ধসাপ্তাহিক	ঐ।
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা	ঐ	ঐ।
উপদেশক	মাসিক	ধর্ম্মপত্র।
সত্যার্ণব	মাসিক	ঐ।
বিবিধার্থ সংগ্রহ	মাসিক	নানা বিষয়ক।
ধর্ম্মরাজ	ঐ	ঐ।

এই সতর খানি কাগজ ১২৬০ সালের বৈশাখ মাসে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যমান ছিল। এতৎ পূর্ব্বে ৭৬ খানি বাঙ্গালা কাগজ ছিল; তাহারা জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া কালস্রোতে মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাদের তালিকা দিয়া পাঠকদের আর জ্বালাতন করিলাম না।

এই শুধু বাঙ্গালার কথা। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত কাগজ ছিল। উল্লিখিত তালিকার উপর নির্ভর করিলে রিভিউয়ের হিসাবে অবিশ্বাস করিতে হয়। যে হিসাবটাই সত্য হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, তখনকার দিনে সংবাদ পত্রের অবস্থা শোচনীয় ছিল। শোচনীয় হইলেও প্রভাকর সকলের উপর স্থান লইয়াছিল। এই শ্রেষ্ঠ কাগজ প্রভাকরে কিরূপ ভাবে পদ্য লেখা হইত, নিম্নে তাহার একটু পরিচয় দিলাম।—

অনৈক্য কবি লিখিলেন,—

পাপানল খর খর, জ্বলিতেছে গর গর
সর সর ওহে বন্ধুগণ।

গুপ্ত-কবি লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর,
পরিমাণে ধন দানে গৌরব প্রচুর,
বাবা গৌরব প্রচুর।

পরে আবার লিখিলেন,—

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার ময়,
বাবা অন্ধকার ময়।

প্রভাকরে তখন অনেকেই কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রভাকরসম্পাদক সেই ছাত্রমণ্ডলীর গুরু এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। সকল ছাত্রের নাম করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কিরূপ লিখিতেন তাহাও জানাইবার প্রয়োজন নাই; শুধু তিন জন ছাত্র লিখিত কাব্যের একটু পরিচয় দিব। তৎপূর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপ লিখিতেন, তাহা তাঁহার প্রভাকরের দুই তিন স্থান হইতে একটু একটু তুলিয়া দেখাইব।—

১। প্রভাকর, ১২৬০ সাল, ১লা বৈশাখ।—

অম্বুদ অম্বর, গহন শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়
বিরাজিত তুমি তাহে॥
পৃথিবী সলিল, অনল অনিল,
রবি শশী আর তারা।
নিয়ম তোমার করিযা প্রচার
পরিচয় দেয় তারা॥

২। প্রভাকর, ১৭৭৫ শকাব্দা, ৯ জ্যৈষ্ঠ।—

ভাবি মনে, স্নিগ্ধ হ'ব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥

৩। প্রভাকর, ১২৬১ সাল, ১লা জ্যৈষ্ঠ।—

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়॥

আর কত ঘুরিবে হে মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ বেলায় বেলায়॥
ভূতে করে হাড় গুড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায়॥

৪। প্রভাকর, ১লা শ্রাবণ, ১২৬০ সাল।—

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীসর্ব্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পরম পিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

সেবকানুসেবক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য প্রণামা শত সহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ—মহাশয়ের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ প্রণত সেবকের সমস্তই মঙ্গল জানিবেন। বিশেষতঃ আপনার মঙ্গলেই আমাদিগের মঙ্গল। ইত্যাদি।

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারকানাথের কবিতার একটু পরিচয় দিব।

১। এখন যেরূপ সাজ, প্রকাশিতে হয় লাজ,
তথাপি শুনহ গুণগ্রাম।
ধর্ম্ম ত্রিলোকের স্বামী, তাঁহার তনয়া আমি,
জগতে সতীত্ব মম নাম॥

২। একদিন স্বপ্নে কোন অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক পরম সুন্দরী নারী জীর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত দিয়া বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা আছেন এবং তাঁহার নয়ন যুগল অজস্র অশ্রু নিস্রাব কবিতেছে।

৩। কেবল তোমার পাশ, যাইয়া করিবে বাস,
সদা এই অভিলাষ, মন মোর করে লো,
ভবে নাই হেন জন, বিনে তুমি প্রাণধন,
আর করে নিবেদন, তাপিত অন্তরে লো॥

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু বাবুর রচনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব।—

১। কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে প্রস্তর বা অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজস্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্ট কথা রূপ বারি বপনদ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক।

২। জামাই ষষ্ঠী।

(যুবকের) তাপ বাড়ে, কমে যত, তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে, বাড়িছে বিলাপ॥
—মনের আঁধার যায়, দেখিয়া আঁধার
নিশিতে প্রণয় নীরে দিবেন সাঁতার॥
—মেয়ের মায়ের মন, রসে টল মল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া কমল॥
জামাই সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।

বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল ॥
—নির্জ্জনে নলিনী সনে, কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ ॥
—কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে ভাবিয়া না পাই।
পরিণত বিধুমুখ তাহে কথা নাই ॥
রূপের গৌরবে বুঝি হ'য়ে গরবিনী।
প্রেমাধীন জনে, দুখ দেও আদরিণী ॥
—তব সনে প্রণয়িনী এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন ॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর ॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুরঝির ঠাঁই।
তুমি প্রাণ হও মোর ঠাকুর জামাই ॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল ॥*

বাল্য-রচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, প্রভাকর হইতে আর তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। দুই চারি বৎসর পরে হয়ত প্রভাকরও আর পাওয়া যাইবে না। আমি তাঁহার বাল্য রচনাগুলি রক্ষা করিবার মানসে নিম্নে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা বিরক্ত বোধ করিবেন, তাঁহারা যেন এ অংশটুকু বাদ দিয়া যান। আমি কোনও রচনার পরিবর্ত্তন বা বর্ণশুদ্ধি না করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

প্রথম কবিতা।

শিশির বর্ণনা ছলে স্ত্রী পতির কথোপকথন।

লঘুললিত।

স্ত্রী। হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।

* এই "জামাই ষষ্ঠী" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "জামাই ষষ্ঠী" যে সংখ্যক 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল।"

আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন,
সে বন এখন, নাহিক সয়॥
সুখদ মলয়, হইলেক লয়,
এলো হিমালয় শীতল অতি।
পদার্থ সকল, সমীরণ জল,
কি কাল শীতল হলো সম্প্রতি॥
সকল শীতল, করয় বিকল,
কিন্তু অপরূপ, নিরখি তায়।
সমস্ত শীতল, প্রতপ্ত কেবল,
বোধ হয় প্রাণ তোমার গায়॥
পতি। মোরে নিরন্তর, তব নেত্রকর,
পাবক প্রখর, দাহন করে।
মম দেহোপর, বহ্নি খর তর,
তাই উষ্ণভাব এ দেহে ধরে॥
স্ত্রী। কেন বিভাবরী, দীর্ঘ দেহ ধরি,
ধরায় বিরহি রহে এখন।
ত্যজিতে ধরণী, না চায় রজনী,
বল গুণমণি, শুনি কারণ॥
পতি। নয়ন মুদিয়ে, থাক ঘুমাইয়ে
তখনি হেরিয়ে তোমার মুখ
সতী বিভাবরী, শশীজ্ঞান করি,
হেরি প্রাণপতি পায় কি সুখ॥
আছে যতক্ষণ, শশী প্রাণ ধন,
পাইয়ে রতন না ত্যজে তায়।
তাই বিভাবরী, পতি বোধ করি,
বহুক্ষণ ধরি রয় ধরায়॥
কিন্তু লো যেক্ষণে নিদ্রার ভঞ্জনে,
চাহিয়া নয়নে, উঠ প্রভাতে।
হেরি ও নয়নে নিশা ভাবি মনে,
কুমুদী সতিনী, পালায় তাতে।
স্ত্রী। অতিশয় ঘন, বল কি কারণ,
নিরখি প্রভাতে এ কুজ্ঝটিকা।
কেন সব হয়, ধূমাকার ময়,
কি ধূম হইল, ধরা ব্যাপিকা॥

পতি। এবে আর দর্প, না করে কন্দর্প,
তাহার কারণ শুন ইহায়।
তব নিকেতন, আসিল মদন,
আপন যাতন, দিতে তোমায়॥
কিন্তু তব স্থান হরের সমান,
যে বহ্নি নয়নে সে ভস্ম হয়।
তাই ধনি তার, শক্তি সে প্রকার,
অবনীতে আর নাহিক রয়॥
ভস্ম হইল শর, তার কলেবর,
প্রবল দহনে, দাহন হয়।
দাহনে ধূম, ব্যাপে নভোভূম
ভ্রমেতে কুআশা, লোকে কয়॥
স্ত্রী। কি কারণ প্রাণ, শঙ্কর সমান,
মোরে কর জ্ঞান উন্মত্ত প্রায়।
কোথায় কি মম হের হর সম,
তোমারে বুঝাতে হল দায়॥
পতি। বিবেচনা করি, তোবে প্রাণেশ্বরী,
বলি ত্রিপুরবি, প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ, সব বিলক্ষণ,
তোমার অঙ্গেতে, তুলনা হয়॥
হরের ইন্দুর, সমান সীন্দুর
শিরেলো তোমার, কি শোভা পায়।
সদা শিরোপরি, আছ সিঁথিপরি,
তিন ধারা ধরি, গঙ্গা খেলায়॥
স্কন্ধ শিরোপরে, হবের বিহরে,
সদা ফণিবরে, ভীষণ অতি।
বেণী ফণিবর, তব নিরন্তর,
স্কন্ধ শিরোপর, রয় তেমতি॥
সেই মত হরে, কণ্ঠে বিষধরে,
তেমতি গরল তুমিও ধর।
কিন্তু কণ্ঠে নয়, কিছু অধো রয়,
বিশেষিয়া বলি, ও পয়োধর॥
যে গরল হরে, কণ্ঠ দেশে ধরে
কাছে না এলে সে নাশিতে নারে।

কিন্তু পয়োধরে যে গরল ধরে,
দূর হইতেই মানবে মারে ॥
যদি বল প্রিয়ে, কণ্ঠে না রহিয়ে,
অধোভাগে কেন, গরল রয়।
কণ্ঠে রৈলে তবে, মুখ কাছে রবে
মুখামৃতে বিষ নিস্তেজ হয় ॥
স্ত্রী। কি মূঢ় মানব কোলে নিজ সব,
দুরন্ত পাবক, লয়েছে টানি।
বিশ্বাসঘাতক, সেই সে পাবক,
করিবে দহন তাহা না জানি ॥
পতি। দোষ দাও পরে, নিজ দোষাপরে,
দৃষ্টি নাহি কর কি অপরূপ।
আপনি কেমনে আপন নয়নে,
রেখেছো অনল, কহ স্বরূপ ॥
স্ত্রী। তবে প্রেমাধার রাখিব না আর,
নয়নে আমার, কাল অনল।
দেখ প্রাণ ধন, মুদিয়া নয়ন,
তাড়াই আগুন, শয্যায় চল ॥
পতি। যদি তুমি প্রাণ নাহি দিলে স্থান,
কোথায় অনল যাইবে আর।
পৃথিবীতে আর স্থান নাহি তার,
তাহে বলী শীত বিপক্ষ তার ॥
যাইবে যথায়, যাইবে তথায়,
দুরন্ত শাত্রব, শীত ধাইয়ে।
এমতে ধরায় নাহি স্থান পায়,
শেষে জলে যায়, রয় ডুবিয়ে ॥
তাই দেখ কাল, নিশা শেষকাল,
উঠে জল হোতে ধূমের রাশি।
তাই বলি প্রিয়ে, স্থান না পাইয়ে,
হয়েছে অনল সলিল রাশি ॥

দ্বিতীয় কবিতা।

বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ।

কামিনী

ত্রিপদী

দেখি কি হে ভয়ঙ্কর, গরজিয়ে গর গর,
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নবনীল নিরুপম, অর্দ্ধ-তমস্বিনী সম,
জ্বলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে॥
ঘন ঘোর গরজনে, বিদারে গগনে বনে,
তীক্ষ্ণ তীর সম বরিষয়।
বল বল প্রাণনাথ, কেন কেন অকস্মাৎ,
গরজন বরিষণ হয়॥

পতি

প্রাণেশ্বরী শুন শুন, যে কারণে পুন পুন,
গরজন বরিষণ হয়।
অতিশয় দম্ভ ভরে, বর্ষা আগমন করে,
সঙ্গে সব সহচর হয॥
ভেবেছিল যুবরাজ, নাহি ভুবনের মাঝ,
রূপবান তাহাব সমান।
সে গর্ব্ব হইল নাশ, হারিল তোমার পাশ,
বরষার পূর্ণ অপমান॥
নিবিড় চাঁচর তব, তাহে কাদম্বিনী নব,
রূপেতে কি রূপে তোমা সমা।
তব মৃদু হাসি স্থানে, পদে পদে অপমানে
দুখিনী দামিনী নিরুপমা॥
মরি কি সুন্দর পশি, মুদিতা সুন্দরাবসি,
কোমল কমল কলি জলে।
তাহে পরাজিত করে, তোমার হৃদয়োপরে,
নব কুচ কলিকা যুগলে॥
বর্ষার পল্লব নব, তা' হ'তে অধর তব,
শতগুণে সুকোমল শোভা।
নদ নদী জলে টলে, তা' হ'তে যৌবন জলে,

তব দেহ কিবা মনোলোভা ॥
আর দেখো করিবরে, বরষায় মত্ত করে
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে
চিৎকার করিছে কুঞ্জর ॥
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্ব্বের সার,
তব কুচে পূর্ণ মান নাশ।
মেঘে রবি ঢাকা ঢাকি, কেশেতে সিন্দুর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ ॥
পদে পদে এইরূপে, হারিয়া তোমার রূপে,
কত অপমান বরষার।
এত দুখ সহিবারে, বরষা নাহিক পারে,
রোদন করিছে অনিবার ॥
সে রোদনে অনিবার, পড়ে বৃষ্টি ধার তার,
ঘননাদ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
তাই প্রাণ নিরন্তর, বরষিছে জলধর,
তাই মেঘ গর্জ্জে অনিবারে ॥

কামিনী

বিঘোর নীরদোপরে, কত হাব ভাব ভরে,
চপলা চঞ্চলা চমকায়।
কেন কেন ক্ষণপ্রভা, ক্ষণেক প্রকাশি প্রভা,
ক্ষণপরে বারিদে লুকায় ॥

পতি

গিরির শিখর পরে, থাকে যত জলধরে,
দেখিল তোমার কুচগিরি।
পরিহরি সে ভূধরে রৈতে পয়োধর পরে,
আসিতে লাগিল ধিরি ধিরি ॥
এসে দেখে হায় হায়, নীলবস্ত্র মেঘে তায়,
বসিয়াছে মনের পুলকে।
ক্রুদ্ধে মেঘ নাহি রক্ষে, অগ্নি শিখে উঠে চক্ষে,
তাই সখি বিদ্যুৎ চমকে ॥
জলধর ক্রোধ মনে, আদেশিল সমীরণে,

উড়াইতে বুকের বসন।
তাই বায়ু আসে ডেকে, যাবে বুক খুলে রেখে,
ধরিয়ে রাখিবে কতক্ষণ ॥

কামিনী

আগে ছিল সুধাকর, বিমল কোমল কর
নিরমল গগন মণ্ডলে।
এখন কেন গো শশী, গগন মণ্ডলে পশি
ঢাকিয়াছে জলদ সকলে ॥

পতি

তোমার সমান হতে, শশধর বিধিমতে,
বাঞ্ছা করে আকাশে থাকিয়া।
দেখে তুমি কর মান, জেনে সে মানের মান,
মুখ মেঘ বসনে ঢাকিয়া ॥
বৃষ্টি ধারে ধীরে ধীবে, ফেলিয়া অশ্রুর নীরে,
ম্লানমুখে করিয়াছে মান ॥
হলো কিনা তোমা মত, দেখিবারে অবিরত,
ক্ষণে ক্ষণে হয় দৃশ্যমান ॥

কামিনী

খর কর ধরি রবি, মেঘে ঢাকা দেখে ছবি
নহে প্রকাশিত প্রভাকর।
না হেরি পতির মুখে, নয়ন মুদিয়া দুখে,
কমলিনী কতই কাতর ॥
সাধে কি সকলে কয়, পুরুষ পরস-ময়,
কি কঠিন তাদের হৃদয়।
এই দেখ দিনকর, কেমন নিদয়ান্তর,
রমণীরে কেমন নির্দ্দয় ॥
কমলিনী যাঁর তরে, সতত বিলাপ করে,
মৌনমুখী মুদিত নয়ন।
দয়া করি সেও তায়, ফিরিয়া নাহিক চায়,
সদা করে প্রাণে জ্বালাতন ॥

পতি

গুণমণি দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না বুঝিয়ে দোষ দিবাকরে।
নলিনীর পেয়ে দোষ, দিনেশ করেছে রোষ,

তার সনে দেখা নাহি করে ॥
তব মুখে কমলিনী, কোলে ধরে বিনোদিনী,
সিন্দুরের বিন্দু প্রভাকর।
কোলে অন্য দিবাকর, কমলিনী কলেবর,
দেখিয়ে ম্লান দিনেশ ঈশ্বর ॥
মনে জানিলেন দড়, নলিনী অসতী বড়,
নাহি করে মুখ দরশন।
গুণমণি দিনমণি, কেন লো রমণি মণি,
না জানিয়া দোষলো তপন ॥

কামিনী

এ সময় মধুকরে, কি জ্বালায় জ্বলে মরে,
মুদিত সকল শতদল।
যদি কোন পদ্ম পায়, অপ্রফুল্ল দেখে তায়,
মধুহীন যতন বিফল ॥
ভ্রমে ভ্রমি সে ভ্রমরে, যদ্যপি গমন করে,
অন্য কমলিনী নিকেতন।
মৃণাল কন্টকে লেগে, ছিন্ন অঙ্গ হয়ে রেগে,
অন্য পদ্মে করিলে গমন ॥
অপ্রকাশ্য সেই কলি, বাতাস লাগিল বলি,
হেলে দুলে ফেরে তাহা হতে।
নিরুপায় নিরাশায়, শেষে মধুকর যায়,
কলিকা উপরে স্থান লতে ॥

পতি

আ মরিলো এ অধীনে, সেই মত একদিনে,
ঘটাইলে প্রাণের রতন।
তুমি লো কমলবন, ছয় পদ্ম সুশোভন,
কর পদ হৃদয় বদন ॥
যবে প্রিয়ে মান করি, মজাইলে প্রাণেশ্বরি,
লক্ষ্য করি মুখ শতদল।
গিয়ে তার মধুপানে, তৃপ্ত করিবারে প্রাণে,
অপ্রফুল্ল দেখি সে কমল ॥
তাহাতে বঞ্চিলে ছলে, যাই কর শতদলে,
হাতে ধরে ঘুচাইতে মান।
গহনা মৃণালে কাঁটা, অঙ্গুলি যাইল কাটা,

পরে পাদ পদ পড়ি প্রাণ ॥
হেলে দুলে সে কমলে, লুটাইয়া শতদলে,
ফিরাইলে প্রাণের ললনা।
শেষে যাই কলিপরে, শোভিছে যা' হৃদি পরে,
দূরে গেল মানের ছলনা ॥

কামিনী

বল বল তারাচয়, কেন কেন ম্লান হয়,
ছিল কিবা শোভাকর কর।

পতি

যামিনী কামিনী সতী, লইয়ে যামিনী পতি,
বিলাসিছে মেঘের ভিতর ॥
পাছে বা দেখিতে পাই, নিভাইয়ে দেছে তাই,
আকাশের দীপ তারাগণে।
তবুও তো নিরন্তর, স্থির নহে শশধর,
উঁকি মেরে দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥

কামিনী

পেয়ে নীর ধর নীর, পূর্ণাকার ধরে নীর,
আহা মরি শোভা তার কত।
জলপূর্ণ সরোবর, যদ্যপিহে মোহকর,
কমলিনী বিনে শোভা হত ॥

পতি

নালো প্রাণ মনোহর, দেখিতেছি সরোবর,
সরোজিনী সহ শোভা পায়।
ধরণী সলিলাবৃতা, যেন সরো সুশোভিতা,
তুমি প্রাণ কমলিনী তায় ॥

কামিনী

এর বা কারণ কিবা, এই বরষার দিবা,
দীর্ঘ দেহ করেছে ধারণ।
কমে গেছে তমস্বিনী, তবু তাহে বিষাদিনী,
বিরহিনী বিনোদিনী-গণ ॥

পতি

সুমেরু শিখর আর, ও কুচ ভূধরাকার,
এ তিন শিখর নিরখিয়ে।
হইল তপন ব্যস্ত, কোন্‌টায় যাবে অস্ত,

তাই ভাবে বিলম্ব করিয়া ॥
ঘন ঘোর ঘন অতি, ঢেকেছে যামিনী পতি,
বিরহিনী বিষাদে রজনী।
কেঁদে কেঁদে বুক ফাটি, দুখে দেহ করে মাটি,
যৌবনেই মরে গেল ধনী ॥

তৃতীয় কবিতা।

দূরদেশ গমনের বিদায়।

পতি

ললিত।

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবাব,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি-লো।
আজিকার নিশি ভোরে, লযে যাবে কোথা মোরে,
কতদিন তোমা বিনে, বহিব কি কবি-লো ॥
বিদরে বিদবে বুক, হেবিব না বিধুমুখ,
বিধুমুখ হাসি ভরা, রব স্বপ্নে স্মরি-লো।
আসি কিনা আসি ফিরে, হেরি কিনা প্রেযসীবে,
জানিনে জানিনে কিছু, বাঁচি কিনা মরি-লো ॥
হেরি কিনা হেবি আর, শশিমুখে ফিরে বার,
জনমেব মত তাই হেবি ভাল করি-লো।
সেই শেষ সুখ মরি, বিধি বুঝি লয হবি,
বুঝি নিশি পোহাইল, তাই হৃদে ডবি-লো ॥
কি শুনি কি শুনি ধনি, কুহু কুহু করি ধ্বনি,
হৃদযে শিহবি মরি, যে শুনেছি কাণে-বে।
বুঝেছি বুঝেছি মরি, পোহাইল বিভাবরী,
পোহাইল পোহাইল, মন তা না মানে-রে ॥
হা রজনি একবার, রহ বহ রহ আর,
একবার চাহি আমি, চন্দ্রমুখী পানে-রে ॥
মুখ পানে চেয়ে রই, নয়নে নয়নে হই,
একবার দীর্ঘশ্বাস, সলিল নয়নে-রে ॥
একবার মরি মরি, হৃদয়ে হৃদয়ে করি,
অধরে অধর ধরি, জুড়াইব প্রাণে রে।
ধরি হৃদি হৃদি পরে, কত দিবসের তরে,

জনমের মত কিনা, কে জানে কে জানে রে
নালো নালো মিছে বলি, যামিনী গিয়াছে চলি,
ফিরিবে না, ফিরিবে না, ফিরিবার নয়-লো।
ওই দেখ নীল নিশি, মৃদু আলো সনে মিশি,
করিছে বিঘোর আলো, চারিদিগ্ময়-লো।
অসীম আকাশে পশি, নাহি রবি নাহি শশী,
গগনে নিভেছে যেন, যত তারাচয়-লো।
কি বলি গগনোপরে, একাকি মধুর করে,
প্রভাতের সুখতারা, কিবা শোভা হয় লো॥
এখনি আকাশোপর, প্রকাশিবে প্রভাকর,
এখনি যাইব কোথা, ভেবে হৃদি দয়-লো।
আসিলো আসিলো প্রিয়ে, আসিলো বিদায় নিয়ে,
চলিলাম কতদূরে কি কপালে রয় লো॥
যথা যাব তথা রব, প্রেমডোরে বাঁধা তব,
অন্তরে অন্তরে বাঁধা, প্রণয়েরি পাশে লো।
স্বপনে নয়নে মনে, হেরিব সে চন্দ্রাননে,
হেরিব সে বিধুমুখ, মৃদু মৃদু হাসে-লো॥
তোমা চিন্তা সর্ব্বক্ষণে, শয়নে স্বপনে মনে,
এক আশে রবে প্রাণ, ফিরি দেখা আশে-লো।
সুখ শশী হলে হারা, একা প্রভাতের তারা,
হবে মোর অন্ধকার, হৃদয় আকাশে লো॥

স্ত্রী

ত্রিপদী।

কেন অরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন রে যামিনী ভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না॥
জেনেছি জেনেছি আগে, যখন যামিনী ভাগে
হৃদি মোর হইল চঞ্চল।
তখনি জেনেছি মনে, পাইব প্রাণেরি জনে
যাবে মোর যা আছে সকল॥
তখনি ভেবেছি মনে, কেন কেন কি কারণে
হৃদি মোর চঞ্চল বিকল।

কেন রে অস্থির হিয়া, ক্ষণে উঠি শিহরিয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিছে কেবল ॥
প্রাণনাথ হৃদি পরে, হৃদি পরশিলে পরে,
অস্থির হৃদয় হব স্থির।
স্বর্গসুখ সম হিযে, তদুপরে হৃদি দিয়ে,
কত সুখে ঘুমাই গভীর ॥
মরি মরি সে প্রকার, যাইতে পাবনা আর,
নিদ্রা তব হৃদির উপর।
হৃদিপরে হৃদি দিযে, পযোধর পরশিয়ে,
জুড়াব না কাতর অন্তর ॥
সেথানে যতেক জ্বালা, নাহি করে ঝালাপালা
শুধু যত সুখের স্বপন।
আর কি মধুরাকার, হেরিব না ফিরে বার,
শশধর সমান বদন ॥
নয়নে নয়নে করি, অধর অধরোপরি,
করিব না কি আর চুম্বন।
আর কিহে করে করে, মিলাব না পরস্পরে,
স্কন্ধে কর করিয়ে ধারণ ॥
নাহে নাহে সুখকালে, হয়েছে অতীত।
বিরহ বারিধি মাঝে, হয়েছি পতিত ॥
জানি জানি সেই জ্বালা, অহরহ ঝালাপালা,
করিবে আমারে মনে মনে।
না দেখে প্রিয়ের মুখ, একেলা দাহিবে বুক,
মানাগুণে গোপনে গোপনে ॥
শুধু প্রাণনাথ আশা, রবে এক হৃদে আশা,
সপ্রবল শয়নে স্বপনে।
আসা দিন অনুরাগী, রব প্রাণে তার লাগী,
শুধু সেই দিন আসামনে ॥
যেন যাবে বিভাবরী, তমসা বসন পরি,
শশধর না করে প্রকাশ।
যদ্যপি তাহারোপরে, ভয়ঙ্কর জলধরে,
তাহা সহ ঢাকয়ে আকাশ ॥
নিবিড় তিমিরময়, শুধু দরশন হয়,
শশী তারা নাহিক আকাশে।

শুধু ভেদি জলধর, যদি হয় ক্ষীণ কর,
এক তারা একাকী বিকাসে ॥
তেমতি আমার বুকে, অন্ধকার দুখে দুখে,
গেছে যত আশা যত সুখ।
শুধু প্রাণনাথ আসা, তারি প্রাণভরা আশা,
একাকী বিহরে মোর বুক ॥
সে সুখ বাসর কবে, বল বল কবে হবে,
কবে হবে ফিরে দরশন।
করি তাহা জপমালা, ভুলিব বিরহ জ্বালা,
যদি পারি ভুলিতে রতন।

পতি

চৌপদী।

যদি দেহে প্রাণ ধরি, আসিবহে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণ মরি, রহেনা লো রহে না।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেঁথেছ মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহেনা লো সহে না।
কিন্তুলো তরুণ করে, প্রকাশিল প্রভাকরে,
আর কথা পরস্পরে কহেনা লো কহে না।
তেব যাই সুনয়নি, যাইলো হৃদয় মণি,
যাই কিন্তু পদ ধনি, বহেনা লো বহে না ॥

চতুর্থ কবিতা।

চন্দ্রদূত।

রূপক। ত্রিপদী।

দ্বিযাম যামিনী যায়, আমরি কি শোভা তায়,
নিরখি নির্ম্মল নদী তীরে।
নিরমল নিলাকাশ, সীমা বিনা সুপ্রকাশ,
মাঝে হেরি মধুর শশিরে ॥
যেন কোন নববালা, পাইয়া বিরহ জ্বালা,
মলিনতা মধুর বদনে।
গগন গহন বনে, মনোদুখে মরি মনে,
ভ্রমিতেছে গজেশ গমনে ॥

সেই রূপ মনোহর, রূপ ধরি শশধর,
আলো করে ধরণী আকাশ।
গগনের যত তারা, হইযাছে কর হারা,
অল্প তারা আকাশ প্রকাশ ॥
মাঝে মাঝে শশধরে, ঢাকে ক্ষীণ জলধরে,
মরি যেন নাথ দবশনে।
রহি গুরুজন মাঝে, মোহিনী মহিলা লাজে,
ঢাকা দেয বদন বসনে ॥
চন্দ্রিকা বসন পরা, গভীর নিশীতে ধবা,
মোহ মন্ত্রে যেন নিদ্রা যায।
ঘোর স্তব্ধ ত্রিভুবন, দেখিযা চাহিছে মন,
আবাধিতে অচিন্ত্য স্রষ্টায ॥
শুধু হয শব্দ তায, পরশি নিকুঞ্জ গায়,
চলিছে সমীর মৃদু স্বরে।
পূর্ণ নদী স্থির নীরে, শুধু শব্দ ধীরে ধীরে,
মধুর মলয মন্দ করে ॥
আহা মরি মরি কিবে, এমন নদীর তীরে,
কেরে শত শোভা ধরি বসি।
বুঝি এ বিরহ লাগী, প্রণযিণী অনুরাগী
যুবক জনেক যেন শশী ॥
তৃণের কুসুম কুঞ্জ, ললিত লতিকা পুঞ্জ,
ঘেরি তারে বারি ধারে রয।
যেমন মলিন শশী, মলিন বদনে বসি,
দীর্ঘশ্বাসে বিদরে হৃদয ॥
আঁখি হতে বারে বারে, ধারা বহে ধারে ধারে,
তাহাতে কতই শোভা ধরে।
যেন সে নয়ন জলে শশী পশি ছাযা ছলে,
চুম্বন গণ্ডেতে তার করে ॥
নিরখি নয়ন ভরি, মধুর চন্দ্রমাপরি,
শেষে শশী সম্বোধিয়া কয়।
আরে মনোহর শশী, গগন মণ্ডলে পশি
পার যেতে ত্রিভুবন ময় ॥
তাই বলি শশধর, আমার বচন ধর,
যাও সেই মোহিনীর কাছে ॥

যার তরে আশা পথে　　আরোহিয়া মনোরথে,
আগে মোর পরাণ গিয়াছে ॥

পয়ার।

কিন্তু কি হেরি তোর, হৃদয় মাঝায়।
কিরে সে কালীব রেখা, লেখা দেখা যায় ॥
বুঝি মম মনোবমা, ভাবিযা আমায়।
আসিবাব কথা লিখে, দেছে তোর গায় ॥
নারে আব কেন মজি, মিছার স্বপনে।
জানি ভাল ভাবে না সে, অনুগত জনে ॥

ত্রিপদী।

বুঝি মোর দুখে দুখী,　　নাহি দেখি বিধুমুখী,
বুঝি চাঁদ করেছ রোদন।
হৃদযেরি রেখা চয,　　আঁখি ধারা চিহ্ন রয,
ও যে নহে কলঙ্ক কখন ॥
বুঝি তাবি দেখা তরে,　　আকাশ রোদন করে,
তারারূপ সহস্র নযনে।
নীহার নযন ধারা,　　ফেলিছে যতেক তারা,
শতশত বিন্দু বরিষণে ॥
তাই বলি নিশাপতি,　　রতনে যতনে অতি,
ঝাটিতি করহে দরশন।
এই ভাষা কহ গিযে,　　আশা বিনে ফাটে হিযে,
তার লাগি মলো একজন ॥

পয়ার।

শশি হে বসিযে আর, বিলম্ব না কর।
এমন অচল কেন, রও শশধর ॥
বুঝেছি বুঝি হে তব, যেই ভাব মনে।
যে কারণে যেতে নারো, নাবী নিকেতনে ॥
মোহিনীর মুখরূপ, করি দরশন।
কত লাজ কত জ্বালা, পেয়েছ তখন ॥
তত আর নাহি দুখ, তার অদর্শনে।
সুখেতে আকাশ মাঝে, প্রকাশ আপনে ॥
সাধেতে সাধিতে বাদ, আপনার প্রতি।
যাবে না যামিনী নাথ, যথায় যুবতী ॥
ইহা যদি নিশানাথ, না মান আপনি।

আদি অন্ত জানি আমি বলিব এখনি ॥

চৌপদী।

ললনা লপনে লাজ, পেয়ে মানে দ্বিজরাজ,
লুকালে মেঘের মাঝ, ঘোমটা ধরিয়া রে।
এই কথা মূঢ়ে কয়, তাই অমানিশা হয়,
কেহ কহে তাহা নয়, গিয়াছে মরিয়া রে ॥
মহিলার মুখাকারে, অভিমানে আপনারে,
একেবারে নাশিবারে, গমন করিয়া রে।
মহেশ ললাট স্থলে, ধিকি ধিকি বহ্নি জ্বলে,
ঝাঁপ দিলে সে অনলে, পরাণ হরিযা রে ॥
বিমল বারিধি জলে, ডুবেছিলে কেহ বলে,
মূঢ়ে বলে বারি তলে, ছায়া সে পড়িয়া রে।
ভয় এই পাছে তায় কামিনী তথায় যায়,
ছিল কম্পমান কায়, সলিলে লভিয়া রে ॥
পরেতে জানিয়া ভাল, করেছে বিরহ কাল,
কামিনী বদন কাল, তাই ফিরে আইলে।
ফিরে এলে সিন্ধু হতে, বলে নর শতে শতে,
যে তুমি এমনি মতে, সমুদ্রে জন্মাইলে ॥
বিধুমুখ মহিলার, দেখ নাহি ফিরে বার,
নাহি দেখি শোভা তার আজো না পাইলে।
যেতে বলি যতবার, তত কর অস্বীকার,
বুঝেছি কারণ তার, জ্বালা পাবে যাইলে ॥

পয়ার।

নাহি ডর শশধর, ধর হে বচন।
চরণে শরণ তার, করিও গ্রহণ ॥
প্রমদার পদতলে, পড়ি নিরন্তর।
তোমার সদৃশ আছে দশ শশধর ॥
বিশেষত পদে যদি, না পড় প্রথমে।
মুখের সম্মুখে কথা কহ যদি ভ্রমে ॥
তখনি ঘটিবে কুহু, যেন নিশাকর।
ললনা ললাটে আছে সিন্দুর ভাস্কর ॥

ত্রিপদী।

তাহে যদি বল তবে, কেন দিন-পতি রবে,
ললনার ললাট উপর।

প্রেয়সীর পদদ্বয়, সদা কিবা শোভা হয়,
যুগল কমল মনোহর ॥
নখর নিকর তায়, শশি সম শোভা পায়,
কমলের কোলে শশধর।
ক্রোধে রক্ত দিবা-পতি, জানিল অসতী অতি,
পদরূপা নলিনী নিকর ॥
ঠেকে শিখে নারীরীতে, আর পদ্ম আগুলিতে,
বদন কমল কামিনীর।
সিন্দুর বিন্দুর রূপ, নারী মুখে অপরূপ,
দিনেশ বসিল হ'য়ে স্থির ॥
যদি বল কি প্রকারে, চিনিবে হে তুমি তারে,
দেখ নাই আগেতো সে জনে।
জান যদি আপনার, কুমুদিনী প্রেমাধার,
তারে তবে চিনিবে নয়নে ॥

চৌপদী।

যাও যাও সুধাকর, কেন হে বিলম্ব কর,
একবার শশধর, যাও যাও যাও রে।
প্রাণের প্রেয়সী পাশে, বল গিয়ে যদি আসে,
ধরিব পরাণ আশে, বধিও না তাও রে ॥
নহে রহ এই স্থলে, অহরহ কোন ছলে,
যেও না হে অস্তাচলে, এই ভিক্ষা দাও রে।
মোহিনীর মুখ তোরে, জ্ঞান করি প্রেম ডোরে,
বাঁধিয়া বাঁচাব মোরে, যেওনা কোথাও রে ॥
মনে হয় সে রজনী, যখন রমণী মণি,
অধরে অধরে ধনী, ধরিল আমায় রে।
সে কি এই নদী তীরে, এই সে নিকুঞ্জ কিরে,
তোরি করে কলঙ্কী রে, দেখেছি কি তায় রে ॥
হা নিকুঞ্জ মনোহর, হা মধুর শশধর,
হে তটিনী স্থিরতর, ধরি সবে পায় রে।
ফিরে দেখা একবার, মোহিনী মধুরাকার;
একবার দেখা আর, হৃদি ফেটে যায় রে ॥
ফিরে দরশন করি, তটিনীর তটোপরি,
চম্পকের শাখা ধরি, আমা পানে চায় রে।
কি শুনি কি শুনি মরি, মোহন স্বরেতে করি,

কেরে মোর নাম ধরি, ডাকিল কোথায় রে ॥
বুঝি মোর প্রাণেশ্বরী, এহো অনুগতে স্মরি,
রাখি গে হৃদয়োপরি, আঁখি আঁখি করি রে।
নারে মিছে কেন আর, স্বপ্ন দেখে বারে বার,
মজি সুখে মিছে কার, যাতনায় মরি রে ॥
নাহিক কপাল তার, প্রাণেশ্বরী পাইবার,
এত আশা অভাগার, সম্বরি সম্বরি রে।
যত সুখ আশা আর, সব করি পরিহার,
শেষ আসা আশা আর, তা কিসে পাসরি রে ॥
যদিও জানিরে মনে, পাইব না প্রিয়জনে,
গোপনেতে প্রাণপণে, তবু আশা ধরি রে।
যগুপি স্বপ্নে বা ভ্রমে, ছায়া সুখে কোন ক্রমে,
পাই যদি প্রিয়তমে, হৃদয় ভিতরি রে ॥
দারুণ বিধির বিধি, চেতনে হরিল নিধি,
জ্বালা জ্বালাইল বিধি, মরি মরি মরি রে।
কিন্তু আশা পাছে পাছে, তাই চাঁদ তোর কাছে,
যেতে বলি যথা আছে, আমার সুন্দরী রে ॥*

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে কিরূপ গদ্য রচনা করিতেন তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমি নিম্নে একটু উদ্ধৃত করিলাম।

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তকেও বিবেচনা করে না যে তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহ ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক। এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে

* এই কবিতা চারিটিতে যে সকল ভুল দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ ভুল মুদ্রাঙ্কনের বলিয়া আমার মনে হয়।

অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক। যে লপনেন্দু শত শত শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে সে বদন কৰ্দ্দম মণ্ডিত হওত স্মশানগুলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। যে নাসিকা স্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক, যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয় না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করণে বাধ্য হইবেক, দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত সে কর কদৰ্য্য কীট নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখনও বিপদ গ্রস্থ হয় নাই, এবং যে পদ কখনও সম্পদ সংরক্ষণেও ধূলিসহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক। ধরাবাসিদিগের এই ধারা দর্শনে অশ্রুধারা ধারে ধারে ধারণ হয়, অতএব হে মানবগণ অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।"*

এই রচনার নিম্নে প্রভাকর-সম্পাদক একটু টীকা কাটিলেন। তিনি লিখিলেন,—"ইঁহার লিপি নৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষর গুলীন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

কবির লড়াই

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালায় কবি, হাফ্ আখ্‌ড়াই ও পাঁচালির বড়ই প্রাধান্য। রাম বসু, হরুঠাকুর, ভোলানাথ, যজ্ঞেশ্বরী, কৃষ্ণকমল তখন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কীৰ্ত্তি লুপ্ত হয় নাই; দাশরথি রায়ও তখন জীবিত। দাঁড়া-কবিরা একদিন বাঙ্গালা মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাব, তখনকার কবিদিগের রচনার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলি এতদ্‌বিষয়ে জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনিও ছড়া ও গান বাঁধিতেন। এক পক্ষ, অপর পক্ষকে গালি দিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিত। দীনবন্ধুবাবু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ কবির লড়াই চলিত। আমি নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুদ্ধে যোগদান করিতেন না। তবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে চট্ট কবি বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই; দীনবন্ধুবাবুকে

* বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে এই গদ্য-প্রবন্ধ লিখিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনা।

সহুরে কবি নাম দিয়া পাঁচালী সাজাইয়াছেন। দীনবন্ধু বাবু পাল্টা গাহিয়া দ্বারকানাথকে বুনো কবি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ লিখিলেন ;—

পয়ার।

শহুরে কবি।

আমার কশুর কিছু নাই গতবারে।
কথায় কথায় কটু কহিয়াছি তারে ॥
সে যদি মানুষ হয় জ্ঞান থাকে তার,
আমার সহিত রণ করিত না আর ॥

চট্টো।

তাই তাই তাই বটে, অতি সুখ ময়।
এমন কবিতা আর হইবার নয় ॥
ভাগ্যে তুমি বেঁচে আছ, তাই ভাই মোরা।
কবিতা দেখিতে পাই মূর্খ মন চোরা ॥
কিন্তু কবিবর আমি, তার ঠাঁই ঠাঁই।
তব মনোগত কটু, ভাব বুঝি নাই ॥
কৃপা করি কহ স্বীয়, সরল স্বভাবে।
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে ॥

শহুরে।

হা হা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল ॥
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এভাবে লোয়েছি।
কৌশল করিয়া মিত্র, বানর বোলেছি ॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান ॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে ঋণে।
রামচন্দ্র, দীনবন্ধু, হনুমান বিনে ॥

চট্টো।

জান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে ॥

* * *

তোমার সহিত কভু, না পারিবে বুনো।
তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর দুনো ॥

* * *

শহুরে।

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবেনা কখন॥
কারণ ভুলোক মাঝে ইহা জানে কে না।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা॥

তার পর দ্বারকানাথ কবিতা ছাড়িয়া গদ্যে ধরিলেন, "হে মিত্র, বারম্বার এরূপ চিত্র করিয়া আর স্বীয় কালেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না।" ইত্যাদি।

কিছুদিন বাদে কবিবর দীনবন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদিগের বুনো কবিটি*** চপল। দ্বারিকবাবু, আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন,—

দিব্যং চুত ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক মকায়তে॥

• • •

বুনো কবির গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, নীচ লোকে যদি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন,—"You are one of those that will not serve God if the devil bid you"

১২৫৯ সালে ২রা চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোষিত হইল,—"হিন্দুকালেজের প্রাক্ত ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের লিখিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সহযোগিগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যে রূপে ও যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

প্রথমে দীনবন্ধুবাবুর "দম্পতি-প্রণয়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা প্রভাকরে মুদ্রিত হইল। তার পর দ্বারকানাথের গদ্য কাব্য সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ প্রকাশিত হইল। সর্ব্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হইল। এ যুদ্ধে, এ পরীক্ষায় দ্বারকানাথকে শ্রেষ্ঠ আসন ও পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল।

হায়, সে দ্বারকানাথ আর নাই। যৌবন ফুটিবার পূর্ব্বেই "কৃষ্ণকান্তের উইল" বা "লীলাবতী"র তুল্য পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি সহযোগীদের ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ বৎসর
রচনা

উপরে যে সকল কাব্যের পরিচয় দিয়াছি, তাহার ভূরিভাগ বঙ্কিমচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হইয়াছে; যোড়শ বৎসরেও কিছু হইয়াছে। কোন কোন ভাব ঋতুসংহার হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; তবু বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত কাব্যনিচয়ে যে কবিত্ব, যে ভাবের সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে দেখাইয়াছেন, তাহা পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কয় জন লোক পারিয়াছেন?

আর এক কথা। উপরের কবিতাগুলির ভাব প্রণিধান করিতে না পারিলে কাহারও তাহা ভাল লাগিবে না। কবিতাগুলি বালকের রচিত বটে, কিন্তু সে বালক বঙ্কিমচন্দ্র। কাব্যাংশের ভাব গভীর ও সুন্দর; বাক্যার্থ কঠিন ও জটিল। নিম্নে একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। প্রথম কবিতার প্রথম চরণে আছে—

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন,
সে বন এখন নাহিক সয়॥

এখন জীবন ও বন অর্থে জল। এই অর্থ না জানিলে ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই তরুণবয়স্ক কবি সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বঙ্কিমচন্দ্রের বিরচিত কবিতার সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনাস্থলে নায়ক নায়িকার কথোপকথন ছলে যে সমস্ত প্রগাঢ়ভাব ব্যক্ত করেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রবীণ সুরসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য্য নূতন নূতন ভাব সকল উদ্ভূত করিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনা, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদরচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাব গুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক।"

আমার ধারণা, এই সকল কবিতা-রচনার পর 'মানস' ও 'ললিতা' লিখিত হয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের তখন অনূ্যন ষোড়শ বৎসর বয়স। উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল অপ্রকাশিত কাব্যনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছি, তদপেক্ষা মানস ও ললিতা কোন কোন ব্যক্তির মতে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উভয় কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রের অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সংশোধিত অবস্থায়

প্রকাশিত হইয়াছিল।

ললিতা সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধার হইতে কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ বহিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। ঝড়ের বর্ণনা ললিতা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতব স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

এই স্তব্ধ বনে অন্ধকারে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড় বৃষ্টির ভয় নয়,—ভূতের ভয়। তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। এই ভয় বাল্যকালে কিছু বেশী থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির যে ভাব চারি দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ললিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ললিতা কাব্যটিকে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকা মনোমধ্যে সঞ্জাত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাত্রবিশেষে কার্য্য কারণের ফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে, জীবহত্যা দর্শনে কত লোকের হৃদয় কাঁদিয়া আসিতেছে; কিন্তু কয় জনের শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে গুরুগম্ভীর রবে ধ্বনিত হইয়াছে,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।"

পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে কত আপেল, কত আম্র প্রভৃতি ফল বৃক্ষদেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কয়জন লোক Law of Motion হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন? বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু কয় জনের ভয়-কম্পিত চিত্ত হইতে ললিতার সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কয় জন কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছেন?

ললিতায় স্থানে স্থানে বিদেশী ভাব দেখা যায়। মানসে তা' নাই; আছে শুধু সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জ্জন। অপ্রকাশিত কাব্যগুলি খাঁটী দেশী,—সৌন্দর্য্যময়, ভাবপূর্ণ। কিন্তু ভাষার জন্য, শব্দের জন্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে আকুলি-বিকুলি করিতে হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষা পদক্ষেপ করিয়া যাইতে পারে নাই।

আর এক কথা, বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাব-কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কবিতা লিখিতে শিখিয়াও কখন তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দীনবন্ধুবাবুর ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে একা দূরে বসিয়া, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

হুগলি কালেজে

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কালেজে এক জন দেশ-বিশ্রুত শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি কালেজের হেডমাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে উক্ত বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতা হিন্দু কালেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কালেজে থাকিয়া যে দুই জন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশানবাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, কাঁটালপাড়া নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট। পুঁথি বগলে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় প্রতিদিন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতেন। চারি বৎসর ধরিয়া—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ষোড়শ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রভাকরে পদ্য বা প্রবন্ধ লিখিতে দেখি নাই। আমি শুনিয়াছি, * কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

এ উপদেশ কোন্ সময়ে দিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি। যে সময়েই দিয়া থাকুন, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ একবার জন্মের মতন দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয়স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতৎপূর্ব্বেও

* গুপ্ত-কবির দৌহিত্রের নিকট।

বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে—সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত।

সে সব কথা এখন যাক্—মিউটিনী বা সিপাহীবিদ্রোহের সময়ের একটা কথা বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শেষ পরীক্ষা দিয়া হুগলী কালেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন উনবিংশতি বর্ষ মাত্র।

সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। বিদ্রোহ-বহ্নি বারাকপুর ও বহরমপুরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মান্দ্রাজ ও অযোধ্যা সমিধ্ সংগ্রহ করিতেছে; দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে, কানপুর চাপাটি পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে।

বাঙ্গালী আগুন জ্বালাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—দূরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম আকাশের গায়ে লাল চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। মোগল আশা-উৎফুল্ল—মহারাষ্ট্র প্রতিহিংসা-পরায়ণ—বাঙ্গালী দর্শক।

বাঙ্গালী দর্শক, বাঙ্গালী আবার পথপ্রদর্শক; বাঙ্গালী সকল বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালীই ইংরাজের প্রথম দেওয়ান—বাঙ্গালীই ইংরাজের ফাঁসীকাষ্ঠে সকলের আগে ঝুলিয়াছে—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টান হইয়াছে—বাঙ্গালীই সকলের আগে বিলাত গিয়াছে। বাঙ্গালী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আগুন প্রধূমিত করিয়াছে—বাঙ্গালী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়াছে—আবার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বয়কট অনলেও ফুৎকার দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভাল বা মন্দ সকল কার্য্যেই বাঙ্গালী পথপ্রদর্শক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল। চুঁচুড়ায় সে সময় একদল হাইল্যাণ্ডার সেনা থাকিত। এক্ষণে আর সেনা থাকে না, কিন্তু যে বৃহৎ অট্টালিকায় তাহারা বাস করিত, সে অট্টালিকা আজও আছে। এক্ষণে তাহা আদালত ও আফিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গোরানিবাসের নিম্নে গঙ্গা। তথায় একটি ঘাটও আছে; তাহাকে ব্যারাকের ঘাট বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া এই ঘাটে আসিয়া নামিলেন। উদ্দেশ্য—থিয়েটার দর্শন। চুঁচুড়ার জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি একটি থিয়েটারের দল সংগঠিত করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দলে যোগ দিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হ'ন নাই। অবশেষে সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কাঁটালপাড়ার অনেকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ যুবা, কেহ প্রৌঢ় কেহ বা বৃদ্ধ; কিন্তু সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র এখন স্বতন্ত্র নৌকায় ছোটভাইকে লইয়া আসিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছোট। ব্যারাকের ঘাট হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী

নিকটে নহে, "ঘন্টা" ঘাট হইতে নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যারাকের ঘাটে নামিলেন; কাঁটালপাড়ার অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র নৌকায় আসিয়া "ঘন্টা" ঘাটে নামিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য একটু ভ্রমণ। রাস্তা, গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুরম্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাস্তার ধারে—গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং, মাঝে মাঝে থাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ বহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী পথের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কুকুরও ছিল। একটা কুকুর পূজনীয় পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগিল। আমরা দেখিতে পাই, সংসারে আমরা যে জিনিষটাকে বা যে মানুষটাকে যত ভয় করি, সে জিনিষটা বা মানুষটা আমাদের তত চাপিয়া ধরে। কুকুরকে দেখিয়া পূর্ণ বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ভীত দেখিয়া কুকুর ও ভয় উভয়ই আরও চাপিয়া ধরিল।

কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন, কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একটা থামের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সাহেবদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গা পানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণ বাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোদ্যত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "Fine sport indeed ' Don't you feel ashamed ?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত এমন সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন যে, সাহেবেরা লজ্জিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইয়াছিলেন।

থিয়েটার ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাঁটালপাড়া হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র ফিরিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সে দলে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইয়াছিল। এই সামরিক বিধান অনুসারে চুঁচুড়ার সীমা মধ্যে রাত্রি নয়টার পর কেহ পথে বহির্গত হইলে প্রহরী তাহাকে গুলি করিয়া নিহত করিতে পারিত। ঘন্টা-ঘাটের উপর দুই জন প্রহরী ছিল। কাঁটালপাড়ার দল ঘন্টা-ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র এক জন গোরা অন্ধকারের ভিতর হইতে অগ্রসর হইয়া জনৈক অগ্রগামী ভদ্রলোকের বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপন করিল। নিরীহ ভদ্রলোকেরা আনন্দসহকারে থিয়েটারের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন, সম্মুখে এই বিপদ! বঙ্কিমচন্দ্র একটু পিছাইয়া ছিলেন। সকলে থামিল দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন এক জন গোরা বন্দুক হস্তে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপর প্রহরী অগ্রগামী ভদ্রব্যক্তির বুকের উপর সঙ্গীন

স্থাপিত করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন সামরিক বিধানের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, এই বিধান অনুসারে প্রহরী তাঁহাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র, কম্পিতকলেবর ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া দিয়া নিজে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং সংযত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহারা গঙ্গার অপর পার হইতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। গোরা বলিল, "How am I to know that?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "you may ask the District Magistrate, He was present." গোরা বলিল, "I believe you. Take yourselves off at once."

সাহেবরা পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল; কম্পান্বিত-কলেবর ভদ্রলোকেরা ঝড়ের বেগে গঙ্গার দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, মহাবিপদ!—সেখানে নৌকা নাই। সাহেবরা Take yourselves off বলিয়া খালাস; কিন্তু ভদ্রলোকেরা যান কিরূপে? সাঁতার কাটিয়া না গেলে তো উপায় নাই। ডাঙ্গায় সাহেবের ভয়, জলে কুমীরের ভয়। কেহ কেহ জলটাকে অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়া কাপড় গুটাইতে লাগিলেন! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কালেজের ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন সম্মুখস্থ চড়ায় দুইখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিতে কাহারও সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকিলেন। তাহারা আসিল এবং ভীত, ক্লান্ত ভদ্রলোকদের লইয়া অপর পারে প্রস্থান করিল।

প্রেসিডেন্সি কালেজে

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। হুগলী কালেজে Senior Scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করায় বঙ্কিমচন্দ্র একটা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বৃত্তি কত টাকার, তাহা জানি না। তিনি এই বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাদবচন্দ্র তখন চাকরী হইতে সবেমাত্র অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টার্ণবেঙ্গল রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলী ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যহ যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতাপিতা ছাড়িয়া কলিকাতায় একা গিয়া থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক; সঞ্জীবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গিয়া থাকিতেন।

তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারি দিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন প্রবল স্রোতোবেগে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙ্গালীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণর জেনারল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলাণ্টিয়ারদল চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানির কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত; যে যেখানে পারিতেছে, পলাইতেছে।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিলেন। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদের তাড়াইতে কেহ পারিবে না,—মুসলমান ও হিন্দুরা দুই দিনের জন্য উপদ্রব করিতেছে মাত্র। তিনি ইংরাজি যেমন পড়িয়া যাইতেছিলেন, তেমনই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ওকালতি করিবার জন্য যেমন আইন শিক্ষা করিতেছিলেন তেমনই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার-অধ্যাপক Montriou সাহেবকে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি একদিনের জন্যও ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে, তাহা হইলে তোমার আইন-পুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, বৎসর শেষ হইতে ইংরাজের বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে অনল নির্ব্বাপিত-প্রায় হইল। যে জাতি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্ত-প্রায় কোটী কোটী মনুষ্যকে দমন করিতে পারে, সে জাতি শক্তি ও কৌশলে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইল। পর বৎসর ইংরাজ বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রেল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র বিলম্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষোপযোগী পুস্তক পাঠ করিয়া প্রস্তুত হওয়া দুরূহ। অনেকে পিছাইয়া গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ তের জন পিছাইলেন না। তাঁহারা পরীক্ষার্থী হইলেন। তিন জন উপস্থিত হইতে পারেন নাই—দশ জন মাত্র পরীক্ষা দিলেন। ইংরাজীসাহিত্য ও ইতিহাস পরীক্ষা করিলেন, গ্রাপেল সাহেব; সংস্কৃতের পরীক্ষক হইলেন, সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরীক্ষায় দুই জন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন; তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান গ্রহণ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র; দ্বিতীয় হইলেন; বাবু যদুনাথ বসু।*

* বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই,—গভর্মেণ্ট দয়া পূর্ব্বক তাঁহাদের সাত নম্বর Grace Mark দিয়া পাস করিয়া দিয়াছিলেন। এ উক্তির পোষকার্থ

বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইল, মে মাসের মধ্যভাগে। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকুরী তুমি প্রত্যাশা কর ?

বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকুরী আপনি আমাকে দিন না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোনও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোট লাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন; বলিলেন, "ভাল, তোমায় আমি কিছু দিনের সময় দিলাম; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।"*

চাকুরী গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে গ্রহণ করিতে হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৩এ আগষ্ট তারিখে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর দুই মাস মাত্র।

এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এই ছাত্র জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষভাগে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে

সরকারী রিপোর্ট হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের Bengal Provincial Committeeর রিপোর্ট বলিতেছে,—

1. "The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the poor results of the first Examination in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour."

2. Minutes of the Syndicate Dated. April 24, 1858.

3. Read a letter from the University Board of Examiners, stating that of the 13 candidates for the degree of B.A., Three had been absent during the whole or a portion of the examination and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending that two candidates viz. BUNKIM CHANDRA CHATTERJEE and JADOO NATH BOSE who had creditably passed in five of the six subjects and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favour should, in no case, be regarded, as a precedent in future years.

Resolved :—That two candidates be admitted to the degree of B.A.

* আমি ঠিক বলিতে পারি না, এ কথোপকথন হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে অথবা অন্য কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে হইয়াছিল।

বলিয়াছিলেন, "আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হ'তে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়া শুনা কখন ভাল লাগিত না—বড অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গ-দোষটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হ'য়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকালের উপর আর একটু বেশী; কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে কেন সিঁদ দিতে শিখিনি বলা যায় না।"*

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রে একটু বিশেষত্ব ছিল। পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র সে সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

আমাদের গ্রামের আড পারে হুগলি কালেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক এক দিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত, বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন রে, নৌকা ছাড়্‌বি?" মাঝি নৈহাটীর পাটনী, কখনও 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড উঠিবার পূর্ব্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌঁছিত, আর কোন কোন দিন মাঝ গঙ্গায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ-সকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড ভাসিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝডে পডিযাছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। যিনি ষাঁডগরু দেখিয়া ভয পাইতেন, তিনি প্রকৃতির এই সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি অজ্ঞান হইযা দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্ত্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই বিপদে পডিতে হইত।

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর সাহেব, হাতির শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। দারগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোন মতে ধরিতে পারিল না, কেন না, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি British born subject, সুতরাং হাইকোর্ট সোপরদ্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, কেন না, তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচরিত্রের এইরূপ বিচিত্র অসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এই সঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস কুয়াসা এইরূপ চারিদিক ব্যাপিয়া ছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায়

* সাধনা—১৩০১।

নাই। আমার জীবনে কখনও ঐরূপ কুয়াসা দেখি নাই, কেন না, উহা প্রায় ১০। ১১টা অবধি ছিল। আমরা সাড়ে নয়টার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনের মিনিটে কলেজ ঘাটে পৌঁছিত, কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কলেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে?" মাঝি বলিল, "আজ্ঞে তা' জানি না।" "সে কি রে?" "আজ্ঞে, বোধ হয় ভাটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।" মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি এক স্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ জায়গা?" মাঝি বলিল, "বুঝি মূলাযোড়।"

কপালকুণ্ডলা গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এই দিনের ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিম-জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

চাকুরী

যশোহর ও নাগোয়া

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর। যশোহরের পথ তখন দুর্গম। রেল নাই, নৌকা বা পাল্কীতে যাইতে হইত। সময়ও বড অল্প লাগিত না, তিন দিন, চারি দিন পথে অতিবাহিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজনদের ছাড়িয়া সুদূর যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আর একজনকে ছাড়িয়া গেলেন, আমি তাঁহার রূপযৌবনশালিনী, সর্ব্বগুণময়ী সহধর্ম্মিণীর কথা বলিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ ফাটিয়া গেল। তা'র ঠিক এক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র সেই রমণীকুলভূষণ স্ত্রীকে হারাইলেন।

যশোহরে দীনবন্ধুবাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ। উভয়ে উভয়কে ইতঃপূর্ব্বে দেখেন নাই। কিন্তু পরস্পরের রচনা, 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে' পড়িয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এক্ষণে এক প্রতিভা অপর প্রতিভার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে প্রবৃত্ত হইল; এক বিদ্যুৎ অপর বিদ্যুৎকে আলিঙ্গন করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাগোয়াতে বদলি হইয়া গেলেন। নাগোয়া মেদিনীপুর জেলায়। কাঁথির নাম অনেকেই অবগত আছেন। কাঁথির সন্নিকটেই নাগোয়া। পূর্ব্বে এইখানেই মহকুমা স্থাপিত ছিল; পরে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, মহকুমা কাঁথিতে উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়া মহকুমার হাকিম হইয়া আসিলেন।

এখান হইতে সমুদ্র বেশী দূর নয়। সময় পাইলে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। নাগোয়া হইতেও সমুদ্রের চীৎকার সময় সময় শুনা যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিপত্নীক। নিস্তব্ধ নিশীথে শয্যায় শুইয়া সমুদ্রের রোদনে তিনি আপন হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতেন। চপল সমুদ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিত, গম্ভীর বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে কাঁদিতেন। সে নীরব রোদন বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা ছাড়া আর কেহ দেখিল না, বুঝিল না। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন রাজকার্য্যানুরোধে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। স্থানীয় জমিদার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য তাঁহার উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে উদ্যানগৃহে সমুপস্থিত হইলেন। আহারাদির উদ্যোগ হইতেছে; বঙ্কিমচন্দ্র একা একটি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময় সহসা সেই কক্ষে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটির রূপ ও বয়সের কথা শুনি নাই; তবে সে শুভ্রবসনে সমাচ্ছাদিত ছিল, ইহা শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র, এই স্ত্রীলোকটিকে নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" স্ত্রীলোকটি কোনও উত্তর করিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" রমণী তথাপি নীরব। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন; এবং অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথার উত্তর দাও না কেন? তুমি মানুষ না পেত্নী?"

বঙ্কিমচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রমণী উন্মুক্ত দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুসরণ করিলেন। উদ্যানে আসিয়া যখন তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন, তখন দেখিলেন, রমণীর শুভ্রবসন ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, অবশেষে রমণী-মূর্ত্তি বায়ু-হিল্লোলে মিলাইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল স্তম্ভিতচিত্তে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "আমি এখনি এ স্থান ছাড়িয়া যাইব—পাল্কী প্রস্তুত কর গে।"

নাগোয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী দিন ছিলেন না; কয়েক মাস থাকিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে খুলনাতে বদলি হইয়া গেলেন। কিন্তু বদলি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল। চাকরীতে প্রবৃত্ত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পদোন্নতি হইল। এ সৌভাগ্য সকলের হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া খুলনায় চলিয়া গেলেন।

নাগোয়ার দৃশ্যাবলী হইতে কপালকুণ্ডলার অংশ বিশেষ জন্ম লইয়া থাকিবে। পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়া মহকুমাতে ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্‌লায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বন জঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে তিন চারি দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন, যথা—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বন জঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি দেখিযা বড লোভী হইবে; দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরি করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে, স্বামী-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে, সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি রূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

খুলনা

খুলনা তখন যশোহরের অধীন একটি মহকুমা মাত্র, তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নাই। বেন্‌ব্রিজ সাহেব সে সময় যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। মিষ্টার বেন্‌ব্রিজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এইখানে প্রথম আলাপ; এই আলাপ বহরমপুরে 'ডফিন' ঘটনার পর সখ্যতায় পরিণত হইয়াছিল।

খুলনায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে নীলকরের অত্যাচার, অপরদিকে দস্যু তস্করের উপদ্রব। তখনকার নীলকরেরা বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা কোটীপতি ব্যবসাদার, তাঁহারা প্রবল জমিদার। বড় ছোট খাট জমিদার নয়,—কৃষ্ণনগরের হিল্‌স্ সাহেবের তিন লক্ষ বিঘা জমি ছিল। এই সাহেবই প্রজা ঈশ্বর ঘোষের নামে খাজনা বৃদ্ধির মোকর্দ্দমা স্থাপন করিয়া Sir Barnes Peacock প্রমুখ হাইকোর্টের সমুদায় বিচারপতিদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন।

হিল্‌স্ সাহেবকে লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নীলকরদের বিবাদ বুঝাইতে হইলে আমায় কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইবে। নীলকরদের প্রতাপ কিরূপ ছিল, ইহা না বুঝিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না, তাহাদের অত্যাচার দমন করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কতটা শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। আমি সে সময়কার সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দুই চারি কথায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লিখিয়াছিলেন, "The planter—denied law, courts and police—like Englishmen all over the world became a law into himself."

সত্যই নীলকরেরা সে সময় মনে করিতেন, দেশে আইন নাই—আকাশে দেবতা নাই। প্রজাকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিতে, ভূমধ্যস্থ কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে, তাহাকে 'শ্যামচাঁদে'র * প্রহারে জর্জ্জরীভূত করিতে, তাঁহারা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। প্রজার গৃহে আগুন লাগাইতে, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে, তাহার স্ত্রী-কন্যাকে পীড়ন করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। পিপীলিকাও পদদলিত হইলে শত্রুকে দংশন করে। বাঙ্গালী আত্মরক্ষার্থ, দংশনার্থ দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উপযুক্ত নেতার অভাব হইল না। নেতার অভাব বাঙ্গালায় কখনও হয় না। সে দিনও তাহা দেখিয়াছি। কত ওয়াট টাইলার, হ্যামডেন্, ওয়াশিংটন নিরন্তর বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিতেছেন—ক্ষুদ্রবনফুলের মত মনুষ্যনয়নান্তরালে ফুটিয়া ঝটিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছেন, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—আমরা তাহার চিত্র তুলিয়া রাখি না; কেন না, আমরা ইতিহাস লিখিতে জানি না,—সবে চিত্র আঁকিতে শিখিতেছি।

শুধু চিত্র আঁকিতে শিখিতেছি না, শিখিতেছি এখন কাজ। শিখিতেছি প্রাণের চেয়ে ভালবাসিবার জিনিষ আছে—শিখিতেছি জন্মভূমিই আমাদের আরাধ্যা দেবী, 'বন্দেমাতরম্' আমাদের প্রণব ওঙ্কার, মাতৃসেবাই আমাদের তপস্যা। সে তপস্যা কোটী নয়নে পৃথিবী দেখিতেছে, ভবানন্দ জীবানন্দ সে তপস্যা দেখিতে জঙ্গল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, স্বর্গের দেবতা, শিবাজী ও প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া সে বিচিত্র তপস্যা দেখিতে আকাশপথে দাঁড়াইয়াছেন। ঋষি, তুমিও দাঁড়াও, তুমিও শিখাও—মন্ত্র দিয়া পলাইলে চলিবে না—ফিরিয়া এস।

বাঙ্গালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ** দুইজন সামান্য প্রজা *** নীলকরের চাকরী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া

* চর্ম্মের কশা বিশেষ।

** নদীয়া জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রাম।

*** বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিল। এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ বাঙ্গালার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের একপ্রাণে বাঁধিল—সিপাহীবিদ্রোহের সদ্যোনির্ব্বাপিত অনলের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল। বরিশালের বিখ্যাত লাঠিয়ালেরা আসিয়া যোগ দিল। ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—জেলা হইতে জেলান্তরে—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইল। বাঙ্গালীরা দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সাহেব ঠেঙ্গাইতে লাগিল—তাহাদের ঘরদ্বার লুণ্ঠন করিতে লাগিল—সাহেবের আমীন, গোমস্তা, ভৃত্যদের মারপিট করিয়া মাঠ হইতে তাড়াইতে লাগিল—কল কারখানা, কাগজ পত্র পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিতে লাগিল। দেশময় আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু এ আগুন কয়েকটি নীল আবাদী জেলা ছাড়া বড় বেশী দূর ছড়াইল না।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু লং সাহেবের মোকর্দ্দমা উঠে নাই। কয়েক মাস পরে উঠিল। * এই মোকর্দ্দমা শেষ হইলে—লং সাহেবের জেল হইলে, নীলকর জমিদারদের বল বাড়িল। তাঁহারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গবর্মেণ্টের নিকট অনুযোগ করিলেন যে, যশোহর ও নদীয়া জেলার প্রজারা তাঁহাদের খাজনা দিতেছে না, এবং যাহাতে আদায় দেয় তাহার উপায় করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মরিস্ ও মণ্ট্রেসারকে স্পেশাল-কমিশনর নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধানার্থ পাঠাইলেন। কমিশনর সাহেবেরা অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, নীলকর জমিদার সাহেবেরা নিরীহ ভদ্রলোক, কখনও কোনও প্রজার গায় হাত তুলেন নাই বা কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই; যত দোষ বাঙ্গালী প্রজার। তাহারা কিছুতেই খাজনা দেয় না। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ছোটলাটে ও বড়লাটে বিবাদ বাধিল। প্রজাপালক গ্রাণ্ট সাহেব কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; বড়লাট ক্যানিং সাহেব নিরীহ নীলকরদিগের আবদার রক্ষার্থ নূতন আইন গড়িতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েই সত্বর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সকল নিরীহ সাহেবদের মধ্যে মরেল্ নামধেয় একজন শান্ত শিষ্ট নীলকর জমিদার ছিলেন। অন্যান্য নীলকরদিগের তুলনায় প্রকৃতই তিনি শান্ত শিষ্ট। অনেকেই তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, তদানীন্তন প্রজাবৎসল ছোটলাট Sir J. P. Grant তাঁহার Indigo minutesএ মরেল সাহেবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—He is model settler and an example to all Indigo planters.

এই Model settler ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি; আগে মরেল সাহেবের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের একটু পরিচয়

* ১৯এ জুলাই, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ।

দিই। মরেল্ সাহেব একটা নগর বসাইয়া তাহার নাম রাখিলেন "মরেল-গঞ্জ"। সাহেব এই নগরের রাজা। তাঁহার কিছু সৈন্যও ছিল। লাঠিয়ালের সংখ্যা বড় অল্প নয়,—পাঁচ সাত শত হইবে। লাঠিয়ালেরা যে শুধু লাঠি ঘাড়ে করিয়াই লড়াই করিত, তা নয়,—তাহাদের কাহারও কাহারও হাতে বন্দুক, সড়্‌কি প্রভৃতি অস্ত্রও থাকিত।

এই দলের কর্ত্তা বা ক্যাপ্টেন ছিলেন ডেনিস্ হিলি। হিলি আইরিস্—হিলি যুবক। তিনি পূর্ব্বে Yeomanry Cavalryতে ছিলেন। সেখানে নরহত্যা বা গৃহদাহের তেমন সুবিধা ছিল না; বেতনও সামান্য। হিলি সাহেবের ভাল লাগিল না; অথবা সে কাজ করিতে পারিলেন না। সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া তিনি অবশেষে মরেল্ সাহেবের লাঠিয়াল-দলের নায়কতা গ্রহণ করিলেন।

মরেল্ সাহেবের অধিকাংশ সম্পত্তি যশোহর জেলার মধ্যে অবস্থিত। মরেল-গঞ্জ বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া দেখিলেন, মরেল্ সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; তিনি আদর্শ প্ল্যাণ্টার-রূপে দেশ শাসন করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া চার্জ্জ লইবার ঠিক এক বৎসর পরে মরেল্ সাহেব একটা দাঙ্গা করিয়া বসিলেন। তৎসম্বন্ধে Friend of India কাগজ কি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

In November 1861, an affray took place at Surulia, a village in the Sunderbuns between a Zamindar and a party belonging to Mr. Morell, an enterprising landlord in the vicinity. Such affrays have been only too common, and Mr. Morell having applied in vain for the protection of the police, was obliged to protect himself. * * * This last affray was headed by a Mr. Hely and by a native."

Friend of India অম্লানবদনে লিখিলেন, মরেল্ সাহেবকে পুলিস রক্ষা করিল না, কাজেই তিনি আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে Friend of Indiaকেও সুর বদলাইতে হইয়াছিল। আমি কাগজ পত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে সারসঙ্কলন করিয়া নিম্নে বিবৃত করিলাম।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ নভেম্বর তারিখে কয়েকখানা মানুষ বোঝাই নৌকা আসিয়া বড়খালি গ্রামের তটে আশে পাশে লাগিল। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই—অল্প অল্প অন্ধকার ঝোপেঝাপে চারিদিকে লুকাইয়া রহিয়াছে। নৌকার লোকেরা নিঃশব্দে উঠিয়া গ্রামখানি ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা সংখ্যায় বড় কম নহে,—প্রায় তিন শত হইবে। কাহারও হাতে লাঠী কাহারও হাতে সড়কি, কাহারও হাতে বা বন্দুক। ইহারা সকলেই মরেল্ সাহেবের লাঠিয়াল। ডেনিস্ হিলি তাহাদের নেতা। হিলি মরেল্ সাহেবের জমিদারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জমিদারীর হিতার্থ লাঠিয়াল লইয়া বিদ্রোহী প্রজা দমন করিতে হইত।

বড়খালির প্রজারা বড়ই দুরন্ত। তাহারা বৃদ্ধি খাজনা দিতে গোল করে, নীল চাষ করিতেও আপত্তি করে। তাহারা বলে, গলা কাটিয়া ফেলিলেও নীল চাষ করিব না। কাজেই তাহাদের শাসন আবশ্যক হইয়া উঠিল; কিন্তু মরেল্ সাহেব সহজে তাহাদের শাসন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রজারা সংখ্যায় অনেক, একতাসম্বদ্ধ ও বলবান্।

বলবান্ হইলেও তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এক মাঠ ধান বা এক গোলা চাল লুণ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত; সাহেবের দু একটা লাঠিয়াল জখম হইলে, সে সংবাদ সাহেবের কোণেও পৌঁছিত না। এইরূপে বহুকাল হইতে মরেল্ সাহেবের সঙ্গে বড়খালির প্রজাদের বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। সাহেব অবশেষে তাহাদের বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার মানসে হিলি সাহেবের অধ্যক্ষতায় ১২ নৌকা লাঠিয়াল পাঠাইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার পুলিস পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, হিলি সাহেব একটা দাঙ্গা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু কোথায় যে দাঙ্গা করিবেন, তাহা পূর্ব্বাহ্নে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সাহেবেরা ভাণ করিলেন, সরুলিয়া আক্রান্ত হইবে; পুলিস সেই দিকে ছুটিল। সাহেবেরা এ দিকে রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বড়খালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রত্যূষে যখন বড়খালি আক্রান্ত হইল, তখন গ্রামবাসীরা সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারাও লাঠী ও সড়্কি লইয়া 'মার্' 'মার্' শব্দে ছুটিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, এবার সাহেবরা সংখ্যায় অনেক। তাহাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কেহ ফিরিল না। রহিম উল্লা নামধেয় জনৈক বলবান্ পাঠান লাঠী লইয়া অগ্রসর হইল। তাহার লাঠীতে মরেল-গঞ্জের কয়েকজন অস্ত্রধারী ধরাশায়ী হইল। হিলি সাহেব তাহা দেখিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না—এই জনশ্রুতি যে, হিলি সাহেব বন্দুক ছুঁড়িলেন, রহিম আহত হইল। মোকর্দ্দমা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল আমি তখনকার কাগজ হরকরা, ইংলিশম্যান, ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি হইতে ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

রহিম আহত হইয়া পলায়ন করিল; এবং গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া ক্ষতস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। উঠানের চারি দিকে উচ্চ গাছ, গাছের পাশে দরমার উঁচু বেড়া, তার নীচে খাদ। রহিম যখন বসিয়া পায়ের ক্ষত বাঁধিতেছে, তখন দ্বিতীয় গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। রহিম তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এ গুলি প্রথম গুলির ন্যায় হিলি সাহেবের বন্দুক হইতে ছুটিয়াছিল বলিয়া সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয়।

রহিম গ্রামের একজন মান্য গণ্য ব্যক্তি। সে যখন মরিয়া গেল, তখন গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া জঙ্গলের দিকে পলাইতে লাগিল। সে সময়ের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। লাঠিয়ালেরা মহা উল্লাসে গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহা লইয়া যাইতে পারে, তাহা লুণ্ঠন করিল; যাহা লইয়া যাইতে অসমর্থ, তাহা ভস্মীভূত

করিল ; যাহা আগুনে পুড়াইবার নয়, তাহা জলে ফেলিয়া দিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকে মারিল। রমণীরাও নিস্তার পাইল না। যাহাদের বয়স আছে, তাহারা বন্দী হইল। রহিম উল্লার স্ত্রী ভগিনী কেহই পরিত্রাণ পাইল না।—বিজয়ী দল, তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। আর একটা জিনিষ তাহারা সঙ্গে লইল, সেটা রহিম উল্লার মৃতদেহ।

যে গ্রাম অরুণোদয়ে হাসিতেছিল, সে গ্রাম মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে হৃতসর্ব্বস্ব হইল। গ্রাম বেষ্টন করিয়া রমণীর হাহাকার-ধ্বনি, আর অনলের গর্জ্জন উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ণে সে ধ্বনি পৌঁছিল,—তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

তিনি পুলিস লইয়া স্বয়ং তদন্ত করিতে আসিলেন। মরেল-গঞ্জে আসিয়া দেখিলেন, সাহেবরা পলাতক। আমি বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, লাইটফুট নামধেয় জনৈক সাহেব, মরেলের অংশীদার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে মরেল্, লাইটফুট, হিলি, সকলে পলায়ন করিলেন। ধরা পড়িল, বাঙ্গালী লাঠিয়ালরা। তন্মধ্যে দৌলত চৌকীদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র হিলি সাহেবের নামে ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া আসামীদের বিচারার্থ যশোহরে পাঠাইলেন। নিজে বিচার করিলেন না ; কেন না, আইনানুসারে তদন্তকারী বিচার করিতে অসমর্থ।

দায়রার বিচারে দৌলত চৌকীদারের উপর ফাঁসির হুকুম হইল, এবং চৌত্রিশ জন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাদেশ হইল।

সাহেবেরা নিরুদ্দিষ্ট। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মরেল্ ও লাইটফুট বিলাতে পলাইলেন। হিলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করিয়া বোম্বাই হইতে পলাইতেছিল, এমন সময় পুলিস গিয়া তাহাকে ধরিল, এবং টানিয়া আনিয়া জেলে পুরিল। হিলি অনেকদিন জেলে পড়িয়া রহিল। অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাইকোর্টের বিচারে হিলি খালাস পাইল।

খালাস পাইবারই কথা। হিলিকে কেহ সনাক্ত করিতে পারিল না ; তা' ছাড়া রহিম উল্লার মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

যখন সাহেবরা পলাতক, তখন খুলনায় রাষ্ট্র হইল, বঙ্কিমচন্দ্রকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছে। যে তাঁহাকে মারিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কে ঘোষণা করিল, ও কে যে টাকা দিবে, তাহা আমি জানি না। জনরব যে, একজন সাহেব নাকি এক পকেটে রিভলভার ও অন্য পকেটে এক লক্ষ টাকার নোট লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সাহেব নাকি উক্ত জিনিষ দুইটি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিয়াছিল, "তুমি কোন্ জিনিসটি চাও? যদি অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত না হও, তবে এখনি তোমায় হত্যা করিব।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কথার উত্তর দিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন ; এবং দ্বার বন্ধ করিয়া ভৃত্যদের ডাকিতে লাগিলেন। সাহেব তখন পলাইল। *

তার পর ঘোষণা প্রচার হইল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ মারিতে পারিল না ; ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পেস্‌কার মরেল-গঞ্জের লোকদের হাতে পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে হরকরা লিখিলেন,—"Another affray has taken place at Morell-ganj. The Police were rather severely handled in an attempt to seize the missing Peshkar."

পেস্‌কারকে উদ্ধার করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; কিন্তু উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং এমন শোধ লইয়াছিলেন যে, মরেল-গঞ্জকে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। যশোহর জেলার অন্যান্য মহকুমায় গোলযোগ চলিতে লাগিল ; কিন্তু খুলনা শান্ত। বেন্‌ব্রিজ সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য-দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া গবর্মেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। কর্ত্তা বিডন সাহেব ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের এক শত টাকা বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এইরূপে চারি বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার প্রোমোশন পাইলেন, পঠদ্দশায় তিনি যেমন এক এক ক্লাস ডিঙ্গাইয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনই অনেককে অতিক্রম করিয়া প্রোমোশন পাইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর পাঁচ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

জলদস্যু দমন করিতেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহস ও তেজের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু মরেল-গঞ্জ-ঘটিত ব্যাপারের তুলনায় সে সব কথা অতি তুচ্ছ। যে নীলকর জমিদারেরা বাঙ্গালার Unofficial Parliament বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যে নীলকরেরা ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের নামেও Libel case ** আনিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, সে সব ব্যবসাদার বড় সহজ লোক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের কয়েকজনকে দমন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাই ঘটনাটি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম।

আর একটা কথার উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্রের চারি দিকে দস্যু তস্কর—যখন তাঁহার সঙ্গে নীলকরদের ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছে, তখন তিনি স্থিরচিত্তে বসিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছেন। জানি না, খুলনায় কি দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান ও মোগলের লড়াই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খুলনায় প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু পাঠান বা মোগলের উল্লেখযোগ্য কোনও কীর্ত্তি নাই।

* এ গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়স্ক ভাগিনেয় স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্রের লিখিত একখানি পুস্তিকায় আছে।

** ম্যাক্ আর্থার সাহেব, ছোটলাটের বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দ্দমা আনিয়াছিলেন। বিচারপতি Sir Barnes Peacock বিচার করিয়া ছোটলাটের এক টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বদলী হইয়া বারুইপুরে গেলেন। খুলনায় তাঁহার স্থলে এক জন সাহেব আসিল; সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য একজন দেশীয় ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। যে কাজ বঙ্কিমচন্দ্র একা করিতেন, সে কাজ দুইজনে চালাইতে লাগিলেন।

বারুইপুর

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে প্রথমবার বেশীদিনের জন্য ছিলেন না; বোধ হয় সাত মাস হইবে। এখানে এমন কিছু করেন নাই, যাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। বারুইপুরের কোন ভদ্র ব্যক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও মাসিকপত্রে কিছু লিখিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

সাইক্লোনের সময় বঙ্কিমচন্দ্র দুঃস্থ প্রজাদের নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন অপরাহ্নে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কীটাণু, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎসিত, * আর আর সমস্তই সুন্দর।"

লেখক বলিতেছেন, "এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনও তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই—কখনও ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই, বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন পরিচয় কখনও পাই নাই।"

লেখক অতি দক্ষতার সহিত বলিয়া যাইতেছেন,—"আমাদের বারুইপুরে অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্বন্ধে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণবাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোন অভিমান দেখি নাই, বঙ্কিমবাবুতেও কনিষ্ঠত্বের কোন সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপের মধ্যে কোন লজ্জা সরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

"মধ্যে মধ্যে বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ২৪ পরগণার **Assistant District Superintendent** বাবু জগদীশনাথ রায়, বঙ্কিমবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলে কয়েক দিন অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদে থাকিতেন। ** একবার বঙ্কিমবাবুর

* কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মানুষ কুৎসিত!

মজিলপুরে অবস্থিতি কালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি ৮॥০ টার সময় গাড়ী করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের আগমনের কোন সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন, 'আমরা বাগবাজারের মেথরাণী।' বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠত্যাগ করিয়া, বারাণ্ডায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কালুয়া নিকাল দেও',—'কালুয়া নিকাল দেও'। এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

"বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের Ten Sermons নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "Such worst English I have never read."

বারুইপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার বারুইপুর ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় দেড় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিয়া বসিলেন। অবকাশান্তে আবার বারুইপুরে আসিলেন। এবার সেখানে বেশীদিন থাকিতে হইল না; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার এক নূতন চাকরী জুটিল। গবর্মেণ্টের আমলাদের বেতন নির্দ্ধারণ জন্য পূর্ব্ব হইতে এক কমিশন বসিয়াছিল। হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এটা বড় সামান্য গৌরবের কথা নয়। যে পদে একজন হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদে বাঙ্গালী যুবক বৃত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজে দেড় মাস মাত্র নিযুক্ত ছিলেন। তারপর ২৪-পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দশ মাস মাত্র ছিলেন। সেই দশ মাসের ভিতর তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটী লইলেন। ছুটীর কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মৃণালিনীর পাণ্ডুলিপি-সংশোধনে অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। তখনকার দিনে ছাপার কার্য্য তত দ্রুত অগ্রসর হইত না। মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; তখনও মৃণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মৃণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র

বহরমপুরে চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র B. L. পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বহরমপুর

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন তাঁহার বেতন হইল সাত শত টাকা। কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে রাজসাহী ডিবিসনের কমিশনরের Personal Assistant স্বরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানান্তরে যাইতে হয় নাই, বহরমপুর তখন রাজসাহী ডিবিসনের অন্তর্গত ছিল; এবং বহরমপুরেই কমিশনর সাহেবের Head Quarters ছিল।

এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। নগ্নপদে নগ্নদেহে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরীয়মাত্র সম্বল করিয়া কাছারীতে আসিয়া বসিতেন। দুই একদিন মাত্র এইভাবে কাছারী করিয়াছিলেন। তারপর ছুটী লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের লুপ লাইন খুলিয়াছে, কিন্তু আজিমগঞ্জ বা লালগোলা রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে নলহাটীতে গিয়া ট্রেনে উঠিতে হইল। সেখানে এক বিপদ্। গাড়ীতে উঠিতে গিয়া দেখেন দুইজন সাহেব মদ খাইতেছে। সময় নাই, সেকেণ্ড ক্লাস কম্‌পার্টমেন্টও আর নাই। বাধ্য হইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন।

সাহেবরা দেখিল, একজন নগ্নপদ, নগ্নদেহ বাঙ্গালী তাহাদের গাড়ীতে উঠিল। তাহারা ভাবিল, নেটিভটা বুঝি ভ্রমক্রমে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহারা 'উতার যাও', 'উতার যাও' শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ট্রেন কিন্তু তখন চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বিপদ্ মন্দ নয়। তাঁহার সঙ্গে একজন ভৃত্য ছিল, সেও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। দুইজন মত্ত সাহেবের সম্মুখে ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বঙ্কিমচন্দ্র একাকী। কিন্তু তিনি পিছাইলেন না; সাহেবদের বলিলেন, "চলন্ত গাড়ী হইতে কেমন করিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তোমরা আগে তাহা দেখাইয়া দাও।"

সাহেবেরা দেখিল, নেটিভটা বেশ ইংরাজি জানে। তাহাদের চক্ষু যদি মদের মোহে আচ্ছন্ন না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত, বঙ্কিমচন্দ্র সামান্য মনুষ্য নহেন। সাহেবেরা তাহা দেখিতে পাইল না; তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নামিয়া যাইবার জন্য পীড়ন করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীপ্তনয়নে তীব্র ভাষায় সাহেবদের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সাহেবেরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। এমন সময় পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র নামিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে

উঠিলেন। তদবধি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আর উঠিতেন না। তিনি বলিতেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতর সাহেবরা উঠে। বাঙ্গালী ভদ্রলোক যদি আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ট্রেনে যাতায়াত করিতে বাসনা করে, তাহা হইলে প্রথম অথবা মধ্য শ্রেণীর গাড়ী যেন ব্যবহার করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে অবস্থানকালে নফরবাবু তথায় মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার পুরা নাম—নফরচন্দ্র ভট্ট। এই নফরবাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটু প্রণয় হইয়াছিল। একদা স্থানীয় কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে নফরবাবু ও বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। উভয়ে যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সহরের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাতে বসিয়া নফরবাবু একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন; সেটা ডারউইনের থিয়রি। অন্য লোকে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া নফরবাবু এই থিয়রি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যাঁহারা ডারউইন পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিলেন, নফরবাবু ডারউইন কোনও কালে পড়েন নাই। কিন্তু নফরবাবুর বক্তৃতার বিরাম নাই। তিনি ক্রমেই পঙ্কে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি নফরবাবুকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন। নফরবাবু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "যাহা জান না, পড় নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিও না।"

নফরবাবু নীরব হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ডারউইনের থিয়রি, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন। নফরবাবু সেদিন আর একটীও কথা কহেন নাই,—নীরবে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করিয়া 'সোমপ্রকাশে' এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ করিলেন, বহরমপুর হইতে কোনও ব্যক্তি এই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, নফরবাবুরই কাজ। একদিন তিনি নির্জ্জনে নফরবাবুকে ধরিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "নফরবাবু, তুমি কি সোমপ্রকাশে প্রবন্ধ লিখিয়াছ?"

নফরবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া তদ্দণ্ডে অপরাধ স্বীকার করিলেন; এবং দুঃখপ্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিগলিতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তদবধি তাঁহাদের প্রণয় অক্ষুণ্ণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এবার একজন সাহেবের বিবাদ বাধিল। সাহেব যে সে লোক নয়,—তাঁহার নাম Colonel Duffin (কর্ণেল ডফিন)। বহরমপুরে তখন সেনানিবাস ছিল; —অনেকগুলি গোরা সেথায় থাকিত, কর্ণেল সাহেব তাহাদের সেনানায়ক অর্থাৎ Commanding Officer ছিলেন। এই প্রবল প্রতাপান্বিত সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুতর ঝগড়া বাধিল।

ঝগড়া গুরুতর হইলেও কারণটী তত গুরু নয়। একটা সরু পথ গোরানিবাস

ব্যারাকের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের উপর দিয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কাছারী যাতায়াত করিতেন, কখনও পদব্রজে, কখনও বা শিবিকারোহণে। অন্যান্য লোকও এই পথ দিয়া চলিত। আরও একটা পথ ছিল, কিন্তু সেটা অনেকটা ঘুরিয়া গিয়াছে; তাই ব্যারাকের পথ ধরিয়া সকলে চলিত। কিন্তু গোরাদের তাহাতে আপত্তি।

একদিন অপরাহ্লে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে কাছারী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। বাহকেরা এই পথ ধরিয়াছিল। পাল্কীর এক দিকের দ্বার বন্ধ ছিল। পাল্কী যখন মধ্যপথে, তখন পাল্কীর বন্ধ দ্বারের উপর সজোরে করাঘাত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকার দ্বার ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া লম্ফত্যাগে পাল্কী হইতে ভূতলে পড়িলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একজন সাহেব। একটু দূরে কয়েকজন সাহেব ক্রিকেট খেলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, নিকটের সাহেবই পাল্কীর দ্বারে আঘাত করিয়াছে। এই সাহেব কর্ণেল ডফিন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে চিনিতেন কি না, জানি না। কিন্তু তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া মহারোষে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who the Devil you are ?"

সাহেব উত্তর না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরিয়া সবলে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ক্রীড়াভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং ক্রীড়ারত সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন। দুই তিন জন সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে জজ বেন্‌ব্রিজ একজন। বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "Have you seen how I have been dealt with by that person ?"

বেন্‌ব্রিজ সাহেব উত্তর করিলেন, "O Babu, I am short-sighted—I have not seen anything."

তিনি সত্য সত্যই চক্ষে কম দেখিতেন। ভগবান্ জানেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিলেন কি না। কিন্তু তিনি ও কর্ণেল ডফিন পরে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র জজ বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নিকট হইতে ফিরিয়া অন্যান্য সাহেবদের সমীপস্থ হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কিছু দেখিয়াছেন ?"

তাঁহারা বলিলেন, "না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "উত্তম, আদালতে এই কথা বলিবেন।"

বলিয়া তিনি রোষে ক্ষোভে জলিতে জলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণেলের নামে ফৌজদারীতে নালিস করিলেন। বিচারক, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তিনি ন্যায়বান্, বঙ্কিমচন্দ্রের গুণ-পক্ষপাতী। কর্ণেলের উপর সমন জারী হইল।

নগরের লোক কর্ণেলের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সাহেবকে গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া লুকাইয়া আসিতে হইয়াছিল। তবু সাহেব ঢিল খাইয়া-

ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

সাহেব আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইলেন। বিচার দেখিতে নগর ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী, সাহেবের নামে নালিশ করিয়াছে; তা আবার যে সে সাহেব নয়,—একটা সেনাদলের কর্ত্তা, গোটা কর্ণেল। তখনকার দিনে এ দৃশ্য নূতন। সুতরাং বিস্মিত, স্তম্ভিত অধিবাসীরা অশ্রুতপূর্ব্ব মোকর্দ্দমার বিচার দেখিতে আদালত-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। কেহ ডিপুটী বঙ্কিমকে, কেহ কর্ণেল সাহেবকে, কেহ বা বিচারককে দেখিতে আসিল; কেহ বা সকলে আসিতেছে দেখিয়া আসিল। উকীল, মোক্তার, কর্ম্মচারী নিজ নিজ কাজ ফেলিয়া মোকর্দ্দমা দেখিতে আসিল। এইরূপে আদালত-প্রাঙ্গণ জনতায় পরিপূর্ণ হইল।

এই মোকর্দ্দমার একটু বিশেষত্ব ছিল। বহরমপুরে সে সময় প্রায় দেড় শত উকীল মোক্তার ছিলেন। এই দেড় শত উকীল মোক্তার উপযাচক হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় দস্তখত করিলেন। সেই হেতু কর্ণেল সাহেব বড় বিপাকে পড়িলেন, তিনি যে উকীলের কাছে যান, সেই উকীলই বলেন, "আমি বঙ্কিমবাবুর ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছি।" অবশেষে তিনি উকীল ছাড়িয়া মোক্তারদের দ্বারস্থ হইলেন। সেখানেও তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। কোনও মোক্তার বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সম্মত হইলেন না।

তখন কর্ণেল সাহেব মহাভীত হইয়া পড়িলেন। গবর্ণমেন্টেরও চমক ভাঙ্গিল। কমিশনার সাহেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাহেব-মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে সময় বহরমপুরে অনেক সাহেব বাস করিতেন। কমিশনার মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বয়ং কোনও অনুরোধ করিলেন না। তিনি ও অন্যান্য সাহেবেরা বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে ধরিলেন।

বেন্‌ব্রিজ সাহেবের নাম কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন। তিনি এক জন ভাল জজ ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বেন্‌ব্রিজ সাহেব বহরমপুরে জজ-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণ-মুগ্ধ পুরাতন বন্ধু। সাহেবেরা তাঁহাকে ধরিলে তিনি বলিলেন, "কর্ণেল ডফিন বঙ্কিমবাবুকে অপমান করিয়াছেন। যদি তিনি বঙ্কিমবাবুর নিকট ক্ষমা চাহিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি মধ্যস্থতা করিতে পারি।"

ডফিন তদ্দণ্ডে স্বীকার পাইলেন। বেন্‌ব্রিজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিলেন। কর্ণেল সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিমবাবু, তোমার যে হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক তোমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলাম, তোমার সেই হাত ধরিয়া আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইলেন।

এখনকার দিনে সচরাচর দেখিতে পাই, রাজকর্ম্মচারীরা রাজপ্রসাদলাভাশায়

বিবেক-বুদ্ধিকেও পদদলিত করিতে সঙ্কুচিত হন না। দোষ ঠিক তাঁহাদের নহে; না করিলে অনেক সময়ে চলে না—চাক্‌রী থাকে না, তাই তাঁহারা করেন। কিন্তু এমনও অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা চাক্‌রী অপেক্ষা বিবেকটাকে বড় মনে করেন —রাজপ্রসাদ অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের এক জন ডিপুটী নিজের বিবেচনা-বুদ্ধিমত কার্য্য করিতে গিয়া তদানীন্তন ছোটলাট কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বিলাতের কমন্স সভাতেও কথাটা উঠিয়াছিল। প্রবল ঝটিকাঘাতেও ব্রাহ্মণসন্তানের বিবেক অক্ষুন্ন ছিল। পরিশেষে ভগবান্ তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

এই মহাপুরুষদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও একজন। তিনি রাজপ্রসাদলাভাশায় কখন নিজের বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক সময়ে আঠারটি বাকি খাজনার মোকর্দ্দমা বিচারের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। তখনকার দিনে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটেরা বাকি খাজনার মোকর্দ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন। পরে মুন্সেফদিগের উপর সে ভার অর্পিত হয়। উক্ত মোকর্দ্দমা কয়টি কিছু দিন হইতে পড়িয়াছিল; বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষ ধনশালী জমিদার। এক পক্ষে উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অপর পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ জজ স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বাবু সে সময় বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। এই প্রথিতনামা উকীলদ্বয় মোকর্দ্দমা কয়টি মুলতবী রাখিবার জন্য হাকিমের নিকট একযোগে প্রার্থনা করিলেন। হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনারা সময়ের প্রার্থনা করিতেছেন?"

উকীল বাবুরা উত্তর করিলেন, "মোকর্দ্দমা মিট্‌মাট হইবার কথা হইতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সময় দিয়া মোকর্দ্দমাগুলি মুলতবী রাখিলেন।

পুনর্ব্বার মোকর্দ্দমা শুনানীর দিন উকীলদ্বয় পুনরায় সময়ের প্রার্থনা করিলেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার সময় কেন?"

উকীল। মোকর্দ্দমা মিটাইয়া উঠিতে পারি নাই—আরও কিছু সময় পাইলে মিটাইতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

হাকিম। আপনাদের সময় দিতে আমার কোনও আপত্তি নাই; কমিশনর সাহেবের বিশেষ আপত্তি আছে। গতবারে আপনাদের প্রার্থনামত সময় দিয়াছিলাম; তজ্জন্য কমিশনর আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মন্তব্যটা শুনুন।

বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্যটা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মন্তব্যে কটাক্ষপাত ছাড়া একটু ভয়প্রদর্শনও ছিল। পাঠান্তে তিনি বলিলেন, "কমিশনরের আদেশ চুলোয় যাক্। আপনাদের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা আমি করিব,—প্রার্থনামত সময় দিলাম।"

এরূপ সাহস ডিপুটিদিগের মধ্যে বিরল। সাধারণের সুবিধা-অন্বেষণ না করিয়া

আমরা সচরাচর সাহেব-প্রীতি অন্বেষণ করিয়া থাকি। কর্ত্তার কর্ত্তা কমিশনরের হুকুম উপেক্ষা করিতে কয়জনের সাহসে কুলায়?

কিন্তু এ তেজ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহেবরা সম্মান করিতেন। একবার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বহরমপুর পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ছোটলাট সাতিশয় তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, "তুমি ষ্টীমারে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

সাহেব একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। লাট সাহেবের জাহাজ 'রোটাস' তখন মাঝ গাঙ্গে। তথায় পঁহুছিতে হইলে নৌকা ভিন্ন উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনিও লাট-দর্শনে চলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের নৌকায় উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকায় যান। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "আপনাকে রাখিয়া নৌকা ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে—আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোটলাটের নিকট পঁহুছিতে পারিব না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর কোনও আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি আগে ছোটলাটের কাছে কার্ড পাঠাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা অচিরে 'রোটাসে' গিয়া লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্ড পাঠাইলেন—বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিশ্রুতি মত কার্ড পাঠাইতে বিরত থাকিলেন।

ছোটলাট সম্ভবতঃ জাহাজের গবাক্ষ-পথ দিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া থাকিবেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্ড পাইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিলেন, "তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর—ডিপুটি বঙ্কিমবাবুকে আগে পাঠাইয়া দাও।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বঙ্কিমবাবুকে হুকুম দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু মুগ্ধ হইলেন। সম্মানটুকু বড় সামান্য নয়। বাঙ্গালীর পক্ষে এ সম্মান ঘটিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র ডিপুটির ভাগ্যে এরূপ সম্মান বিরল।

যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি সচরাচর সকলের নিকট সম্মান পাইয়া থাকেন; যাঁহার সে বোধ নাই, তিনি অনেক স্থলে লাঞ্ছিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ—বেরা। বেরা-উৎসব খুব ধুমধামের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত—এখনও হয়; তবে সে জঁাক জমক আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ডকায় ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ—স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমলমণ্ডিত ভেলার উপর, রূপ-যৌবনপ্রফুল্ল নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের ভেলা; তার চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই—শুধু কলাগাছ। কলাগাছের

গায়ে, অসংখ্য আলো। সুন্দর দৃশ্য! মাথার উপর ভাদ্রমাসের নির্ম্মল আকাশ—পদনিম্নে ভরা গাঙ্গের প্রেমময় উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়—সমারোহ নবাবের প্রাসাদে—ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন। জেলার বড বড় জমিদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান আদর বড় একটা জুটিত না। সাহেবরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরির মালা পাইতেন—বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না। বাঙ্গালীর মধ্যে সব্‌জজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস ও নবাবের উকীল (স্যর) শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু হ্যাট কোট পরিয়া সাহেবের দলে মিশিতেন বলিয়া পাইতেন। গুরুদাসবাবু, নবাবের উকীল বলিয়া পাইতেন। অন্যান্য উকীল, ডিপুটি ও মুন্সেফদের ভাগ্যে মালা জুটিত না। মালা যে বহুমূল্য, তা নয়; তবে মালায় একটা সম্মান। তা' ছাড়া ভোজে ও অভ্যর্থনায় একটা পার্থক্য রক্ষিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া এ সকল ব্যাপার শুনিয়াছিলেন।

বহরমপুরে আসিবার কয়েক মাস পরে নবাবের কর্ম্মচারী যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নয়—আমি রাজকর্ম্মচারী বলিয়া। শুনিতে পাই, আপনারা নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সম্মান প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।

কর্ম্মচারী বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেলেন; এবং নবাব ও দেওয়ানের নিকট সকল কথা বলিলেন। তাঁহাদের তখন নয়ন উন্মীলিত হইল। নবাবের আজ্ঞানুক্রমে দেওয়ান বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিলেন; বলিলেন, "আমাদের ক্রটী হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর হইবে না, সাহেবরা যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।"

বাঙ্গালীরা পাইয়াছিলেনও তাই। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, সকল হিন্দুই মালা পাইয়াছিলেন, এবং সাহেবদের সঙ্গে সমান আদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। *

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে "বঙ্গদর্শন" প্রথম প্রকাশিত হয়। সে কথা পরে বলিব। এই সময়ে—"বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইবার পর—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎটা বহরমপুরেই হইয়াছিল। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" ও "বঙ্গদর্শন" পাঠে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

* এই শেষোক্ত গল্প তিনটি স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তোমার যদি এতই অনুরাগ হইয়া থাকে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?"

রমেশবাবু। আমি বাঙ্গালা লিখ্‌ব। আমি জীবনে কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই—লিখিবার প্রণালীও জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র। লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধারায় লিখিবে, সেই ধারাই প্রণালী।

কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় রমেশবাবুকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইংরাজি রচনা কখনও স্থায়ী হইবে না। অন্য লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তোমার খুড়া গোবিন্দচন্দ্র, শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত, হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র; গোবিন্দ ও শশী যে সকল ইংরাজি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা অত্যল্প কালের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মধুসূদন দত্তের বাঙ্গালা কবিতা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না,—বাঙ্গালা সাহিত্য যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহা বর্ত্তমান থাকিবে।" *

ইহার দুই বৎসর পরে রমেশবাবুর "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশিত হইল। তা'র পর তাঁহার আরও কত উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল সহজে ধ্বংস হইবার নয়। কিন্তু তাঁহার "Lays of Ancient India" ধ্বংসোন্মুখ। গোবিন্দ দত্তের "Cherry Blossom" শশী দত্তের "Vision of Sumeru" বিলুপ্ত হইয়াছে। মধুসূদন দত্তের "Captive Ladie" কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার 'মেঘনাদবধ' অবিনশ্বর।

বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন "Rajmohon's wife" নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি "Rajmohan's wife" ও "Adventures of a young Hindu" ছাড়িয়া "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই রকম ভুল অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে। তবে কেহ বঙ্কিমচন্দ্র বা মধুসূদন দত্তের ন্যায় ভুল শোধরাইয়া লয়েন, কেহ বা গোবিন্দচন্দ্র বা শশীচন্দ্রের মত, ভুলেই আজীবন বিভোর থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া প্রথম প্রথম কাহারও সহিত মিশিতেন না—লোকেও তাঁহার সহিত মিশিত না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবতঃই একটু দাম্ভিক। তাঁহার গর্ব্ব, তাঁহার তেজ দেখিয়া লোকে সরিয়া দাঁড়াইত; তিনিও লোকের প্রীতি কুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন না।

কিন্তু দুই এক বৎসর তথায় থাকিতে থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে এতটা জনপ্রীতি সচরাচর জুটে না। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছুটি লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন।

---

* Dutt's Literature of Bengal. P. 226.

জন-সাধারণ সাতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। শুনিয়াছি, প্রায় দেড শত অনুরোধপত্র তাঁহার নিকট আসিযাছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিলেন না।

তখন তাঁহার বিনোদনার্থ অশ্রুতপূর্ব্ব বিদায়ভোজের আযোজন হইতে লাগিল। স্থানীয অধিবাসীরা চাঁদা তুলিয়া সাত দিন ব্যাপী আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করিযাছিল। বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জঠরে বড বেশী টাকা প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু বাঙ্গালী যেমন কাঙ্গালীভোজন করাইয়া, অনাথ কাঙ্গালকে বস্ত্র দান করিযা অর্থব্যয় করিতে পারে, এমনটা বুঝি আর কোনও জাতি পারে না। সমবেত দীন দুঃখীরা উদর পূরিযা খাইয়া যখন "বঙ্কিমচন্দ্রের জয" রবে দিগ দিগন্ত পরিপূরিত করিল, তখন কি বিধাতার আশীর্ব্বাদ আকাশ হইতে বর্ষিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শিরোদেশে পড়ে নাই ?

স্বধু যে দেশবাসীরা তাঁহাকে ধরিযা রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইযাছিল, তাহা নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর সকলেই তাঁহাকে বহরমপুরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ছুটীব দরখাস্ত করিলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমায আমি কোনও মতে ছাডিযা দিতে পারি না।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবকে ধরিলেন ; বলিলেন, "সাহেব, আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, আমায় তিন মাসের ছুটী দাও।"

কমিশনর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমায আমি বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছাডিয়া দিতে পারি না। তবে তুমি যদি স্বীকৃত হও যে, ছুটীর পর আবার এখানে আসিবে, তাহা হইলে তোমায ছাডিযা দিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "এখানে আসিতে আব ইচ্ছা নাই। আপনি জানেন ত এখানকার জলবায়ু বড খারাপ।" *

কমিশনর সাহেব উত্তর করিলেন, "তবে এক কাজ কর,—তুমি Casual leave (ছুটী) লও।"

বঙ্কিমচন্দ্র। Casual leave লইযা কি হইবে ? দুই চারি দিনের ছুটী পথেই ফুরাইয়া যাইবে।

কমিশনর। তুমি যতবার ইচ্ছা, Casual leave প্রার্থনা কর, আমি কোনও আপত্তি না করিয়া মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের অনুগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন ; এবং যত দিন পারিয়াছিলেন, ততদিন একদিনেরও ছুটী না লইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন আর পারিলেন না, তখন ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট লইযা Medical leaveএর দরখাস্ত করিলেন। এ ছুটী না দিয়া কমিশনর থাকিতে পারেন না, তথাপি তিনি দরখাস্ত

* তখন বহরমপুরের জলবায়ু বড় অস্বাস্থ্যকর ছিল।

চাপিয়া রাখিলেন। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র, ড্যাম্‌পিয়ার সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ড্যাম্‌পিয়ার তখন ছোটলাটের আফিসে সেক্রেটারি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গুণানুগত বন্ধু। ড্যাম্‌পিয়ার অবিলম্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছুটী দিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে অবস্থানকালে বেশ সুখে ছিলেন। ধন জন মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সকলই তাঁহার ছিল। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং যশও যথেষ্ট হইয়াছিল। বহরমপুরে বদলি হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটী লইয়া একবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। বারাণসী-ধামে গিয়া প্রায় দেড়মাস বাস করেন। সেখানে কোন কাজ ছিল না, শুধু "মৃণালিনীর" প্রুফ দেখিতেন।

হুগলী

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটী লইয়া বহরমপুর হইতে বিদায় হইলেন। ছুটী-অবসানে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে বারাসতে আসিলেন। সেখানে অতি অল্প সময় থাকিয়া সেই বৎসরেই মালদহে বদলী হইয়া আসিলেন। মালদহের জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি কয়েক মাস মাত্র তথায় থাকিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন হইতে নয় মাসের ছুটী লইয়া গৃহে আসিলেন।

গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, "রাধারাণী" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে লাগিলেন। তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ফুলবাগান, উদ্যান-বাটী, অর্জ্জুনা দীঘী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি সেই ছবি তুলিয়া লইয়া তাহাকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া "কৃষ্ণকান্তের উইলে" বসাইলেন।

বঙ্গদর্শন পূর্ণতেজে তখনও চলিতেছে। পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে"র হিসাব প্রভৃতি রাখিতেন; সঞ্জীবচন্দ্র মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিদর্শন করিতেন; বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সম্পাদন করিতেন।

১২৮২ সালের চৈত্র মাসে—ইংরাজি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন। কাঁটালপাড়া হইতে হুগলী একঘন্টার পথও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র গৃহ হইতে হুগলী যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের জন্য মাত্র। ১২৮৩ সালের প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র কোনও কারণবশতঃ "বঙ্গদর্শন" উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় চলিয়া গেলেন।

১২৮২ সাল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিত হয়; এই বৎসর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়;

এই সময় তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব সমুদিত হয়; এই বৎসরেই তাঁহার কোনও নিকটাত্মীয়ের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

১২৮২ সালের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হয়—আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য বিদূরিত হয—বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিবার আয়োজন হয়।

ধর্ম্মভাবের সূচনা পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু হইয়াছিল—কোনও কারণ অবলম্বনে সহসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবা, তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিযাছিলেন। লোক-চক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক। তার পর দুই তিন বৎসব যাইতে না যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার কাতর হইয়া রাধাবল্লভের চরণে পড়িতে দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র কঠিন রোগগ্রস্ত—মরণাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতাবস্থায় নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম বংশীবদন রাধাবল্লভকে স্বপ্নে দেখিলেন। পরদিন ঠাকুরের নির্ম্মাল্য আনিয়া শিশুর মাথায় দিলেন। শিশু অচিরে আরোগ্য লাভ করিল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইল—ভক্তির ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

কিন্তু ইহা নির্ঝরিণী মাত্র। ঝঙ্কার নাই, শব্দ নাই, শক্তি নাই। প্রৌঢে এই নির্ঝরিণী স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছিল। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীকে বিশালতরঙ্গময়ী কূল-পরিপ্লাবিনী নদীতে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। বিক্ষিপ্ত তরঙ্গ হইতে আমরা "কৃষ্ণচরিত্র" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব" কুড়াইয়া পাইয়াছি। আর শিক্ষা পাইয়াছি, স্বল্প জ্ঞান—অহঙ্কার ও নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়; আবার সেই জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে, ততই আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হয়।

দয়া ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বরাবরই ছিল। একটা ছোট গল্প বলিব। চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর তলায় প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে খুব জাঁক জমকের সহিত মেলা বসিত। এখন বসে কি না জানি না; কিন্তু আগে এই মেলা উপলক্ষে খুব ধুমধাম হইত। আমি ১৮৭৭ সালের কথা বলিতেছি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সেই বৎসর মেলা উপলক্ষে ষণ্ডেশ্বর তলায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। চুঁচুড়ার অপর পার হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গৃহ হইতে দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় অনেক লোক উঠিয়াছে। তিলধারণের স্থান নাই, তবু মাঝি বোঝাই লইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে নিষেধ করিলেন—আইনের ভয় দেখাইলেন, মাঝি তবু শুনিল না, মনের মত বোঝাই লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতে নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল। নৌকারোহীরা কেহ মরিয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। ডাঙ্গা নিকটে ছিল, মাঝিরা নৌকা টানিয়া আনিয়া ডাঙ্গায় লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তদ্দণ্ডে মাঝিকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিলেন। পুলিশ মোকর্দ্দমা রুজু করিল।

মাঝির নাম গোবিন্দ; লোকে সচরাচর তাহাকে গোবে বলিয়া ডাকিত।

তাহার বাড়ী কাঁটালপাড়া ও ভাটপাড়ার মধ্যস্থলে—মালাপাড়ায়। তাহার স্ত্রী ও দুইটি কন্যা ছিল। পুত্র হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া মাঝিকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, এবং তাহার প্রতি তিন মাস কারাবাসের আদেশ প্রদান করিলেন। হতভাগ্যকে কারাবাহিরে আর আসিতে হইল না। তথায় তাহার মৃত্যু হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যতদিন হতভাগ্য মাঝির বিধবা পত্নী বাঁচিয়াছিল, ততদিন তিনি তাহাকে মাসে মাসে বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

দয়া থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র সময় সময় বড়ই কঠিন হইতেন। একবারের একটি ঘটনা বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র। রাখালচন্দ্র জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় এক ব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটালপাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে বলিলেন, "বেশ"। উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন ছাড়া নৌকায় আর কোন ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্য-পথে, তখন দ্বারিকাদাস একটি মোকর্দ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমাটি—ফৌজদারী; ঘটনাস্থল—জিরেট; তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত। গল্পটি শেষ করিয়া দ্বারিকাদাস বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আপনার হাতে মোকর্দ্দমা—আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়াও।" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে নৌকা হতে ফেলে দে।" দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিরূপে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন—এমন কি সময় সময় আত্মবিস্মৃত হইতেন। কোন একটা বিষয়ে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইলে তিনি সেই বিষয়ে এতই নিবিষ্টচিত্ত, এতই তন্ময় হইতেন যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইতেন। একবার চুঁচুড়ায় "মৃণালিনী"র অভিনয় হয়। অভিনয় করেন, 'বেঙ্গল থিয়েটার' সম্প্রদায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে তাঁহারা চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। তবে যাঁহারা 'কন্‌সার্ট' বাজাইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

একজনের মুখে শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের নিমন্ত্রণে সম্প্রদায় চুঁচুড়ায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। অনেক গণ্য মান্য লোক অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অবশ্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ব্যোমকেশের অভিনয় দেখিতেছিলেন। যেখানে ব্যোমকেশ, মৃণালিনীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আর পদাঘাত খাইয়া বলিতেছে, "ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরী তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ'—সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইলেন। তারপর যখন অকস্মাৎ গিরিজায়া, ব্যোমকেশের পশ্চাতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে দংশন করিল, ও বলিল "আর আমি তোমার অর্জ্জুন"—তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এ কার্য্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়ও বটে। এ আত্মবিস্মৃতি, এ তন্ময়ত্ব সংসারে দুর্ল্লভ। কিন্তু ভক্তের বা কবির বা মহা-প্রতিভাবান্ ব্যক্তির নিকট এ তন্ময়ত্ব স্বাভাবিক।

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর বৃথা যায় নাই। মান সম্ভ্রম অর্থসমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর কলেক্টার, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর জেলার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; ডিবিজন্যাল কমিশনর বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে Personal assistant করিয়া লইয়াছিলেন।

পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুরপরিমাণে আসিয়া তাঁহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল; সাধের "বঙ্গদর্শন" আবার মাথা তুলিল; "কমলাকান্তের পত্রাবলী", "রাজসিংহ", "মুচিরাম গুড়েব জীবন চরিত", "কমলাকান্তের জবানবন্দী", "আনন্দমঠ", প্রভৃতি লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। "আনন্দমঠ" বঙ্গদর্শনে বাহির হইবার অনতিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী ত্যাগ করিলেন।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একটী বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম, H.A.D. Philips. তিনি বর্দ্ধমানে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ফিলিপস্ শুধু যে এক জন দক্ষ সিবিলিয়ন ছিলেন, তা' নয়—তিনি নানা ভাষাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত ইংরাজ-কুলপ্রদীপ ছিলেন। এই ফিলিপস্ সাহেবই "কপালকুণ্ডলা" ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যশঃ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যানুরাগ জগতে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে লোকান্তরিত হইলেন।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দগোপাল ঘোষ মহাশয় একটী ঘটনার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সুদেবচন্দ্রের পত্রখানি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম:—

আমি অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি; বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাসা করিয়া থাকিতেন; ভূদেববাবুর বাটীও নিকটে ছিল। উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রণয় ছিল, বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে ভূদেববাবুর

বাটীতে আসিতেন ; ভূদেববাবুও মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর বাটীতে যাইতেন।

একদিন ভূদেববাবুর বাটীতে উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় ললিতবাবু * ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবুর সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি উপাধিতে ভূষিত হন নাই, বা ইডেন সাহেবের (ছোটলাটের) নিকট তখনও বিশেষরূপে সম্মানিত হন নাই। ভূদেববাবুর সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিশেষ আলাপ ছিল। ভূদেববাবু সহসা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও বোধ হয় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে? তাই বুঝি বিদায় মাঙ্গিতে আসিয়াছ?"

উত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন—'না—না, ললিতবাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে আসিয়াছি।"

যদিও কথাটা সত্য, কিন্তু ললিতবাবু তামাসা করিবার সুযোগটা ছাড়িলেন না—বলিলেন, "বটে! এখনি বামাল ধরিয়া দিব, গাড়ীতে কলসী এখনও মজুত আছে।"

বাস্তবিক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গাড়ীতে তখন একটা নূতন পিতলের কলসী ছিল; বঙ্কিমবাবু আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিলেন,—"অধ্যাপক মহাশয়, আপনি এখনও যদি শ্রাদ্ধে বিদায়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সঙ্গে একগাছি দড়ীও লইবেন।"

এইরূপে দড়ী কলসী লইয়া প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদ্বয়ের প্রথমালাপ সূচিত হয়।

চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন, সে বাটীটি আজও আছে। বাটীটি প্রশস্ত, দ্বিতল,—ঠিক গঙ্গার উপর। বারান্দার নীচে দিয়া জাহ্নবী বহিয়া চলিয়াছে। মাথার উপর নীলাকাশ, পদনিম্নে কুলু কুলু ধ্বনি, সম্মুখে ধবলতরঙ্গা জাহ্নবী। বঙ্কিমচন্দ্র সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল।" * *

এই দৃশ্য—কাব্য-রাজ্যের এই মনোরম চিত্রপট বঙ্কিমচন্দ্রের নবোদ্গতপত্রতুল্য কোমল হৃদয়ে অনপনেয় রাগে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। হুগলী ত্যাগের পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দেবী চৌধুরাণী" লিখিতেছিলেন, তখন তাঁহার মানসপটে এ চিত্র

* রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর—বাঁশবেড়িয়ার জমিদার।

** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত।

অঙ্কিত ছিল। তিনি কোমল তুলিকা লইয়া ভিন্ন আধারে ভিন্ন বর্ণে সেই কাব্য-রাজ্য অঙ্কিত করিলেন। তবে সে চিত্র যেন আরও সুন্দর—বর্ণ যেন আরও উজ্জ্বল—কুলুকুলু ধ্বনি যেন আরও কোমল। একটু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বড উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, অন্ধকারমাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি; তীরে, গাছের গোডায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পডিয়া সেখানে জল বড অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফুল ফল পাতা বাহিয়া তীব্রস্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধাবা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে।"*

হাবড়া

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাবডায় আসিলেন। আসিবার পর সি, ই, বক্‌লণ্ডের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর বিবাদ বাধিল। তখন সাহেব, হাবডার কলেক্টার। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কেন না, বঙ্কিমচন্দ্র পুলিস্-চালানি মোকর্দ্দমাগুলি প্রায় ছাড়িয়া দিতেন,—পুলিসের কোনও আব্দার রক্ষা করিতেন না। সুতরাং পুলিসের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না।

ধূমায়মান বহ্নি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল। একটি ঘটনা উপলক্ষ্য হইল। ঘটনাটির একটা বৈচিত্র্য আছে, তাই সবিশেষ বিবরণ দিলাম।

হাবড়ার মিউনিসিপ্যালিটী হইতে নোটিস জারি হইল, combustible পদার্থ দ্বারা কেহ গৃহ আচ্ছাদন করিতে পারিবে না; যদি করে দণ্ডার্হ হইবে। এই নোটিস প্রথমে ইংরাজিতে লিখিত হয়; পরে বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া সহরময় প্রচার করা হয়। অনুবাদ করেন—ডনিথরণ সাহেব। তিনি তখন মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী। অনুবাদটি অতি সুন্দর,—combustible শব্দের অর্থ করা হইল, জলীয়।

* দেবী চৌধুরাণী—দ্বিতীয় খণ্ড—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তিনি জলীয় কি অলীয় লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

এই 'জলীয়' নোটিস এক বুড়ির মাথার উপর পড়িল। তাহার একখানি গোলপাতা আচ্ছাদন-যুক্ত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। বুড়ি লেখা পড়া জানে না; জনৈক প্রতিবেশীকে দিয়া নোটিস পড়াইল। সে দিগ্‌গজ জাতীয় পণ্ডিত, বৃদ্ধাকে পরামর্শ দিল, জল দিয়া ঘর ছাইও না। বৃদ্ধা আশ্বস্ত হইল। তাহার এবম্প্রকার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। সে তাহার গোলপাতার ঘরখানিকে কোনও রকমে জলযুক্ত হইতে দিল না। আচ্ছাদনটি তখন বেশ combustible.

কিছুদিন গত হইতে না হইতে মিউনিসিপ্যালিটীর অনুচরেরা বুড়ীকে আসিয়া ধরিল। চেয়ারম্যান সাহেব এই অশীতিপর বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা বিচারের ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন।

বিচার করিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, বৃদ্ধাকে অনর্থক পীড়ন করা হইয়াছে। যে নোটিসের অর্থ বিচারক নিজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে নোটিসের অর্থ বুড়ি কিরূপে বুঝিবে? তিনি বৃদ্ধাকে অব্যাহতি দিয়া রায়ে লিখিলেন, "নোটিসের অর্থ বোধগম্য হইল না। নোটিস insufficient বোধে আসামীকে মুক্তি দিলাম।"

বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে কি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিল, কেন তাহাকে সরকার বাহাদুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেনই বা অবশেষে ছাড়িয়া দিয়াছিল? সে হয়ত ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, কোনও রকমে এক আধ ফোঁটা জল চালের মাথায় পড়িয়া থাকিবে; অতঃপর জলবিন্দু রৌদ্রতেজে শুকাইয়া যাওয়াতে সে খালাস পাইয়াছিল।

বুড়ি খালাস পাইল দেখিয়া বক্‌লণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে নথি তলব করিয়া তিনি জজমেন্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন—"Bankim Chandra's vanity in the knowledge of Bengali language has misled the judgment—"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় রোষান্বিত হইলেন; এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, "You are not my judicial superior officer; and you have no right to criticise my judgment." তিনি আরও লিখিলেন, "তুমি যদি এজন্য আমার নিকট এক মাসের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর, তাহা হইলে তুমি কাগজপত্র কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইবে।"

এক মাস গত হইয়া গেল; বক্‌লণ্ড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না—কাগজপত্রও কমিশনরের নিকট পাঠাইলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনর সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কমিশনর বুঝি তখন বিম্‌স সাহেব ছিলেন। কিছু দিন পরে বিম্‌স সাহেব হাওড়ায় আসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তাদার কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন।

তিনি অবিলম্বে প্রভু বক্‌লণ্ডের কাছে ছুটিয়া গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। সাহেব বোধহয় একটু ভীত হইলেন। ভয়—মানের জন্য; তাতে আবার তিনি পাকা ম্যাজিষ্ট্রেট নহেন—একটিং মাত্র। তিনি জানিতেন যে, জজমেন্টের উপর মন্তব্য লেখা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু অধীনস্থ নেটিভ ডিপুটি যে এতটা করিয়া তুলিবে, তাহা তাঁহার ধারণায় আসে নাই; এক্ষণে যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মিটিয়া যায়, তদভিপ্রায়ে তিনি সেরেস্তদারকে বলিলেন, "অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র যখন আদালত ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিবেন, তখন আমাকে সংবাদ দিবে।"

সেরেস্তাদার তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে লইতে যখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি ছুটিয়া গিয়া সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বারান্দায় ধরিলেন। বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপারটা কি, বুঝিলেন। সাহেব বলিলেন, "Have you seen, Bankim Babu, what remarks I have made about you in my annual report?"

Bankim :—It is not my habit to inquire what District Magistrate write about me in their reports.

Buckland :—I have spoken very highly of you.

Bankim :—I don't care to know that.

সাহেব একটু মুস্কিলে পড়িলেন; এ রকম কড়া কড়া উত্তর পাইবেন মনে করেন নাই। কথাগুলায় একটা ধন্যবাদ, বা একটুও কোমলত্ব নাই। সাহেব তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার জজ্‌মেন্টের উপর একটা মন্তব্য লিখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি কাগজপত্র গভর্মেন্টে পাঠাইতে বলিয়াছিলে; আমি অনুরোধ করিতেছি বঙ্কিম বাবু, তুমি তোমার সে পত্র ফিরাইয়া লও।

বঙ্কিমচন্দ্র। তুমি ক্ষমা (apology) না চাহিলে কিছুতেই ফিরাইয়া লইব না।

সাহেব। ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা প্রেষ্টিজ আছে স্বীকার কর?

বঙ্কিম। আছে, কিন্তু সকলে তা' রাখিতে জানে না।

সাহেব। আচ্ছা বঙ্কিম বাবু, এক কাজ করা যাক্;—আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করি—তুমিও তোমার পত্র উঠাইয়া লও।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মত হইলেন। সাহেব তাঁহার মন্তব্যের নিম্নে লিখিলেন,—"I regret I passed the above remarks; I withdraw them."

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় পত্রের প্রত্যাহার করিলেন। তদবধি মহানুভব বক্‌লণ্ড সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং আজীবন তাঁহার হিতৈষী সুহৃদ্‌ ছিলেন। তাঁহার বঙ্গ-বিশ্রুত পুস্তকে (Bengal under the Lieutenant Governors) বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।*

* এই গল্পটী আমি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তদানীন্তন ছোটলাট Sir Ashley Eden সাহেবের কানেও উঠিয়াছিল। বোধহয় কমিশনর সাহেব তুলিয়া থাকিবেন। উচ্চহৃদয় বঙ্গেশ্বর বিরক্ত না হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সদয় হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বরাবর একটু স্নেহ নয়নে দেখিতেন। একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তোমার বই খুব **popular**—বোধ হয় বেশ বিক্রয় হয় ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের দেশ বড় গরীব, বেশী বিক্রয় হয় না।

সাহেব। দাম কমাইয়া দুই তিন টাকায় বেচিতে পার না ?

বঙ্কিম। এক টাকা দামেও যে লোক কিনিয়া উঠিতে পারে না।

আর একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তোমার পিতা আজও জীবিত আছেন ?"

"আছেন।"

"কতদিন পেন্সন ভোগ করিতেছেন ?"

"পঁচিশ বৎসরের কম হবে না।"

বঙ্গেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ বঙ্কিমবাবু, পঁচিশ বৎসর চাকরী করিলে আমরা পেন্সন্ দিয়া থাকি ; তোমার পিতা পঁচিশ বৎসর পেন্সন্ পাইতেছেন, তাঁকে পেন্সনের পেন্সন্ দেওয়া উচিত।"

তা'র কিছুকাল পরেই—অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দেবোপম পিতা—পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। ১২০১ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১২৮৭ সালে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অপাপবিদ্ধ আত্মা রাজতুল্য সম্মান লইয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, তাহা পর পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পিতার মৃত্যু

একজন সন্ন্যাসীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাদবচন্দ্রের বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। যে অবস্থায় দীক্ষিত হন, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্ত্র দিয়া বিদায় হইবার সময় সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, তিনি আরও তিনবার দর্শন দিবেন। দর্শনও দিয়াছিলেন ; কিন্তু তিন বারের কথা অবগত নহি। শুনিয়াছি, প্রথমবার নাকি বর্দ্ধমানে দর্শন দিয়াছিলেন। অপর দুইবারের কথা এক্ষণে বলিব।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে সন্ন্যাসী, কাঁটালপাড়ার বাটীতে আসিয়া দর্শন দিলেন। যাদবচন্দ্র তখন পূজার দালানে তক্তপোষের উপর ঢালা বিছানায় বসিয়া-

ছিলেন। দিবসের অধিকাংশভাগ তিনি এইখানেই অতিবাহিত করিতেন। এইখানেই বসিয়া তিনি বঙ্গদর্শনের কার্য্যাদি করিতেন—প্রজা বা গ্রামবাসীদের মামলা মোকর্দ্দমা করিতেন। তাঁহার ডাহিনে একখান স্বতন্ত্র তক্তপোষের উপর গালিচা বিছানা থাকিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি আসিয়া তাহাতে বসিতেন। বামে একখানা তক্তপোষ ছিল, তাহাতে ভদ্রলোকের উপযোগী শয্যা বিস্তৃত থাকিত। তাঁহার বিছানায় পৌত্র পৌত্রী ছাড়া অপর কেহ বসিত না। পুত্রেরা যখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন তাঁহারা প্রায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা যদি অনুমতি প্রদান করিতেন, তবে তাঁহারা বসিতেন, কিন্তু সঙ্কোচে, পৃথগাসনে। আমি কখন বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার পিতার সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করিতে দেখি নাই, পিতার সঙ্গে এক শয্যাতেও বসিতে দেখি নাই।

সন্ন্যাসীর কথা বলিতে বলিতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম, যাদবচন্দ্রের গুরুদেবের কথা। তিনি যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। যাদবচন্দ্র দালানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন, এমন সময় গুরুদেব আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শুভ্রদেহ জটাজুটমণ্ডিত, তেজোদীপ্ত, দীর্ঘাকার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া যাদবচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি গুরুদেবকে চিনিতে পারিলেন না, অথচ যাদবচন্দ্র তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জানি না কোন্ শক্তি প্রভাবে যাদবচন্দ্র পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত। তিনি কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উইল করিয়া, ঘর-দ্বার সংস্কার করিয়া, চাঁদোয়া প্রভৃতি মেরামত কবিয়া তিনি মিস্ত্রীদের বলিয়াছিলেন, "বাড়ীতে শীঘ্র একটা বড় গোছের কাজ হইবে।" মুগ্ধ আত্মীয়েরা তখন কেহ বুঝিলেন না, যাদবচন্দ্র নিজের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন।

যাদবচন্দ্র স্থির জানিতেন, গুরুদেব মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিবেন। তিনি গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু গুরুদেবকে সম্মুখে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাদব আমায় চিনিতে পারিতেছ না?" সে স্বর যাদবচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শ করিল,—তিনি সন্ন্যাসীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

তারপর উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা কেহ অবগত নহি। সন্ন্যাসী প্রায় দুই দণ্ড কাল ছিলেন। তিনি এতদপূর্ব্বে যাদবচন্দ্রের কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই; সেই দিন একটু দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব। যাদবচন্দ্র সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবার সময় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজও তাঁহাকে প্রায় তদ্রূপ দেখিলেন। তবে জটাভার যেন আরও বিশাল,—ভূপৃষ্ঠে লুটাইবার উদ্যোগ করিতেছে; নয়ন ও ললাট যেন আরও প্রশান্ত; দেহের জ্যোতিঃ যেন আরও উজ্জ্বল। দেবতুল্য গুরুদেব, যাদবচন্দ্রকে শেষ উপদেশ

দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গুছাইবার যাহা কিছু বাকি ছিল, যাদবচন্দ্র তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে সমাধা করিলেন। অবশেষে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। চিকিৎসক নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বর; বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই।" যাদবচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমায় গঙ্গায় লইয়া চল।" তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহারও সাহস হইল না। তাঁহাকে খাটের উপর শোয়াইয়া প্রথমে রাধাবল্লভের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জাগ্রত দেবতার সম্মুখে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া যাদবচন্দ্র যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে বিগ্রহ পানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

তারপর যাদবচন্দ্রকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে অনেক লোক। গঙ্গার তীরে রাধাবল্লভের ঘাটের উপর একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে; সেই গৃহে যাদবচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল। গৃহের আশে পাশে তাঁবু পড়িল; আত্মীয়স্বজনেরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিন রাত্রি, পুণ্যময় দেবতা গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। তৃতীয় দিবস গভীর নিশীথে যাদবচন্দ্র তাঁহার কন্যা ও পরিচারিকাদিগকে কক্ষবাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কক্ষে অপর কেহ ছিল না। তাঁহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন; এবং গবাক্ষ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার অনতিকাল পরেই তাঁহারা কক্ষমধ্যে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলেন—স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, যেন দুই ব্যক্তি ঘরের ভিতর মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। তাঁহারা বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লোকে বলে, গুরুদেব যাদবচন্দ্রকে শেষ দেখা দিতে আসিয়াছিলেন; হইতেও পারে। কিন্তু সে সম্বন্ধে যাদবচন্দ্র কিছু বলেন নাই; সন্ন্যাসীকেও কেহ দেখেন নাই। লোকের অনুমান মাত্র।

অবিলম্বে যাদবচন্দ্রের আহ্বানে কন্যা ও পরিচারিকা কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কক্ষমধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তার ক্ষণকাল পরে যাদবচন্দ্রকে তাঁহার উপদেশ মত 'অন্তর্জলি' করা হইল। শত শত কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনির মধ্যে অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া পূর্ণজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাদবচন্দ্র জীর্ণ আধার ত্যাগ করিয়া মহামহিমময় লোকে প্রস্থান করিলেন।

আরও একটা কথা না বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। তিনি তখন জলপাইগুড়িতে। তাঁহাকে উপর্য্যুপরি তারে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, পিতৃদেবকে তীরস্থ করা হইয়াছে; কিন্তু যিনি দাসত্বে আবদ্ধ, তিনি কবে ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন? ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বলে—জেলার ভার তাঁহার উপর, তিনি সময়ে কাঁটালপাড়ায় আসিতে পারিলেন না। যখন আসিলেন, তখন চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত-প্রায়।

জলপাইগুড়ি হইতে আসিবার সময় পথে একজন তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসীকে তিনি দেখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বরাবর পূজ্যপাদ শ্যামাচরণের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। বড় বড় ষ্টেশনে নামিয়া তিনি শ্যামাচরণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্যামাচরণের দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইযাছিল। কিন্তু তিনি কাঁটালপাড়ায় নামিয়া সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পান নাই।

চারি ভ্রাতায় মিলিয়া খুব ধুমধামের সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সে দিনের কথা আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। এত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালীর সমাবেশ আমি আর কখন দেখি নাই।

শ্রাদ্ধান্তে একজন সন্ন্যাসীকে 'বৃষে'র নিকট ঘুরিযা বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ তাঁহাকে তখন লক্ষ্য করেন নাই। পরে যখন তিনি বৈঠকখানায় উপবিষ্ট, তখন উক্ত সন্ন্যাসী আসিযা বলিলেন, "বাবু হাম চলে।"

সন্ন্যাসীকে দেখিযা শ্যামাচরণের পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনিই কি কযেক দিন আগে আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ির দিক্ হইতে আসিযাছিলেন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন মাত্র। শ্যামাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি চান?"

সন্ন্যাসী। কিছু না।

শ্যামাচরণ। তবে যাবেন কি না আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

সন্ন্যাসী। কারণ থাকিতে পারে।

শ্যামাচরণ, কার্য্যাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের আহার হইয়াছে?"

কার্য্যাধ্যক্ষ। সন্ধান লইয়া আসি।

বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিযা বলিলেন, "না, সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছুমাত্র আহার করেন নাই—কেবল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।"

তখন শ্যামাচরণ তাঁহাকে যত্নের সহিত সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া আহারাদি করাইতে চেষ্টা পান। কিন্তু সে সব চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আহার করিলেন না। কোনরূপ দানও গ্রহণ করিলেন না। শ্যামাচরণ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কি জন্য আসিযাছিলাম, তাহা পরে জানিতে পারিবেন।"

পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না; তাঁহার নিকট শুনি নাই—কাগজপত্রেও কিছু দেখি নাই। তবে কাঁটালপাড়ানিবাসী উক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিয়াছি, যাদবচন্দ্রের গুরুদেব তাঁহার একজন চেলাকে যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

চেলাকে পাঠাইয়া তিনি হয়ত ভালই করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে একটা

গুরুতর বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। বিঘ্নটি এত গুরুতর যে, শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পারিবারিক কারণ থাকায় এই বিঘ্নটি উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম। জানি না কোন্ শক্তি প্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন নিষ্কাসিত ও শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতা

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গভর্মেন্টের এসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। লোকের ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র এই পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন ; এমন কি, সে সকল অনুমান-সিদ্ধ মহাত্মানিচয় কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহারাও নিঃসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, Chief Secretary Macaulay সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপমানসহকারে তাড়াইয়াছিলেন। এই সকল ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণার্থে Assistant Secretaryর পদ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত পরিচয় দিব।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্মেন্টের দুই জন মাত্র সেক্রেটারী ছিলেন। একজনের অধীনে Revenue ও General বিভাগ ছিল, অপরের অধীনে Judicial, Appointment এবং Political বিভাগ ছিল। উভয়ের অধীনে একজন করিয়া Civilian Under Secretary ছিল ; Assistant Secretary কেহ ছিল না—পদও ছিল না।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের decentralisation scheme অনুসারে পরবৎসর Financial Department সৃষ্টি হইল। কিন্তু এই বিভাগের Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল না। কিছুকাল বাদে Assistant Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে রবার্ট নাইট্ নিযুক্ত হইলেন। নাইট্ সাহেব কিছুদিন চাকরী করিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকতা করিতে চলিয়া গেলেন।

অবশেষে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সেক্রেটারির পদ সৃষ্ট হইল, এবং সেই পদে মেকেঞ্জি সাহেব নিযুক্ত হইলেন। মেকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গে রায় রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বৎসরেকের উপর কাজ করিবার পর রাজেন্দ্রবাবু দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লইলেন। তাঁহার স্থানে বাবু হেমচন্দ্র কর অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইলেন। তিন মাস যাইতে না যাইতে কর্ত্তৃপক্ষ, হেমবাবুকে সরাইয়া বঙ্কিমবাবুকে সেই পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করিলেন।

তখন মেকলে সাহেব, মেকেঞ্জির স্থানে সেক্রেটারি। Chief Secretaryর পদ তখনও সৃষ্ট হয় নাই—আরও কিছুকাল বাদে হইয়াছিল। মেকলে সাহেব আসিয়া

গভর্মেন্টে প্রস্তাব করিলেন যে, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠাইয়া দিয়া অন্য দুই বিভাগে যেমন Under Secretary আছে, সেইরূপ Financial বিভাগে একজন সিভিলিয়ন আণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হউক। তিনি এই প্রস্তাব ইণ্ডিয়া গভর্মেন্টে পাঠাইবার সময় রাজেন্দ্রবাবু, হেমবাবু ও বঙ্কিমবাবুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ উঠিয়া গেল। এই পদ রাজেন্দ্রবাবুর—হেমবাবু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে কার্য্য করিতেছিলেন মাত্র।

মেকলে সাহেবের প্রস্তাবে, ছোটলাটের দপ্তর হইতে বাঙ্গালীর অন্ন উঠিয়া গেল। উঠাইয়া দিয়া গভর্মেণ্ট একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তার কয়েক বৎসর পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Public Service Commission স্থির করিলেন, তিনজন Under Secretaryর মধ্যে একজন উপযুক্ত ভারতবাসী নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব বিশ বৎসর পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল—বিশ বৎসর পরে রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এই Under Secretaryর পদে নিযুক্ত হইযাছিলেন। এ সম্মানিত পদ পাইতে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী।

মেকলে সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে এককালে ঝগড়া হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। একবার দস্তখত লইয়া উভয়ের মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। সাহেব বলিলেন, "তুমি পুরা নাম দস্তখত করিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আগে তুমি পুরা দস্তখত কর, পরে আমি করিব। তুমি C. P. L. Macaulay বই Colman Patric Louis Macaulay লেখ না। আমি B. C. Chatterjee লিখিলে যত দোষ?"

মেকলে সাহেব হয়ত ছোটলাটের কান ভারি করিতে একটু আধটু চেষ্টা করিয়া থাকিবেন; কাগজ কলমে কিছু পাওয়া যায় না। বিচক্ষণ ইডেন সাহেব তখন আমাদের ছোটলাট। তিনি কর্ম্মদক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহচক্ষে দেখিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মেকলে সাহেবের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, ছোটলাট প্রায় সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিতেন। ইডেন সাহেব একদিন তাঁহার বন্ধু বাবু প্রসাদদাস দত্তকে বলিয়াছিলেন, "Bankim Chandra is an excellent officer. I always support him in his differences with Mr. Macaulay."

এইত গেল আসল কথা; তা' ছাড়া বাজে কথাও কিছু আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক নিন্দকের একখানি সংবাদপত্র ছিল। তিনি এই সুযোগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা রটনা করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহা সাহেবরা সচরাচর করে না, বাঙ্গালী তাহা করিল। তাঁহার লিখিবার কৌশলটুকুও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি লিখিলেন:—

"We understand that Baboo Bankim Chandra Chetterji, the

offg. Assistant Secretary to the Bengal Government received a short and sweet note from Mr. Secretary Macaulay, on the 22nd January. Mr. Macaulay is reported to have written :—"Very much pleased with the manner in which you have done your work, but you must make over charge within an hour." The charge against Bankim Babu is that, during his time, office secrets oozed out from the office. This is the alleged charge, and which of course every body must regard as simply absurd. The story goes that when the appointment was given to Bankim Baboo, it was done in opposition to the wishes of some secretaries who objected to have a native again. These secretaries have now come forward with the charge that Bankim Babu permitted secrets to travel out of the office. His place has now been given to Mr. Blyth. So after all, the place which was made over to the natives of Bengal with so much beat of drum, has now been again given to a European. We wonder when will men in high position learn to be sincere, to adhere to the pledges they give."

বাঙ্গালী-সম্পাদক তাঁহার ইংরাজি কাগজে যাহা লিখিলেন, ন্যায়পরায়ণ রবার্ট নাইট তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখিলেন :—

With respect to the statements made by our contemporary, we are informed that no "charge" of any kind has been made against Baboo Bankim Chandra Chatterjei, and his transfer was accompanied by no reflection whatever on his character or his abilities. It is a singular thing that if "office secrets" were divulged during the period for which the Baboo acted as Assistant Secretary, the head of the office is unware of the fact, and the words which purport to be an extract from Mr. Macaulay's letter were never written by him. Baboo Bankim Chandra Chatterjei is a man of high character and attainments, and whatever may be the reason for his transfer, we are glad to be assured that it implies no reflection on him as a public servant, and is, in fact, not personal to him at all, not to Baboo Rajendra Nath Mitter, whose character for ability and integrity stands

equally high.

We agree with the * * in regretting that it has been deemed expedient to take away this important appointment from a native, and we confess our inability to understand the reasons that justify the step. That, however, is a question to be argued on its merits, and we are glad to know that no demerit on the part of either of the gentlemen mentioned, had anything to do with its decision."

যাঁহারা ষ্টেটস্ম্যান না পাড়িয়া শুধু বাঙ্গালীর কাগজ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিযাছিল যে মেকলে সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোটলাটের দপ্তর হইতে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়াছিলেন। মেকলে সাহেব অপবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাতিশয় সুখ্যাতি করিয়া ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টে লিখিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মেকলে সাহেবের প্রস্তাবানুসারে Assistant Secretaryর পদ উঠিয়া গেল—Under Secretaryর পদ সৃষ্ট হইল। Civilian ব্লাইথ সাহেব সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একবার কথা উঠিয়াছিল, তাঁহাকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট করা হইবে। কিন্তু সিবিলিয়নেরা আপত্তি করায় ছোটলাট সে প্রস্তাব চাপা দিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে—বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে—বাঙ্গালীকে জেলার ভার দিবার প্রস্তাব আবার উঠিয়াছিল। তখন পূর্ণবাবু, গোপালবাবু প্রভৃতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

যাজপুরের পথে

কলিকাতা হইতে বদলি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে আসিলেন। কিন্তু তথায় বেশী দিন থাকিলেন না; তিন মাসের মধ্যে, বদলি হইয়া বারাসতে গেলেন। বারাসতেও তিন মাসের অধিক থাকিতে হইল না, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যাজপুরে বদলি হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুরে ছয় মাস ছিলেন। ছয় মাস থাকিয়া যখন তথা হইতে ফিরিতেছিলেন, তখন সঙ্গে তাঁহার মধ্যম জামাতা। তখন রেল হয় নাই। পথ বড় দুর্গম। তা'র উপর আবার পথে ডাকাইতের ভয়। এই ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথে বঙ্কিমচন্দ্র শিবিকারোহণে চলিয়াছেন। জামাতা স্বতন্ত্র শিবিকায়। ভৃত্যাদি মাল পত্র লইয়া অন্য পথে গিয়াছে। সঙ্গে দুইজন মাত্র লোক; তাহারা লণ্ঠন ধরিয়া পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

রাত্রিকাল। চারিদিক্ নীরব। নিকটে জনমানব নাই। চাঁদ মাথার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে; মাঘ মাসের সাদা মেঘ কখনও চাঁদকে গিলিয়া ফেলিতেছে। আবার কখনও উদ্গীরণ করিতেছে। চাঁদ যখন গিলিত হইতেছে, তখন কাঁদিতেছে; আবার যখন উগারিত হইতেছে, তখন হাসিতেছে। মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হইতেছিল।

পথের দুইধারে জঙ্গল। সেই বিশাল অরণ্যমধ্যে দুইটি মাত্র লণ্ঠন-সাহায্যে বেহারারা চলিয়াছে। কখন চাঁদের আলোকে পথ দেখিয়া চলিয়াছে, কখন বা বৃষ্টিধারা মাথায় ধরিয়া লণ্ঠন সাহায্যে পথ দেখিয়া লইতেছে। কন্‌কনে শীত। বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কী আগে, জামাতার পাল্কী পিছনে।

দুইখানা পাল্কীর ষোলজন বাহক; কিন্তু তাহারা উড়ে, সুতরাং মিছামানুষ। বাহকেরা শ্রুতিমধুর রব করিতে করিতে গন্তব্য পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সহসা তাহাদের মধ্যে একটা ভীতি সঞ্চার হইল।—তাহারা সম্মুখে ও পার্শ্বে মানুষ দেখিল। স্থির করিল, তাহারা ডাকাইত। মৃদুকণ্ঠে আপনাদিগের মধ্যে কি বলাবলি করিল; তারপর থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে পাল্কী নামাইল। বঙ্কিমচন্দ্রের তখন একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসিতেছিল। পাল্কী সবেগে ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে রে?"

উত্তর দিবে কে? উড়িষ্যাদেশ-সম্ভূত বীরকুল-উজ্জ্বলকারী বাহকবৃন্দ তখন সবেগে পলায়নতৎপর। সে পলায়নের বৃত্তান্ত রূপান্তরিত অবস্থায় 'দেবী চৌধুরাণী'তে লিপিবদ্ধ হয়। দেবী চৌধুরাণী এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে লিখিত হইতেছিল। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম :—

"ডাকাইতের ভয়ে দুর্ল্লভচন্দ্র আগে আগে পালাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনি পালাইবার রোখ যে তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, "ওগো দাঁড়াও গো আমায় ফেলে যেওনা গো!" দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, "ও বাবা গো, ঐ এলো গো।" কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটাবনে তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে।" ইত্যাদি—

বাহকেরা ত' পলাইল; লণ্ঠনধারী দুইজন লোক পালাইয়াছিল কি না, তাহা ঠিক জানি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের অনুসন্ধান লইবার অবসর পাইলেন না, ডাকাইত আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিল। তাহারা সকলেই উড়িয়া। হাতে লাঠি ছাড়া তাহাদের আর কোন অস্ত্র ছিল বলিয়া শুনি নাই। যা' হউক, উড়িয়ারা যে বহুকাল অবসাদের পর লাঠি লইয়া ডাকাতি করিতে পারে, ইহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের কথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের পাল্কীর এক দিকের কপাট বন্ধ ছিল, অপর দিকের কপাট খোলা। বঙ্কিমচন্দ্র মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন, দশ পনর জন ডাকাইত, দুইখানা পাল্কী

ঘিরিতেছে। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া পথের উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতে একটা যষ্টি বা লাঠি ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। তিনি সেই যষ্টি উঠাইয়া অগ্রবর্ত্তী ডাকাইতকে পরিষ্কার উড়িয়া ভাষায় বলিলেন, "যে আগু হইবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।" ডাকাইতেরা দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্র ভয়শূন্য। সেই নির্জ্জন বন-পথে বিংশতি জন দস্যু-সম্মুখে দুর্ব্বল, সহায়শূন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্থির, নির্ব্বিকার। নিশাকালে এই ভয়সঙ্কুল বনপথ অতিক্রম করিতে সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই পথে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে দস্যুরূপী অদৃষ্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন, "সাধ্য থাকে, মার।" ভাগ্য পরীক্ষায় তুষ্ট হইল,—দস্যুগণ পলাইল।

এই সময় হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর মসী-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যে যুদ্ধের কথা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় এই মসী-যুদ্ধ চলিয়াছিল, সমগ্র বাঙ্গালা ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের পত্রাবলি পাঠ করিত। শুনিতে পাই, এই সকল পত্রের জন্য ষ্টেটস্‌ম্যানের বিক্রয় এত বাড়িয়াছিল যে, কাগজ খানা কোন কোন দিন দুইবার ছাপিতে হইয়াছে। বিবাদ বাধিবার কারণ অতি সামান্য। সে সময় হেষ্টি সাহেবের হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না; তাই তিনি হিন্দুদিগের গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। উপলক্ষ হইল, শোভাবাজার রাজ-বাটীর শ্রাদ্ধ। আমি সে সকল বৃত্তান্ত পুস্তকশেষে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এই মসী-যুদ্ধ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহেবরা চিনিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী লিখিবার শক্তি ও পাণ্ডিত্য দৃষ্টে রিয়াক সাহেব বিস্মিত হইয়া লোকনাথ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পত্রগুলা সত্যই কি বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা?"

হাবড়া—দ্বিতীয়বার

যাজপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হইয়া আসিলেন। তখন E. V. Westmacott সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। কয়েক দিন যাইতে না যাইতে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ বাধিল। ঘটনাটি এইরূপ;—একটা রেলওয়ে-মোকর্দ্দমা বিচারার্থে বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়। মোকর্দ্দমার ঘটনাটি আমার জানা নাই; অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, মোকর্দ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন, প্রতিদিনই মোকর্দ্দমা-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। সহসা তিনি একদিন শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করিয়া আসামীদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। সাহেবের তাহা সহ্য হইল না,—তিনি মহারুষ্ট হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন অন্য একটি মোকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন। সাহেবকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উঠিলেন না, বা বাক্যালাপ করিলেন না। সাহেব, এজলাসের সম্মান রক্ষার্থ মাথা হইতে টুপি খুলিয়া হাতে লইলেন, এবং প্ল্যাটফর্মের নীচে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Bankim Babu, you have let off the accused in the Railway case !"

বঙ্কিমচন্দ্র সমভাবে চেয়ারে উপবিষ্ট থাকিয়া উত্তর করিলেন, "what of that ?"

সাহেব। You ought to have convicted the accused.

বঙ্কিমচন্দ্র। You are uttering what constitutes contempt of court. I now represent Her Majesty.

সাহেব। You have done wrong, and you ought to he told so.

বঙ্কিমচন্দ্র আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া সাহেবের বিরুদ্ধে Proceedings লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব দেখিলেন, মহা বিপদ! যাহা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই, তাহা একজন নেটিভ ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে উদ্যত! বুদ্ধিমান্ আইনজ্ঞ সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার কাজটা আইনবিগর্হিত হইয়াছে। তিনি অচিরে ক্ষমা প্রার্থনা (apologise) করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সাহেবের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে কোন দিন হয়ত তাঁহাকে চাকরী ছাড়িতে হইবে। তাই তিনি চাকরী করিতে করিতে আইন পরীক্ষা দিয়া ওকালতির পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

ঝগড়ার দুই তিন মাসের মধ্যেই ওয়েষ্টমেকট সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি আরও কিছুদিন হাবড়ায় থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে হয়ত বেশ একটু বেগ পাইতে হইত। সাহেব একটু বেগও দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা হইতে হাবড়ায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। সাহেব আদেশ করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া হাবড়ায় থাকিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

হাবড়ায় দুই বৎসর থাকিতে না থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। বেতন হইল, মাসিক আটশত টাকা। পুস্তকের আয়ও তখন যথেষ্ট। জীবনের কোন সময়ে অর্থের অভাব তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র তিন মাসের ছুটি লইয়া হাবড়া হইতে দ্বিতীয়বার বিদায় লইলেন। কিন্তু কাঁটালপাড়ায় গেলেন না, কলিকাতায় রহিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি কাঁটালপাড়ার বাস তুলিয়া দিয়াছিলেন, তবে রথ ও দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য মধ্যে মধ্যে কাঁটালপাড়ায় গিয়া বাস করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার যশোহর জেলার ঝিনাদহ মহকুমায় বদলি হইলেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না; জ্বরে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ঝিনাদহ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ভদরকে বদলি হইলেন। ভদরক বালেশ্বর জেলার একটি মহকুমা। বঙ্কিমচন্দ্র দুইবার উড়িষ্যা গিয়াছিলেন; প্রথমবার যাজপুরে দ্বিতীয়বার ভদরকে। সেখানে গিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার ছায়া "সীতারামে" কিছু কিছু দেখিতে পাই।

ভদরকে গিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। একমাস মাত্র তথায় ছিলেন। ফিরিয়া হাওড়ায় আসিলেন। কিন্তু সেখানে থাকিলেন না। পূর্ব্ব কথিত ওয়েষ্টমেকট সাহেব তখন তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। পাছে উভয়ের মধ্যে আবার কলহ বাধে এই আশঙ্কা করিয়া বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির পর মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে ছয় মাস মাত্র ছিলেন। চারি মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। অবকাশান্তে চব্বিশ পরগণা আলিপুরে বদলি হইলেন। আলিপুর হইতে তাঁহাকে আর স্থানান্তরে যাইতে হয় নাই।

আলিপুর ও বিদায়

বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বদলি হইয়া আসিলেন। কিছু কাল পরে বেকার সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া তথায় আসিলেন। উভয়ের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাতেই সঙ্ঘর্ষণ; কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গও উঠিয়াছিল। শুধু একদিনের কথা বলিব।

একদা বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে এক মকদ্দমার বিচার চলিতেছিল। মকদ্দমাটি সামান্য—Excise case—আবগারি বিভাগ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তবে দণ্ড অতি সামান্য —কুড়ি পঁচিশ টাকা হইবে। কিছু পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বেকার সাহেব আসিয়া মকদ্দমার কাগজপত্র দেখিলেন দণ্ড অতি লঘু হইয়াছে। তিনি জরিমানার টাকাটা কম হইয়াছে বলিয়া জজমেন্টের উপর মন্তব্য লিখিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "দণ্ড যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আসামী দরিদ্র, এই টাকাটা দিতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।"

সাহেব। অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র। Sir, you were in cradle when I entered service—

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হাততালি দিতে দিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সাহেব অন্তরে অন্তরে রাগিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি

কোনও কালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তুষ্ট ছিলেন না।

আর একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। চব্বিশ পরগণার রেভিনিউ বিভাগের ১০নং বাৎসরিক Statement দিবার সময় সমাগত হইল। রেভিনিউ বিভাগ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। Statement সময়ে প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। অবশেষে তাগিদ আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি স্বধু দেখিতে লাগিলেন, আমলারা Statement প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করিতেছেন কি না। তাঁহারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন। ক্রমে বোর্ড হইতে, গভর্মেণ্টের নিকট হইতে, চারিদিক হইতে তাগিদ আসিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না—তাগিদের উত্তরও দিলেন না। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসন নড়িল। বোধ হয় গভর্মেণ্ট হইতে তাগিদ দিয়া তাঁহার নামে পত্র আসিয়াছিল। একদিন বেকার সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "Statement প্রস্তুত হইয়াছে?"

বঙ্কিমচন্দ্র। না।

সাহেব। কেন হয় নাই?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমলারা যথাসাধ্য করিতেছে; আমি তাহাদের মারিয়া ফেলিতে পারি না।

সাহেব উঠিয়া আমলাদের কাজ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া বোধহয় সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি কাহাকেও কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া কর্তৃপক্ষকে কি লিখিয়া দিলেন।

আলিপুরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এ ক্ষুদ্র লেখক মধ্যে মধ্যে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বিচার-কার্য্য দেখিয়াছে। দুই একবার বড় বড় কৌন্সিলের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়াছি। একবার হাইকোর্ট হইতে একজন সাহেব-ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ সমর্থন করিতে-ছিলেন। অপর পক্ষে মিষ্টার টি, পালিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তারক বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতেন; কিন্তু সাহেব চিনিতেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটা নগণ্য নেটিভ ডিপুটির সম্মুখে অবধানতার সহিত বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি টেবিল চাপ্ড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া নানা ভঙ্গীতে সাক্ষীকে জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ফিরিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের ললাটে মেঘ উঠিয়াছে—সহাস্য নয়ন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—ওষ্ঠ-প্রান্ত কুঞ্চিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, মেঘ গর্জ্জন না করিয়া ছাড়িবে না। একটু অপেক্ষা করিলাম,—অচিরে অশনিপাত হইল। সাহেব, সাক্ষীকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাক্ষী উত্তর দিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিলেন, "The question is irrelevant—I disallow it."

সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "Irrelevant!"

তারক বাবু বলিলেন, "Certainly irrelevant."

বঙ্কিমচন্দ্র, তারক বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "Don't waste your time on him, Mr. Palit."

এই ক্ষুদ্র কথায় সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু আর বাদানুবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া থাকিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতেন—যেরূপ ক্ষুদ্র কথায় গুরুতর উপদেশ দিতেন, সেরূপ আমি অন্য কাহারও মুখে শুনি নাই। তিনি ক্ষুদ্র কার্য্য দেখিয়া মানুষের বিচার করিতেন—ক্ষুদ্র কথার উপর নির্ভর করিয়া কখন কখন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র কার্য্যে মানুষকে যতটা চেনা যায়, বড় বড় কার্য্যে ততটা চেনা যায় না। বৃহৎ অনুষ্ঠানে মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি নিযোজিত করিয়া থাকে—সে তখন প্রস্তুত, সতর্ক।

একবার একটা সামান্য মোকর্দ্দমা তাঁহার আদালতে উঠিয়াছিল। মোকর্দ্দমার বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাদীপক্ষীয় উকিলের জিজ্ঞাসাবাদে জনৈক সাক্ষী বলিতেছিল, "চেক দিতে মুই দেখেছিলাম।" সাক্ষীটা নিরক্ষর ও ইতর জাতীয়। কিন্তু মোকর্দ্দমাটা তাহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। উকিল মহাতেজে হাকিমকে বলিলেন, "হুজুর, লিখিয়া রাখুন, সাক্ষী চেক্ দিতে দেখিয়াছিল।"

হাকিম কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জিনিষ দিতে দেখিয়াছিলে?"

সাক্ষী। হুজুর, চেক্।

হাকিম। কে তোমায় এ কথা শিখাইয়া দিয়াছে?

সাক্ষী। কেহ নয় হুজুর।

হাকিম। চেক্ কা'কে বলে জান?

সাক্ষী উত্তর না করিয়া উকিলের মুখপ্রতি চাহিল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "চ্যাক্ কা'কে বলে জান?

সাক্ষী। তা' জানি হুজুর; খাজনা দিলে জমিদার চ্যাক দেয়।

হাকিম তখন বলিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি নিজে মোকদ্দমার কিছু জান না, অপরের উপদেশ মত সাক্ষ্য দিতেছ; তোমার মুখ দিয়া চেক্ শব্দ বাহির হ'ত না—তুমি চ্যাক্ বলিতে। এখন সত্য করিয়া বল, কে তোমায় শিখাইয়া দিয়াছে, নইলে তোমায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিব।"

সাক্ষী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উকিল বাবুর নাম করিল। উকিল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেন। এইরূপে একটা ক্ষুদ্র কথা, একটা জটিল মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির হেতুভূত হইল।*

* এই মোকর্দ্দমার বিবরণ আড়িয়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমনই দক্ষতার সহিত কাজ করুন না কেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার কোনমতে বনিল না। অবশেষে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্সনের দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। অগ্রাহ্য হইবারই কথা। তাঁহার বয়স তখন তিপ্পান্ন বৎসর মাত্র। পঞ্চান্নর পূর্ব্বে অবসর লইবার যো নাই। তবে পীড়িত হইলে স্বতন্ত্র কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র ছাড়া আর কোনও রোগ ছিল না। দেখিতে তিনি সুস্থকায়, সবল, বলিষ্ঠ। গভর্মেন্ট বঙ্কিমচন্দ্রের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন।

তখন তাঁহার জেদ আরও বাড়িয়া উঠিল। আমি দেখিয়াছি, কোনও ঈপ্সিত কার্য্যে বাধা বা প্রতিবন্ধক পাইলে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন। যতক্ষণ না সে বাধা তাঁহার পদতলে বিমর্দ্দিত হইত, ততক্ষণ তাঁহার জেদ ও শক্তি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাড়িতে থাকিত।

গভর্মেন্ট যখন তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন, তখন তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। রোগের ভান করিলে সহজেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অসত্য পথ অবলম্বন করিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন সত্যাশ্রয়ী ছিলেন; আমি কখনও তাঁহাকে কোনও কথা অতিরঞ্জিত করিতে দেখি নাই—এক বর্ণ মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। যৌবনে কি করিতেন, তাহা আমি জানি না—জানিবার প্রয়োজনও নাই। আমি একবার রমেশ বাবুর* নিকট একটা অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। সে জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যৎপরোনাস্তি ভৎ‍র্সিত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই বয়সেই মিথ্যা কথা শিখিলে, এর পর কি শিখিবে?" সে তীব্র তিরস্কার আজও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা রহিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য পথ অবলম্বন না করিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাঙ্গালার মসনদে তখন ইলিয়ট সাহেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী বঙ্কিমচন্দ্রকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। লেডী ইলিয়ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষের স্থান বিশেষ স্বয়ং অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অভিবাদনান্তে তিনি রাজপ্রতিনিধির নিকট তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন। সকল কথা শুনিয়া লাট সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত বঙ্কিমবাবু?"

"তিপ্পান্ন বৎসর।"

"এই বয়সেই অবসর লইতে ইচ্ছা কর?"

"তেত্রিশ বৎসর চাকরী করিয়া আসিতেছি, আর পারি না।"

"তোমার শরীরে কোনও রোগ আছে?"

"বিশেষ কিছু নাই।"

সাহেব একটু অন্যমনস্ক হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বই লিখিবার

* স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্য কি অবসর খুঁজিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। কতকটা তাই বটে।

ছোটলাট। উত্তম; আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বঙ্কিমবাবু, তুমি তেত্রিশ বৎসর দক্ষতার সহিত চাকরী করিয়া আসিতেছ—গভর্মেন্ট তোমার প্রতি তুষ্ট; তোমার কোন প্রার্থনা নাই কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "না"।

সাহেব। তোমার আত্মীয় স্বজন কাহারও জন্য কোনও অনুগ্রহ (favour) চাহিবার নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। সাহেব, আপনি যদি এতই কৃপাপরবশ, তবে আমার ছোট ভাইকে ডায়মণ্ড-হারবার হইতে আমার নিকটে কোন স্থানে আনিয়া দিন।

সাহেব। এ ত অতি সামান্য কথা; আর কোন প্রার্থনা নাই কি?

বঙ্কিমচন্দ্র। আপাততঃ নাই।

বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। কয়েক দিন পরে পূর্ণবাবু আলিপুরে বদলি হইয়া আসিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের জন্য কখনও রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হয়েন নাই; আত্মীয় স্বজনের জন্য তিনবার ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। একবার জ্যেষ্ঠ জামাতার জন্য; দ্বিতীয়বার, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের জন্য; তৃতীয়বার এ ক্ষুদ্র লেখকের জন্য। অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে তিনি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পেন্‌সনের দরখাস্ত অবশেষে মঞ্জুর হইল। তেত্রিশ বৎসর এক মাস চাক্‌রী করিবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করিলেন। চারি শত টাকা পেন্সন মঞ্জুর হইয়াছিল। দুই বৎসর ছয়মাস তেইশ দিন পেন্‌সন ভোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, গভর্মেন্টের নিকট বার হাজার টাকার কিছু বেশী পাইয়াছিলেন। তখন পুস্তকের বাৎসরিক আয় অন্যূন ছয় হাজার টাকা।

বঙ্কিম-জীবনী

তৃতীয় খণ্ড

শেষ জীবন

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হন নাই। সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও সম্মান প্রকাশ তাঁহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। একদিন কোন একটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমি তাঁহার শিষ্টাচার ও গুণীর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। প্রায় বৎসর গত হইল আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরে একদিন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি একখানি সোফায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। আমি তাঁহার চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্‌যোগী হইলে তিনি শিষ্টাচার বশতঃ তদীয় চরণযুগল বস্ত্রাবৃত করিয়া লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বলিলেন, "পদধূলি পাইবে না।" তখন আমি তাঁহাকে বিনম্রভাবে বলিলাম, "আমি হিন্দুর সন্তান—হিন্দু প্রথানুসারে আপনাকে বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছি—পদধূলি গ্রহণে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

তিনি হাসিমাখা-মুখে বলিলেন, "প্রণাম করিয়াছ, তাহাতেই আমি যথেষ্ট সুখী হইয়াছি—পদধূলি পাইবে না—বিশেষ আত্মীয় ও গুরুজন ভিন্ন যার তার পদধূলি গ্রহণ ভাল নয়।" আমি বলিলাম, "সত্যই কি আপনার পদধূলি গ্রহণে আমার অধিকার নাই?—বিদ্যালয়ে আপনার নিকট শিক্ষা লাভ করি নাই সত্য, কিন্তু গৃহে বসিয়া আপনার পুস্তকরাশি হইতে অপূর্ব্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। আপনার বঙ্গদর্শন যৎকালে প্রকাশিত হয়, তখন আমি ক্ষুদ্র বালক—তখন উহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতাম না, কিন্তু পরে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে কত গভীর তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আপনার 'চন্দ্রশেখর' ও 'প্রতাপ' আমার নিকট দেবতার ন্যায় আরাধ্য। আপনার আনন্দমঠ হইতে গভীর স্বদেশভক্তি ও স্বদেশের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য শিক্ষা পাইয়াছি। অতএব আপনার পদধূলি গ্রহণে

আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তবে যদি আপনি আমাকে গ্রহণের অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কাযে কাযেই আমি নিরস্ত হইব।" এই কথা বলিবামাত্র তিনি আনন্দের সহিত চরণদ্বয়ের বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বলিলেন,—"এই লও। এতক্ষণ পায়ে মোজা আঁটা ছিল, এই মাত্র উহা খুলিয়া ফেলিয়াছি। মোজা আঁটা পরিষ্কার পায়ে এক বিন্দুও ধূলি পাবে না।" আমি আপন মনে আমার বাসনা পরিপূর্ণ করিলাম। তিনি দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে সুকোমল ও সুস্নিগ্ধ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা তোমার মাথায় এক বিন্দুও লাগে নাই, কিন্তু সত্য সত্যই আর কোথা হইতে মস্তকে ধূলা লাগিয়াছে, আমি তাহা ঝাড়িয়া দিতেছি,"—এই বলিয়া তিনি গভীর স্নেহের সহিত আমার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রায় ৫ মিনিট কাল ঐরূপ অবস্থায় আমি তাঁহার আলিঙ্গন মধ্যে আবদ্ধ রহিলাম। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহ আমার স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান রহিবে।

আমরা যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আজ কেবল বিজয়া দশমীর প্রণাম করিতে আসিয়াছ, অথবা আরও কিছু প্রয়োজন আছে ?" আমি বলিলাম, "আমার আর একটি বিনীত প্রার্থনা আছে। আমি স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্য কতিপয় মাননীয় আত্মীয় বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আপনার মুখে আমি অনেকবার উক্ত মহাত্মার প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমি নির্ভয়ে এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" তিনি উৎসাহের সহিত বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল—আমি তাহা অবশ্য করিব।" আমি বলিলাম * *। তিনি হাসিতে হাসিতে (তদুত্তরে) বলিলেন, "আমি আনন্দের সহিত এই ভার লইতে প্রস্তুত আছি—আমি যত্নের সহিত পুস্তকখানি দেখিয়া দিব এবং উহাতে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিব।" এই বলিয়া তিনি আমার যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন ও প্যারীচাঁদের কতই গুণ কীর্ত্তন করিলেন। এই দিন তিনি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অনেক সুলেখক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না—তিনি অকপটে প্যারীচাঁদের গুণবত্তার, বুদ্ধিমত্তার ও স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

তিন বৎসর হইল বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলে একদিন আমি প্রয়োজন উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। সেই সময় দেশীয় সংবাদপত্রে কোনও একটি রাজনৈতিক বিষয়ের ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আমার সহিত উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ করিলেন। প্রতি

কথায় আমি তাঁহার গভীর রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতে লাগিলাম। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ভারতবাসীদের দুঃখ ও অভাবে প্রকৃতরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, এরূপ ইংরেজ এদেশে অল্পই আছেন—যাঁহারা সেরূপ উদার প্রকৃতির লোক তাঁহারা ক্ষণজন্মা।" এই বলিয়া তিনি রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত রেণল্ড্‌স্ সাহেবের কোন কোন গুণের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। * * *

যখন আমি তাঁহার মুখে আমাদের 'কন্‌গ্রেস্' এই কথা শুনিলাম, তখন মনে বড়ই আনন্দ জন্মিল। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি সুযোগ পাইয়া বলিলাম,—"আপনি এক্ষণে রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়াছেন—এখন যদি আপনি কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন তাহা হইলে উহার বিশেষ হিত সাধিত হইতে পারে; আপনি কি উহাতে যোগদান করিবেন না?"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপাততঃ নয়।" আমি আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন দিবেন না?" তিনি বলিলেন, "তুমি একজন কন্‌গ্রেসের চেলা, সুতরাং উহার বিশেষ পক্ষপাতী—আমি কি জন্য এখন উহাতে যোগ দিতে পারি না তাহা বলিলে হয়ত তুমি ব্যথিত হইবে, এজন্য উহা না বলাই ভাল—তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি কন্‌গ্রেসের বিপক্ষ বা উহার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নহি।"

কন্‌গ্রেসে তাঁহার যোগদান না করিবার কারণ জানিবার জন্য আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলে তিনি বলিলেন,—"কন্‌গ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, এ কথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই।" *

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বন্ধুও সঙ্গে ছিলেন। এতদ্‌পূর্ব্বে উভয়ের কেহই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেন নাই। এমন কি তাঁহার বাড়ীও তাঁহারা চিনিতেন না। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটা বাড়ী তাঁহাদের নয়নাকর্ষণ করিল। তাঁহারা ভাবিলেন, সেই বাড়ীটা বঙ্কিমচন্দ্রের হইবে। গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি ভদ্রলোক উঠানে দাঁড়াইয়া একজন ভৃত্যকে সাতিশয় তিরস্কার করিতেছেন। ভদ্রলোকটির ক্রোধ দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া আগন্তুকদ্বয় দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন—অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। ভদ্রলোকটি তখন ভৃত্যকে ছাড়িয়া আগন্তুকদের

* "ভারতী"—১৩০১, আষাঢ়।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কি প্রয়োজন ?"

দীনেশ বাবু। এটা কি বঙ্কিম বাবুর বাড়ী ?

ভদ্র ব্যক্তি। হাঁ।

দীনেশ বাবু। আমরা বঙ্কিমবাবুর দর্শনপ্রার্থী।

ভদ্র ব্যক্তি। প্রয়োজন কিছু আছে ?

দীনেশ বাবু। প্রয়োজন কিছু নাই ; আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতেছি।

ভদ্র ব্যক্তি। কোথা হইতে আসিতেছেন ?

দীনেশ বাবু। কুমিল্লা হইতে।

ভদ্র ব্যক্তি। আচ্ছা, আপনারা উপরে যান ; সেইখানে বঙ্কিম বাবুর সাক্ষাৎ পাইবেন।

উপরে উঠিয়া উভয়ে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। ক্ষণপরে পূর্ব্ব কথিত ভদ্রলোকটি একটা পিরান গায় দিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে বসিলেন। উভয়ে তখন বুঝিলেন, নীচে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনিই বঙ্কিম বাবু। তখন তাঁহারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দীনেশ বাবু যত সাহিত্যের কথা টানিয়া আনেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উল্টাইয়া দিয়া ততই ধান চালের কথা পাড়েন।

দীনেশ বাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এক্ষণে কি লিখিতেছেন ?" বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দেন, "কুমিল্লায় কিরূপ ধান হয় ?" অবশেষে দীনেশ বাবু বুঝিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশ বাবুর মত লোকের সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি তখন আর কোনও কথা না তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একদা সুহৃদ্‌বর শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এতদ্ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রকুমার যে পত্রখানি আমায় লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

একদিন কয়েকটি কলেজের ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া আমি বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে যাই। তিনি তখন মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বদিকে প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে বাস করিতেন। আমরা যখন বঙ্কিম বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সঙ্গী একজন যুবক বলিলেন, 'আপনার নিকটে কিছু উপদেশ লইব বলিয়া আসিয়াছি।'

তাঁহার কথা শুনিয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কর ?'

'আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি।'

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'তুমি এখনও ছাত্রাবস্থায় আছ। তোমাকে অন্য কি উপদেশ দিব ? Do your duty ; তোমার অভিভাবক তোমাকে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধন করাই তোমার প্রধান

কর্ত্তব্য। ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নই তপস্যা, সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য চেষ্টা কর, ইহা ছাড়া তোমাদিগকে অন্য কোন উপদেশ দিবার নাই।'

এই উপদেশ লাভ করিয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ অন্য আলাপের পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। বঙ্কিম বাবু আমার সঙ্গী প্রত্যেকের পরিচয় লইয়াছিলেন।'

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়,

চন্দননগর।

একবার একটী দেশ-প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার একখানি পুস্তকের দোকান ছিল। তাঁহার পুত্রের নামেই দোকান চলিত। পুত্রের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া তাঁহাকে জগৎ কুমার সরকার বলিয়া অভিহিত করিব। কেন না, এই পুত্র আজও জীবিত * এবং তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুস্তকবিক্রেতা। জগৎবাবুর অভিলাষ, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি হাফ-টোন ছবি প্রকাশ করেন। হাফ-টোন ছবির ব্লক সে সময় এদেশে কেহ করিতে পারিত না—বিলাত হইতে করিয়া আনিতে হইত। ব্যয়ও যথেষ্ট। জগৎ বাবু সে ব্যয় বহন করিতে সানন্দে সম্মত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পিতাকে পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ছবি ছাপাইতে সম্মত হইলেন না। কেন হইলেন না, তাহা ঠিক আমার স্মরণ নাই। অবশেষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যখন বিরস বদনে বিদায় হইতেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব, যদি ভাল বিবেচনা করি, তখন আপনার পুত্র জগৎকে সংবাদ দিব।" বৃদ্ধ বিদায় হইলেন।

কয়েকদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র, জগৎ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তাঁহাকে চিনিতেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" জগৎ বাবু উত্তর করিলেন, "আমার নাম জে, কে, সরকার।" বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রয়োজন ?

জগৎ বাবু। আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র। আমি কোন জে, কে, সরকারকে চিনি না সুতরাং ডাকিয়া পাঠাইবার সম্ভাবনাও নাই।

জগৎ বাবু যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন, "আমার পিতার নাম—,আমার নাম জগৎ কুমার—"

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎহাস্য সহকারে বলিলেন, "তাই বল, তোমার নাম জগৎকুমার—আমি জে, কে, সরকারকে কেমন করিয়া চিনিব ?"

একবার একটী বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী সাহেব,বঙ্কিমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া

* এক্ষণে আর জীবিত নাই। তাঁহার নাম শরৎকুমার লাহিড়ী।

খামের উপর মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "এ বাড়ীতে মিষ্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া কোনও ব্যক্তি নাই, আপনি বোধ হয় সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।"

একবার পাইকপাড়ার রাজা স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ললিত বাবুর * আলাপ ছিল। তিনি ললিত বাবুকে ধরেন। ললিত বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে সে কথা জানাইলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, "উহার সহিত আমার আলাপ অসম্ভব।"

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন রবি বাবুর বয়স কুড়ি, একুশ বৎসর। অল্প বয়স হইলেও তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই বয়সেই যশঃ কিনিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসরের আগেকার স্মৃতি মনে করিয়া আজ তিনি লিখিয়াছেন,—"এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় 'নবজীবন' মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন—আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি।

বঙ্কিম বাবু তখন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচার বাহির হইতেছে।

* * * *

"এই সময়ে কিম্বা ইহারই কিছু পূর্ব্ব হইতে আমি বঙ্কিম বাবুর কাছে আবার একবার সাহস করিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তিনি ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। বঙ্কিম বাবুর কাছে যাইতাম বটে, কিন্তু বেশী কিছু কথাবার্ত্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সঙ্কোচে কথা সরিত না। এক একদিন দেখিতাম, সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুসী হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া, এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে ; তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই সময় কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিম বাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে

* রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর—বাঁশবেড়িয়ার জমিদার।

দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

"কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রচার পত্রে তিনি যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

* * * * * *

"সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের * সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক, এ বিরোধের অবসানে বঙ্কিম বাবু আমাকে যে একখান পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিম বাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"**

অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারেন নাই—অকালে অপসৃত হইয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি একখানিও নূতন পুস্তক লেখেন নাই। কেবল "ঢেঁকি" নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজন করিয়াছিলেন। আনন্দমঠ, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণকান্তের উইলের এক একটা নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। রাজসিংহ ও ইন্দিরা বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঞ্জীবনীসুধা লিখিয়াছিলেন। কবিতা-পুস্তকের নাম গদ্য-পদ্য দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম —Bengali Selections approved by the syndicate of Calcutta University for the Entrance examination, 1895 বিবিধ প্রবন্ধের একটা নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্যসেবার্থ আর কিছু করেন নাই।

কিছু করেন নাই বলিলে ঠিক চলিবে না। তিনি একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—কয়েকটি পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে না হইতে কাল তাঁহাকে কাড়িয়া লইয়া গেল। তাহার কয়েক বৎসর পরে উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার নাম, Society for the higher training of young men.—এক্ষণে ইহার নাম University Institute হইয়াছে। এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চারিটি তাঁহার গৃহে, দুইটি ইন্‌ষ্টিটিউট মন্দিরে। গৃহে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন,

* স্থানান্তরে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

** প্রবাসী—১৩১৯, আষাঢ়।

তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধে ; মন্দিরে যে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা উপনিষদ সম্বন্ধীয়। যাঁহারা এই বক্তৃতানিচয় শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এক্ষণে জীবিত। কিন্তু শেষের দুইটি ছাড়া অন্য বক্তৃতাগুলি বিলুপ্ত হইযাছে—এক্ষণে তাহা কোথাও পাওয়া যায় না। শেষোক্ত বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের University Magazineএ প্রকাশিত হইযাছিল। ভাবার্থ স্থানান্তরে সন্নিবিষ্ট হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার (senate) সভ্য নিযুক্ত হইযাছিলেন, এবং তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন। কিন্তু সভায় বড বেশী যাইতেন না। যখন যাইতেন, তখন তিনি কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। খোসামদ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। জীবনভোর কখনও মানুষের খোসামদ করেন নাই। মধ্য বয়সে ভগবানের কিছু কিছু করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে ভগবৎ-চরণে প্রাণ লুটাইয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য মাছ মাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকিতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মাছমাংস খাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার শরীরে হবিষ্যান্ন সহ্য হইল না। তিনি পীডিত হইয়া পড়িলেন। তবু তিনি কিছুকাল যুঝিয়াছিলেন ; কিন্তু আর পারিলেন না, চিকিৎসকদের উপদেশানুসারে আমিষ আহার আবার ধরিতে হইয়াছিল।

আমার মনে হয়, পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিযা মানুষ একবার পিছন ফিরিয়া দেখে—মৃত্যুকে অনতিদূরে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ মানব বাল্যকাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনটা একবার বিশ্লেষ করিয়া দেখে। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয তাহাই করিষাছিলেন। তিনি একদা শ্রীশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। ** আমার জীবনের কতক বড শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতি গতি অতি আশ্চর্য্য রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কেমন করিযা তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে।" * *

সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসীর কথা বলিবার আগে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহা বলা কর্ত্তব্য। শ্রীশ বাবু লিখিতেছেন,—"কথায় কথায় আমি তাঁহার নবেল সমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। (বঙ্কিম বাবু) হাসিয়া বলিলেন,

"সব নবেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না।" আমি বলিলাম, "আপনার পিতার সম্বন্ধে সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীব বাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে তার দরুণ শৈশবাবধি মনে একটা impression আছে।"

বঙ্কিম বাবু। সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য কিছু হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি।

আমি। বইয়ের অনুরূপ কোন সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ কখন দেখেছেন কি ?

বঙ্কিম বাবু একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না'।

তারপর সিনেট * সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, 'সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। কিন্তু Theosophy এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে আমি তা লিখেছি'। **

বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি গাড়ী ও দুইটি ঘোড়া ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দৌহিত্রদের লইয়া শকটারোহণে বেড়াইতে যাইতেন। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসে একদিন অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইবার জন্য সকালে সাজসজ্জা করিতেছেন, এমন সময় সদর দরজার সম্মুখে রাস্তার উপর একটা গোলমাল উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাণে সে গোলমাল পৌঁছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারবানের কোনও ক্রটী ছিল না, পাঁড়েজী দ্বারপথ আগুলিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল। সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহে, পাঁড়ে তাহাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না। সন্ন্যাসী যত বলে, "আমি ভিক্ষা চাহি না, বাবুর সঙ্গে শুধু সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"—পাঁড়ে তত জোর করিয়া বলে, "বাবুর সঙ্গে এখন কোনমতে 'মোলাকাৎ' হবে না। ফজিরমে আইয়ে—বাবু আভি ঘুম্‌নে যাতে হ্যায়।" সন্ন্যাসী যখন দেখিলেন, পাঁড়েজী কিছুতেই দ্বার ছাড়িবে না, তখন তিনি নিরস্ত হইয়া পথের একধারে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেদের লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ী বড় রাস্তায় (কলেজ ষ্ট্রীট) অপেক্ষা করিতেছিল ; গলিটুকু হাঁটিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র গলির উপর আসিয়া দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী তীক্ষ্ননয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি দৃষ্টির বিনিময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী তখন উঠিলেন ; এবং কয়েক হস্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খাড়া হো।"

বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুম্‌হারা নাম বঙ্কিমচন্দর ?"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুম্‌হারা ওয়াস্তে ম্যাঁয় নেপালসে আতা হুঁ—সউটকে আও।"

* ইনি Esoteric Budhism নামক পুস্তক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

** সাধনা—১৩০১

বঙ্কিমচন্দ্র—মহাতেজস্বী বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় ফিরিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া নাকি সন্ন্যাসী, বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "আমার গুরু নেপালে থাকেন, তিনি তোমার কাছে আমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মে এক গুরুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র যোগসাধনা করিয়াছিলাম। তোমার কর্ম্মফল তোমার সংসারে টানিয়া আনিল, আমি যোগী হইয়া আবার পূর্ব্বজন্মের গুরুকে পাইলাম।"

সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নয়। বেশী না হইলেও তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে অনেক বিভিন্ন। জটা বা বিভূতির ঘটা ছিল না, হাতে সিঁধকাটীর মত চিম্‌টাও ছিল না। প্রফুল্লানন, তেজোদীপ্ত যোগীর কোন আড়ম্বর ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আপনাকে পাঠাইয়াছেন কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সে কথা আর একদিন বলিব। আজ এই রুদ্রাক্ষটি গ্রহণ কর। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন রুদ্রাক্ষকে প্রত্যহ পূজা করিবে। কেমন করিয়া পূজা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।"

সন্ন্যাসী আরও কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া, কপর্দ্দকমাত্র ভিক্ষা না লইয়া যোগিবর প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সে রুদ্রাক্ষের পূজা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কখনও দেখে নাই।

তিন মাস পরে সন্ন্যাসী আবার আসিয়াছিলেন। নিদারুণ শীতের সময় একদিন মাঘ মাসের মধ্যাহ্নে আসিয়া দর্শন দিলেন। সে বার কেহ তাঁহার গতিরোধ করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি উপরের বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন।

তথায় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য দুই চারিটা কথার পর সন্ন্যাসী বলিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্‌র, এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, তা' কি বিস্মৃত হয়েছ?"

"না, বিস্মৃত হই নাই।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বালক অনিচ্ছাসত্ত্বে কক্ষত্যাগ করিল। তখন তিনি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বসিলেন। কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিন ঘণ্টা (কাহারও মতে ৫।৬ ঘণ্টা) পরে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বার খুলিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিদ্যুৎভরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর। খুড়ী মা চমকিত হইলেন; সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কি হইতেছিল?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "মরণ-পাঠ শিখিতেছিলাম।"

খুড়ীমা কথাটার অর্থ বুঝিলেন না; শুধু বুঝিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অনিচ্ছুক। বুদ্ধিমতী খুড়ীমা সে কথা আর কখনও তুলেন নাই।

আমি এ সন্ন্যাসীকে দেখি নাই। সে সময় আমি দূরদেশে কর্ম্মস্থলে ছিলাম। পরে খুড়ীমা ও অন্যান্য লোকের মুখে উপাখ্যানটি শুনিয়াছিলাম। রমণ-পাষ্টির অর্থ আজও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। সে সন্ন্যাসীর দর্শনও আমরা আর কখনও পাই নাই।

দেহ ত্যাগ

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাহা বাড়িতে পায় নাই—বড় একটা চিকিৎসাও করাইতে হয় নাই। ১৩০০ সালের শীতকালে সহসা রোগ বাড়িয়া উঠিল। খুড়ীমা সভয়ে দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রাত্রিতে নিদ্রা নাই—মুহুর্মুহুঃ উঠিয়া তিনি জল খাইতেছেন ও প্রস্রাব করিতেছেন। তখন তাঁহার চিকিৎসার প্রস্তাব উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "চিকিৎসা করাইতে চাও, কর—আমি তোমাদের মনে কোন আক্ষেপ রাখিতে দিব না।"

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক্, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। অবশেষে চৈত্র মাসের প্রথমে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল।

বহুমূত্র রোগ বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কবি বা ঔপন্যাসিক, উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী বা চিন্তাশীল ব্যক্তি, এ নিদারুণ রোগের হস্ত হইতে বড় একটা কেহ রক্ষা পান নাই। দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র সকলেই শেষ জীবনে বহুমূত্র হইতে সাতিশয় কষ্ট পাইয়াছেন। য়ুরোপে কিন্তু এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখি না। সেখানে প্রথিতনামা লেখকেরা বাত হইতেই বেশী কষ্ট পাইয়াছেন। মিল্টন, গিবন, ষ্টীল, লীটন; সিডনি স্মিথ, ফিল্ডিং, ড্রাইডেন, ডিফো প্রভৃতি যশস্বী লেখকেরা বাত রোগকে (Gout) চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ রোগ তাঁহাদের জীবনঘাতী হয় নাই, বহুমূত্র যে আমাদের জীবনঘাতী—বাঙ্গালার সর্ব্বনাশকারী।

বহুমূত্র রোগ সচরাচর স্ফোটক বা ব্রণ উৎপন্ন না করিয়া ছাড়ে না। এই ব্রণ অধিকাংশ সময়ে সাংঘাতিক হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাই ঘটিল। মূত্রনালীতে ব্রণ বা স্ফোটক দেখা দিল। কেহ বলেন—একটি, কেহ বলেন—দুইটি ব্রণ হইয়াছিল। যাই হউক, স্ফোটকটী বড় সামান্য নয়,—কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই চিকিৎসার্থ আহূত হইয়াছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদ ও'ব্রায়েন সাহেব আসিয়া বলিলেন, "স্ফোটকটী কাল বিলম্ব না করিয়া অস্ত্র করিতে হইবে।" অন্যান্য চিকিৎসকেরা সাহেবের সহিত একমতাবলম্বী হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অস্ত্রাঘাত হইলে বিষাক্ত পুঁজ রক্তের সহিত

সংমিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে—মিশিয়া গেলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়িবে, তখন মৃত্যু অনিবার্য্য।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, “এ যাত্রা কিছুতেই আমার নিস্তার নাই; অস্ত্রাঘাত কর বা না কর, কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই। তবে কেন মিছা অস্ত্রাঘাত করিয়া আমার যাতনা বাড়াও।”

ও'ব্রায়েন সাহেব নিরস্ত হইলেন। পরদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু তিনি কোন ঔষধ দিলেন না,—এলোপ্যাথী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দুই এক দিনের মধ্যে স্ফোটক আপনা হইতে ফাটিয়া গেল। ও'ব্রায়েন সাহেব পরদিন আসিয়া বলিলেন, “এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন—আর কোন ভয় নাই।”

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত বলিলেন, “ভয় সম্পূর্ণ আছে—এ যাত্রা কিছুতেই আমার রক্ষা নাই।”

জানি না, কেন বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সন্ন্যাসীর নিকট কিছু শুনিয়া থাকিবেন। লোকেও তাই বলে। এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলি।

দুই তিন দিন পরে পুরাতন ক্ষতের পার্শ্বে আর একটি নূতন স্ফোটক দেখা দিল। সেবারেও অস্ত্রাঘাত করা হইল না। কিন্তু ফল তেমন সন্তোষজনক হইল না। তিনি বুঝিলেন—মৃত্যু সন্নিকট। পূর্ব্ব হইতে—কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে—তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, শেষ দিনের বেশী বিলম্ব নাই। তিনি সে কথা কাহাকেও বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদের সে কথা বলিয়া দিয়াছিল।

যখন ২৬এ চৈত্র নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন দূরস্থিত আত্মীয় স্বজনের নিকট তারে সংবাদ প্রেরিত হইল। কেহ সময়ে আসিতে পারিল, কেহ পারিল না। ২৫এ চৈত্র তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া মহামহিমময় লোকে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার কক্ষে এই কয়েক জন উপস্থিত ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। অনেকেই ছুটিয়া আসিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার বড়াল তখন সুরেশ বাবুর বাড়ীতে তাস খেলিতেছিলেন। তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সুরেশ বাবুর ছাপাখানা ছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ একটা স্লিপ ছাপাইয়া, সহরময় বিলি করিবার জন্য চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। সুরেশ বাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি অনেকেই শকটারোহণে নগ্নপদে

বঙ্কিম-মন্দিরে আসিয়া সমুপস্থিত। সে মন্দির তখন ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত। বন্ধু বান্ধব ও ভক্তবৃন্দ যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা সাড়ে চারিটা। লোক ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল; অবশেষে বাড়ীতে, গলিতে লোক আর ধরে না।

কিন্তু দেহ লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যাহাকে খাট আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আর ফিরে না। তাহার সন্ধানে যাহারা গেল, তাহারাও নিরুদ্দেশ হইল। অবশেষে বেলা ৬টার সময় পাঁড়ে এক বৃহৎ খাট আনিয়া উপস্থিত করিল। খাটের উপর উত্তম শয্যা বিস্তৃত হইল। শয্যোপরি পুষ্পরাশি বিকীর্ণ হইল। তার পর—তার পর যে পঞ্চভৌতিক দেহে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য বাস করিয়াছিলেন—যে মৃন্ময় ঘট মধ্যে দেবতা এতদিন অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে ক্ষণভঙ্গুর আধার ত্রিতল হইতে আনীত হইয়া খট্টাঙ্গোপরি রক্ষিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কোনও কষ্ট-চিহ্ন নাই—কোনও বিকার নাই। অপূর্ব্ব শান্তি, চিরপ্রফুল্লতা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল। সে প্রফুল্লতা যেন এ সংসারের নয়,—তিনি যেন জ্ঞানদৃষ্টিতে কোনও অজ্ঞাত রাজ্যের সুখময় ছবি দেখিতে দেখিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয় নাই; মনে হইয়াছিল; যেন তিনি নিদ্রিত—যেন তিনি সুপ্তাবস্থায় সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

গগনভেদী হাহাকারের মধ্যে 'অনিন্দ্যজ্যোতি স্বর্ণতরু'কে গৃহের বাহিরে আনা হইল। পরে কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পুরমহিলাদের অনুরোধে ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্মুখে খাট নামান হয়। ব্রাহ্মমহিলারা গবাক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ দর্শন করেন। সুরেশ বাবু, যতীশ বাবু, জামাতা রাখালচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই খাট ধরিয়াছিলেন। খাট হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তত জনস্রোত বাড়িতে লাগিল। সুরেশ বাবুর স্লিপ পড়িয়া অনেকেই তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে ছুটিয়া আসিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে যিনি শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ লইয়া যাওয়া হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে কোনও একটা দোকানে জুতা খুলিয়া শবদেহের অনুগমন করিতে লাগিলেন। গৃহচূড়া হইতে যিনি এ সংবাদ পাইলেন, তিনি ঝটিতি জুতা খুলিয়া জনস্রোতে সম্মিলিত হইলেন। যাঁহার পদতল কখনও ধূলিসংশ্লিষ্ট হয় নাই, তিনি গাড়ী ছাড়িয়া নগ্নপদে শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন শববাহকেরা হেদুয়ার মোড় ভাঙ্গিয়া বিডন ষ্ট্রীটে পড়িলেন, তখন জনসঙ্ঘ বিপুল আকার ধারণ করিল। থিয়েটারের সম্মুখে খাট আবার নামান হইল। সে দিন সন্ধ্যাকালে অভিনয়। অনেক লোক অভিনয়দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার ছাড়িয়া শবদেহের অনুগমন করিলেন। যখন সকলে নিমতলা ঘাটে পৌঁছিলেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া সেই বিপুল জনতার কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। কেহ বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার শেষ

দেখা দেখিয়া লইলেন, কেহ প্রণাম করিলেন, কেহ বা পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন। সে দৃশ্য মর্ম্মস্পর্শী।

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী মৃত সাহিত্যিককে এমন করিয়া আর সম্মান দেখায় নাই। এই তাহার প্রথম আত্মসম্মান-বোধ, এই তাহার প্রথম জাতীয় ভাবের উন্মেষ। বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দেখাইয়া বাঙ্গালী আপনাকে সম্মানিত করিল। পশ্চিম-জগতে ফরাসীরা একদিন ভিক্টর হুগোকে সম্মান দেখাইয়া জগতকে শিখাইয়াছিল, কবিকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়; আরও শিখাইয়াছিল, যে জাতি জগতে সম্মান দেখাইতে জানে, সে জাতি জগতে সম্মানিত হয়। শুনিযাছি, * যে পথ দিয়া হুগোর মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়, সে পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গাড়ী গাড়ী ফুল আনিয়া পথের উপর ঢালা হইল—কয়েক গাড়ী ফুলের মালা আনিয়া মৃত দেহের চারি দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। গভর্মেণ্ট বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সমাধির ব্যয়স্বরূপ মঞ্জুর করিলেন। সমাধি দেখিতে—মৃতকে সম্মান দেখাইতে—ফরাসীগণ সুদূর পল্লী হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সভাসমিতি হইতে অসংখ্য প্রতিনিধি আসিতে লাগিল। ধনী, দরিদ্র, বৃদ্ধ, রমণী শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া পথের দুই ধারে দাঁড়াইতে লাগিল। মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, কবি, মূর্খ, সকলে আসিলেন। পথে যখন আর লোক ধরে না, তখন তাহারা গবাক্ষে, গৃহচুড়ে উঠিল। সেখানেও যখন আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন তাহারা গাছে উঠিল। যখন বৃক্ষচুড়েও আর স্থান হইল না, তখন লোকে নদীর উপর নৌকায় উঠিল। নদীবক্ষ নৌকায় সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু তাহাতেও সকলের স্থান সঙ্কুলান হইল না।

এরূপ সম্মান ফরাসীরাই দেখাইতে পারে, ইংরাজেরা পারে না। ইংরাজের সেক্ষপিয়রকে জেলে যাইতে হইয়াছিল—জন্‌সন্‌কে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া চেস্‌টারফিল্ডের দ্বারে আট বৎসর হাঁটাহাটি করিতে হইয়াছিল। ফরাসীরা আর একদিন একজন কবিকে সম্মান দেখাইয়াছিল। কবির নাম—মলিয়ের। অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি অনেকগুলি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সেক্ষপীয়রের নাটক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নয়। সেই সকল নাটক থিয়েটারে অভিনীত হইত। মলিয়ের পুস্তক লিখিয়া যশঃ ও অর্থ উভয়ই যথেষ্ট অর্জন করিয়াছিলেন। মলিয়েরকে প্রসিদ্ধ **French Academy**র সভ্য করিয়া লইবার জন্য একবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই সভার একশত জন সভ্য; একশতের কম বা বেশী হইবার নিয়ম ছিল না। যাঁহারা সমগ্র ফরাসী দেশ মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বলিলেন, "যে ব্যক্তি থিয়েটারে বই লিখিয়া খায়, সে আমাদের একাডেমীর সভ্য হইবার যোগ্য নয়।" এ কথাটি মলিয়েরের কাণে উঠিল; তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর ফরাসীরা বুঝিল, মলিয়ের কত বড় লোক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে যখন

* **Smith's life of Victor Hugo.**

ফরাসীদের মধ্যে কেহ রহিল না, তখন তাহারা ব্যগ্র হইয়া মলিয়েরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যে সভা সভ্যরূপে মলিয়েরকে গ্রহণ করেন নাই, সেই সভা মলিয়েরের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইযা সভা-গৃহে স্থাপন করিলেন; এবং সুবৃহৎ প্রস্তরগাত্রে তাঁহাদের অনুতাপ-কাহিনী ক্ষোদিত করিলেন। তা' ছাড়া সভা আর একটা কাজ করিলেন। সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া ৯৯ জন করিলেন; এবং মৃত মলিয়েরের প্রতিমূর্ত্তি লইয়া একশত সদস্য-সংখ্যার পূরণ করিলেন। আজও সেই সভায় ৯৯ জনের অধিক সভ্য লওয়া হয় না। মলিয়েরের প্রস্তরমূর্ত্তি লইয়া একশত জন ধরা হয়।

এরূপ সম্মান দেখাইতে বাঙ্গালী আজও শিখে নাই, কিন্তু শিখিতেছে। বাঙ্গালী ফুল আনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের চিতায় ঢালিল—বাঙ্গালী নগ্নপদে, শোকবিমর্ষ মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে কলিকাতার চারি প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিল—বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের চিতাভস্ম ভক্তিপ্লুতচিত্তে মাথায় ধরিল। বাঙ্গালী কাঁদিল—প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে বসিয়া অনেক কাঁদিল।

কাঁদিল, বঙ্কিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুর জন্য। যদি তিনি টলষ্টয় অথবা টেনিসনের পরমায়ু ভোগ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য-সৌধকে আরও বিশোভিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালীর হৃদযে এতটা আঘাত লাগিত না। কিন্তু জ্বালাময়ী প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালায় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ত বেশী দিন এ জগতে থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্ত ৪৬ বৎসর, কেশবচন্দ্র ৪৬ বৎসর, হরিশচন্দ্র ৩৯ বৎসর, কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর, মধুসূদন দত্ত ৫০ বৎসর, দীনবন্ধু মিত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়স য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যাহ্নকাল, সে বয়স বঙ্গকবিগণের সন্ধ্যা। বাঙ্গালী তা'র ক্ষুদ্র জীবনে কয়খানা পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারে? একজন সামান্যা ইংরাজ-মহিলা (Mrs. Sherwood) যাহা লিখিয়াছেন* কোনও বাঙ্গালী তাহার অর্দ্ধেকও লিখিতে পারেন নাই—লিখিবার অবসরও পান নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দকে আমরা যেমন হাসিতে হাসিতে আহ্বান করিয়াছিলাম, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দকে আমরা তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় দিয়াছিলাম। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমরা কেশবচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কৃষ্ণদাস ও বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমরা ভূদেবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইলাম।

তবে যাও বঙ্কিম, দিবাবসানে, বর্ষ-অবসানে, শতাব্দী-অবসানে—ভারতজননীর চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া—ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় লোকে যাও। 'শুভ্র জ্যোৎস্না' তোমার মাথার উপর চন্দ্রাতপ ধরিবে—'মলয়জশীতল' সমীর তোমায় বীজন করিতে থাকিবে—'ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল' তোমার মস্তকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ ফুল্লকুসুমদাম বর্ষণ করিবে। ওই দেখ যাঁহার চরণে তুমি 'বিদ্যা, ধর্ম্ম,

---

* ৭৭ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

হৃদি, মৰ্ম্ম' উৎসর্গ করিযাছ তিনি অশ্রুভারাকুল-লোচনে বিজযমাল্যহস্তে তোমায় বিদায় দিতে আসিযাছেন। পার্শ্বে সলিলবিপুলা জ্ঞান-প্রবাহিণী জাহ্নবী, তোমার চিতাভস্ম সযত্নে বক্ষে ধরিযা অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয করিতে ছুটিযাছেন। ওই দেখ, স্বর্গ হইতে তোমার মানসপুত্রকন্যাগণ পুষ্পচন্দন-হস্তে তোমার চরণপূজা করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ওই শুন প্রফুল্ল আসিযা বলিতেছে, "বাবা, আমি তোমার নিকট নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিযা এক্ষণে অক্ষয স্বর্গের অধিকারিণী হইযাছি, এক্ষণে তোমাকে সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময লোকে লইযা যাইবার জন্য সর্ব্বনিযন্তা কর্তৃক আদিষ্ট হইযাছি। এস বাবা, তোমার সৃষ্টরাজ্যে, এস বাবা তোমার সৃষ্টলোকে, যেখানে বাক্যই অবতার—যেখানে যুগে যুগে, মাসে মাসে, পলে পলে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ মহাবাক্য জন্মগ্রহণ করিতেছে, সেই মহৈশ্বর্য্যময লোকে এস।" ওই শুন, বীরকুলশেখর প্রতাপ বলিতেছে, "পিতা, আমি তোমার নিকট চিত্তসংযম শিখিযা যে সুখময রাজ্যের অধিকারী হইযাছি, সে রাজ্যে লক্ষ শৈবলিনী নিযত আমার পদসেবা করিতেছে—কোটী রূপসী আমার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। এস পিতা তোমার সৃষ্ট রাজ্যে—যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য—যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময লোকে এস।"

যাও—কিন্তু আবার আসিও। বাঙ্গালী যখন 'সপ্তকোটীকণ্ঠে কলকল নিনাদে' তোমায় ডাকিবে, তখন আবার আসিও—বাঙ্গলায আবার অবতীর্ণ হইও।

শোকোচ্ছ্বাস

বঙ্কিমচন্দ্রের বিযোগে বঙ্গভূমি কাঁদিযা আকুল হইল। বিদ্যাসাগরের চিতা নিবিতে না নিবিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পাশে আসিযা শুইলেন। বাঙ্গালা কাঁদিয়া আকুল হইল। চারিদিকে শোক-সভা আহূত হইল। টাউনহলেও এক বিরাট শোক-সভা আহূত হইয়াছিল। আসামের ভূতপূর্ব্ব চিফ্-কমিশনর কটন সাহেব সেই সভায় যোগদান করিয়া বলিযাছিলেন, "বাঙ্গালার সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।" সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রেও শোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। কয়েকজন খ্যাতনামা লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয লিখিয়াছিলেন :—

* * * *

"কোথা আজ তুমি কোথা সে তোমার
জ্ঞান পারিষদ যত

গেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি
পূরণ না হতে ব্রত ?
কে পারিবে তব রাজদণ্ড নিতে
তিলক ধরিতে ভালে ?
তোমার মতন সাধক রতন
পা'ব আর কত কালে ?
বিহনে তোমার করে হাহাকার
বঙ্গ • বনারী আজ,
হে বঙ্গভূষণ প্রিয় অতুলন
বঙ্গের সাহিত্য-রাজ !

ধন্য ক্ষণজন্মা জনমিলে ভাই
আজন্ম দুঃখিনী কোলে,
ভুলালে বঙ্গের নরনারীগণে
অমিয়া মধুর বোলে ,—
গেলে কীর্ত্তি রাখি চিরদিন তরে
এ ভারত মহীতলে।
দিয়ে জীবদান বাঙ্গালীর দেহে
জ্বালাইলে শিখা তায়,
জাগ্রত করিয়া বঙ্গনারীনরে
ভাতিলে নব বিভায়।
আপনি গঠিলে আপনার দল
সোদর সদৃশ প্রেমে,
শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে
কত রবি চন্দ্র হেমে।

হে মলয়ানিল সহসা থামিল
ফুরাল বঙ্কিম আয়ু ;
সমূহ বাঙ্গালা কাঁদিবে আকুল
যেন হারা প্রাণ-বায়ু !
কেন কাঁদ বঙ্গ এ প্রাণীর তরে
এঁর যে মরণ নাই ;
ধরার বিজলি এ জীব-মণ্ডলী
এ নহে এঁদের ঠাঁই।

যে দেবমণ্ডলে মহাপ্রাণী দলে
জ্বলে চির জ্যোতির্ম্ময়,
হের কি শোভায় সেই দেবধামে
বঙ্কিম উদয় রয়।
পেয়ে যাঁর সঙ্গ পবিত্র এ বঙ্গ
গাও তাঁর চির জয়।" *

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"যে সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে, সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, তথাপি, জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন, তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

"কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগ-দুঃখে শোকাতুর।

"অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল না। * * *

"রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরাজিতে। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহু পূর্ব্বের কথা।

"তারপর বিদ্যাসাগর। বঙ্গভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিধবার দুঃখ-মোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন—আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুই চারি বার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

"আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপ-সূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারংবার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

"উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা

* নব্যভারত—১৩০১।

কোন মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিয়া লইতে পারি। * * *

"সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মিসরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই মৃত মরুভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে, সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।"

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখিয়াছিলেন ;—

১

"সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায় দুই পায় বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম মমতায় মেখে বন উপবন !
তার সে বিদায় ভোজ, মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি মধুকরগণ !
তরুণ তমাল গাছে, কি জানি কি লিখা আছে,
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন !
উড়ায়ে রুমাল ছাতা, নূতন পল্লব পাতা,
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন !
বসন্ত বিদায়—কাজ, সভাপতি দ্বিজরাজ,
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ !
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন !

২

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায়, হায়, হায় !
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায় !
লইয়ে নবীন, হেম,—অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম—
চন্দ্রনাথ, প্রিয়বন্ধু দীনবন্ধু রায়,
ধরে সবে হাতে হাতে, লইয়া আসিলে সাথে,
পারিজাত বন থেকে শ্যামা পাপীয়ায় !
ছিন্ন আশা, ছিন্ন ভাষা, সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয় হাওয়ায় !
এখনো পূরেনি তার, সময়ের অধিকার,—

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায়, হায়, হায় !
বঙ্কিম—বসন্ত কবি আগে তার যায় ।

৩

বাঙ্গালার মহাকবি—ভারত-ভূষণ,
সাজাইলে কত সাজে কাব্য-উপবন ।
কমল 'কমলমণি' পবিত্র প্রেমের খনি,
'কানা কড়ি' দিয়ে সে যে কিনে রাখে মন ।
'সতু'রে সারথি করি, আরক্ত কপোলে মরি,
আপনি সমরে ধরে ফুল শরাসন !
সূর্য্যমুখী 'সূর্য্যমুখী', স্বামীর সুখেই সুখী,
স্নেহে প্রেমে মমতায় কোথায় এমন ?
কোমল 'কুন্দের' মালা, প্রীতির নৈবেদ্য বালা,
কি সুন্দর করিয়াছে আত্ম-নিবেদন !
'বিষ' নহে 'সুধা' বৃক্ষ, পরশিছে অন্তরীক্ষ,
তারকা 'হীরা'র ফুলে তীখণ কিরণ,
জগতের একধারে, সুদূর সাগর পারে,
আলো করিয়াছে সে যে বৃহৎ বুটন !
কত ফুলে সাজাইলে বঙ্গ উপবন !
পূজনীয় প্রিয় কবি, ফুটাইলে যে মাধবী—
বিমল 'বিমলা' রূপে গড় মন্দারণ ।
হৃদয়ে লুকায়ে শূল, হাসে কাঁদে চাঁপাফুল,
আকুল 'আয়েসা' চির আনত-আনন !
'রজনী' রজনীগন্ধা আলো করে দিবাসন্ধ্যা,
প্রেম-পূর্ণিমায় তার বেলফুলবন ।
ফুল দিয়ে সিঁদ কাটে রমণী কেমন ।

৪

বঙ্গের বসন্ত-কবি—ভারত-ভূষণ,
কত ফুল সাজাইলে ভাষা ফুলবন !
'রোহিণী'র সমতুল, বিধবা বকুল ফুল,
কোন্ দেশে ফোটে হেন মধুমাখা মন ?
কি শোভা পুকুর পারে, 'গোবিন্দ' তুলিলা তারে,
ইন্দিরা লভিলা যেন নিজে নারায়ণ !
অভিমানে উচ্ছ্বসিতা, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,

কি সুন্দর 'ভ্রমরে'র মধুর মরণ !
না উঠিতে রাঙ্গা রবি, নির্ম্মল সরল ছবি,
ফুল দলে শিশিরের ধীরে পলায়ন !
কত সাজে সাজাইলে ভাষা ফুলবন !

৫

তুমিই আনিয়া দিলে সুষমা শ্যামল,
আগে ছিল রুখু রুখু না ছিল লাবণ্যটুকু,
মরা গাঙ্গে ছুটাইলে জোয়ারের জল !
দুই জনে চুবাচুবি, দুই জনে ডুবাডুবি,
'প্রতাপ' 'শৈবালে' যুদ্ধ কাঁপে দেবদল !
এমন আদর্শবীর, কোথা আছে পৃথিবীর,
পিণাকীর চেয়ে এ যে 'প্রতাপ' প্রবল !
তুমি ফুটাইলে এই অনল-কমল !

৬

তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়,
বালিকা 'প্রফুল্ল' আনি, গড়াইলে দেবীরাণী,
বিদ্যুতে মাখিয়া মূর্ত্তি দৈব-প্রতিভায় ।
কল্পনা-কালিন্দী-তটে, গড়িলে 'আনন্দমঠে',
ভারত ভবিষ্য স্বর্গ সুমেরু ছায়ায় !
শিখালে সন্তান ধর্ম্ম, জননীর প্রিয় কর্ম্ম,
মহাবীর 'সত্যানন্দ' মহাপ্রাণতায় !
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায় !

৭

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস, কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে !
বুঝাইলে যোগভক্তি, কৃষ্ণের অসীম শক্তি,
দেখালে আদর্শ নর দেব নারায়ণে !
ঝেড়ে পুছে ধুলা মাটী, হিন্দুর আসল—খাটি,
বুঝাইলে দয়া ধর্ম্ম দেশবাসিগণে ।
তোমার স্বাধীন মত শরতের রৌদ্রবৎ,
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে ।
প্রতিভায় দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,

কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাবাফুলবনে ?

৮

যাবে তুমি ? এ জগতে কে না বল যায় ?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পাষাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় !
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায় !
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চলে যাক্ অমারাহু, ক্ষতি নাহি তায় !
তুমি থাক, মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটী কোটী রেণু কণিকায় ?
আমরা পথের ধূলি, কর্দ্দম কঙ্করগুলি,
আমরা নীচের নীচ পড়ে থাকি পায় !
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান,
তুমি কবি-কহিনূর কিরীট চূড়ায় !
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায় !

৯

গভীর বসন্ত নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা—নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন !
পাতিয়ে অঞ্চল ঢেউ—আঁধারে দেখেনি কেউ—
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ !—
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলিছে পতিরে দিতে ডগমগ মন !
কত যুগ যুগান্তর, হৃতরত্ন রত্নাকর,
দেবতা লুঠিয়া নিছে করিয়ে মন্থন !
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন !
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা সৃজন !
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কল্পতরু তৃণ তরুগণ !
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,

অঙ্গারে হইবে হীরা কৌস্তুভ রতন!
সত্যই কবি কি মরে? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন!
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ!" *

'নব্যভারতের' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার জন্য শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া কিছু পরিতৃপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু ইহা এই মহাত্মার অমানুষী শক্তির উপযোগী পূজা নহে। কেহ কেহ আপন আপন পথ বাঁচাইয়া কথা বলিতেছেন। কবে তাঁহার চরিত্রে কি দোষ ছিল, এই সময়ে কেহ সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতেছেন, কেহ বা তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য ছিল, একথা ঘোষণা করিয়া উদারতা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ প্রবন্ধ অপেক্ষা উপন্যাসের, কেহ বা উপন্যাস অপেক্ষা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের, কেহ বা সকল অপেক্ষা তাঁহার সমালোচনা-শক্তির অধিক প্রশংসা করিতেছেন।"

• • •

"ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান, এ কথা ভাবিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু নিপতিত হয়, প্রাণ শোকে, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়। কি অপরাধে, সোণার বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচার ও সাহিত্যসেবার মায়া পরিত্যাগ করিলেন, জানি না। তিনি কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—'বঙ্গদেশে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি সাহিত্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, যার যা ইচ্ছা লিখিতেছে এবং করিতেছে, ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।' এই দুঃখেই কি মহাত্মা অসময়ে প্রয়াণ করিলেন? ত্রিশ বৎসরাধিক কাল তিনি বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্ ছিলেন, এবং কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে ধর্ম্ম-সংস্কারের তিনি অজেয় নেতা ছিলেন, তাহা কি তিনি জানিতেন না? তাঁহার অভাবে যে বঙ্গদেশ সম্রাট্‌হীন এবং নেতাহীন হইবে, তাহা কি তিনি বুঝিতেন না? তবে কেন গেলেন, কেন কাঁদাইলেন? আকুল প্রাণে মহাশ্মশানে, মহাধ্যান-মগ্ন মহাযোগীকে এ কথা ২৬এ চৈত্র, রবিবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, উত্তর পাই নাই। যখন দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত চিতায় মহাত্মার প্রতিভা-প্রদীপ্ত শরীর ভস্ম হইতে লাগিল, এবং সেই স্থানের অমূল্য পরমাণু-মিশ্রিত প্রতপ্ত বায়ু শরীরকে পবিত্র করিতে লাগিল, তখন আকাশের দিকে চাহিয়া, বিহ্বল প্রাণে মহাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেব, কেন যাও, কোথা যাও? কিন্তু উত্তর পাই নাই; তখন বুঝিলাম, তিনি বঙ্গদেশের মমতা চিরকালের জন্য

* নব্যভারত, ১৩০১, বৈশাখ।

ভুলিয়াছেন। হা বঙ্গদেশ। হা বঙ্গভাষা !!

"এ দেশের শেষ গৌরব, শেষ কীর্ত্তি, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ আগুন, শেষ প্রতিভার চিতা নিবিল। এ দেশের গৌরব করিবার যাহা ছিল, নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে হারাইলাম।" *

বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ মহাশয় লিখিয়াছিলেন :—

অন্ত্যেষ্টি

"জান না জান না, হারে ভূ-পিশাচগণ।
মুখে শীষ হাতে তুরী, পথে সে মলয়া ছুঁরী
কাণে কাণে কয়েছে কি কথা কন্-কন্?
গঙ্গার গৈরিক'পর সে দিব্য ত্রিবেণী-থর
ফুলিতেছে খুলি পাক ফণিনী মতন,
আঁধারে মা মাথা কুটে, ফোঁফায়ে ফোঁফায়ে লুটে—
আছাড়ে কাঁটালপাড়া কাঁপে ঘন ঘন।
যাঁর সে কটাক্ষ-মন্ত্রে, ঘুরিতি কুলাল যন্ত্রে,
চিবাতেছ আজি তাঁর চিতার চন্দন?

*　　　*　　　*

যজ্ঞ-সূত্রে গরথিতা,　　　দগ্ধবক্ষে ঝোলে গীতা,
শ্মশ্রুহীন শুকনাস পলিত ব্রাহ্মণ
ভুলেছে কন্যার শোক,　　　রোমাঞ্চিয়া পিতৃলোক
স্ফুরিছে বিরল-দন্তে 'বন্দে মাতরম্'!
ছিঁড়েছে হিক্কায় কার,　　　কচ্ছপীর এক তার—
আলুথালু বীণাপাণি খুলেছে তোরণ!
সে স্বপ্ন আনন্দমঠে,　　　আজি কি ফলিবে বটে?
বঙ্কিম পশিছে ওই বৈকুণ্ঠ-ভবন!
রাখ্ রে তাণ্ডব রাখ্ ভূ-পিশাচগণ!

২

তুমি ত চলিলে,　　　দেব বঙ্গ-দরশন!
অন্ধ বাঙ্গালার, আহা, কি হবে এখন?
বৈকুণ্ঠে দেখিলে বাণী,　　　চপলা কমলা রাণী,
আলিঙ্গি' দক্ষিণে বামে মধ্যে নারায়ণ—

* নব্যভারত

পুছিও মা ভারতীরে, আর কি হইবে ফিরে
স্বপ্ত বঙ্গভূমে তাঁর মহা উদ্বোধন ?
ভারতের ঘুমে ভেঙ্গে, বাজিবে হেমের শিঙ্গে ?
নবীনের মহাশঙ্খে হবে ভূ-কম্পন ?
রাজকৃষ্ণ রামদাস, ফুঁ দিবে অমৃত-শ্বাস,
ভারত-কলঙ্ক-কুষ্ঠ করি প্রক্ষালন ?
আবার কি কদাচিৎ বিশ্ববেদাঃ পুরোহিত
করিবে অনন্ত ছন্দে বাণী আবাহন ?
এ তব বাঙ্গালী জাতি, পোহাবে কি কাল-রাতি,
বিশ্বের সাহিত্য-যাগে পাবে নিমন্ত্রণ ?
বঙ্গগুরু ! বাঙ্গালার কি হবে এখন ?

৩

হা বঙ্কিম, কেনা জানে তব অবদান ?
কি জ্ঞানী অজ্ঞান আর হিন্দু মুসলমান !
নাই ডাকাতের ডর, নাই আর নীলকর,
নিশীথে নিঃশঙ্কচিতে উতারি উজান,
রূপসার* রূপা-বুকে বুড়া নেয়ে, ধূঁয়া-মুখে,
বঙ্কিমবাবুর নাম আজো করে গান !
আশে পাশে নাহি আর নাবিকের হাহাকার-
নীরন্ধ্র স্বন্দর-বনে তুকুলে শয়ান,
করে কেলি দম্পতি ধলেশ্বর মধুমতী,
অচকিত পুলকিত, বিকাল বিহান !
পুঁথীর পাতার পরে শ্মশ্রু-বাহি অশ্রু ঝরে,
আজিও আয়েষা লাগি কাঁদে ওসমান ?
কাফের লম্পট ঠক্, কত মূর্খ মবারক
দলিত-দরিয়া-দম্ভে হাবু ডুবু প্রাণ !
হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?

৪

বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে দেব, করিও স্মরণ,
ধরিয়া মা ইন্দিরার রাতুল চরণ !—
কত আর সে প্রখর ছিয়াত্তরে মন্বন্তর

* খুলনা নগরীর অনতিদূরবর্তিনী নদী।

দগধ খাণ্ডব-বঙ্গ করিবে দহন ?
কবে রামধন পোদ, শোক দুঃখ দিবে শোধ,
বাঙ্গালীর কৃষী বল হবে উজ্জীবন ?
ত্রিসন্ধ্যা জপিও আর, সে সাবিত্রী অনিবার—
উদাত্ত আগ্নেয় শ্রুতি, 'বন্দে মাতরম্',
ক'ও মাগো, আজ তারা—আজি বঙ্গ লক্ষ্মীছাড়া !
কাঁদাইযা কমলার অমল আনন !
বৈকুণ্ঠে বঙ্গের দেব, করিও স্মরণ ।"*

* * *

জন্ম-কুণ্ডলী

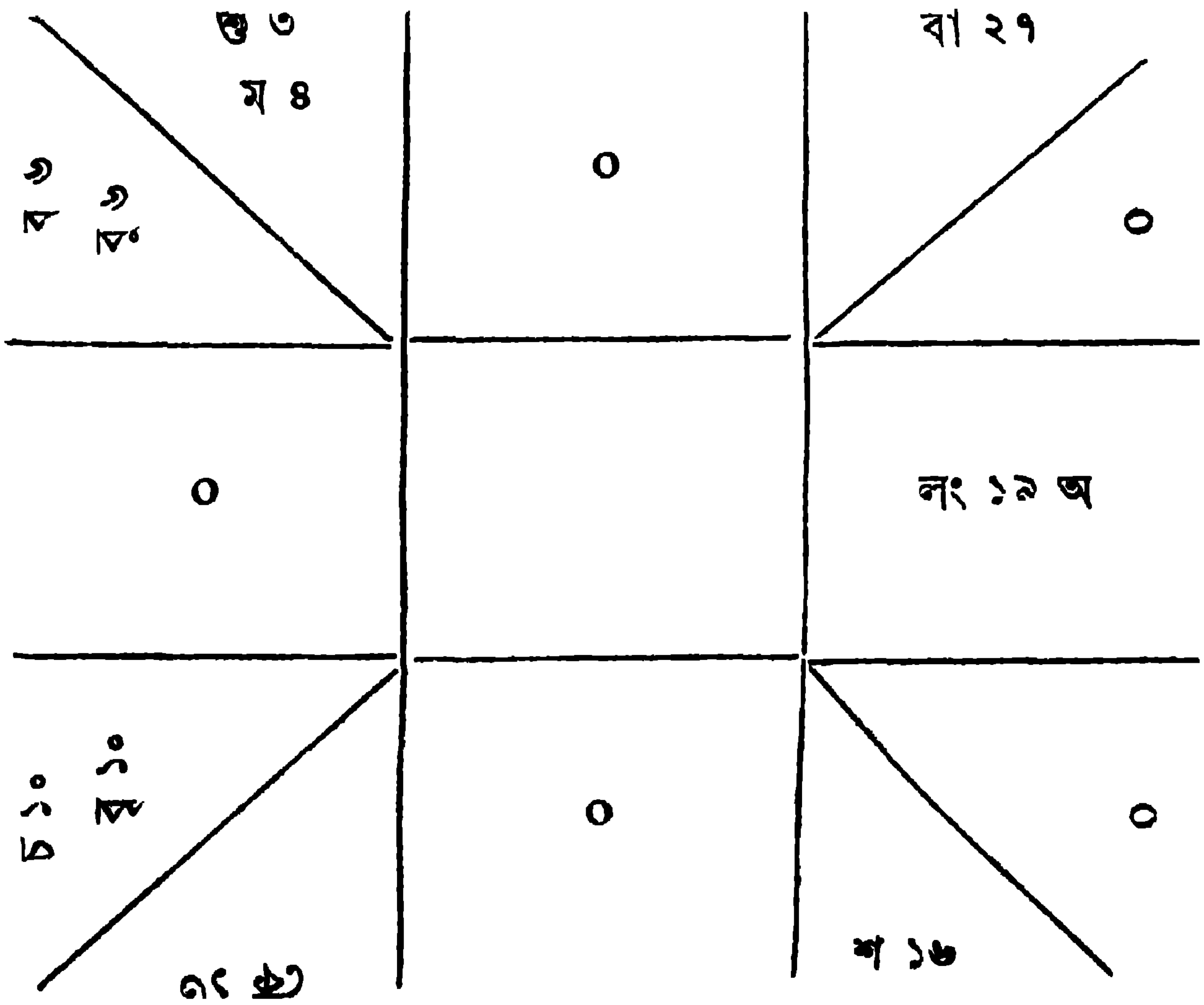

গ্রহস্ফুট ১৮।১৫।১১।২৬
জন্মলগ্ন শকাব্দ ১৭৬০।২।১২
৫৫। ৯।১৪

* নব্যভারত।

পঞ্চান্ন বৎসর, নয় মাস, ১৪ দিন বয়সে মৃত্যু।

যোগ,—বুধাদিত্য যোগ। নবমাধিপতি বুধ ও দশমাধিপতি শুক্র স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন। সুখাধিপতি ও কর্ম্মাধিপতি শুক্র পঞ্চমে কোণে অবস্থান করিতেছেন। ফলঃ—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ, বিদ্যা, মান, যশ।

রাহুর দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশায় মৃত্যু অনিবার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের করতলে ঊর্দ্ধরেখা ব্যতীত একটী উল্লেখযোগ্য রেখা ছিল। রেখাটি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তর্জ্জনীর নিম্ন (বৃহস্পতি) হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন (বুধ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেখা রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল। রেখাটি কোথাও বাঁকে নাই বা ভাঙ্গে নাই। এই রেখা যাঁহার হাতে থাকে, তাঁহার কবিত্ব সংসারে পূজিত হয়।

উপাধি

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ উপাধি তাঁহার ভূষণ না হইয়া কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছিল। সকলেই স্বীকার করিবেন, এ উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হয় নাই। যে উপাধি পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার বা মাইনর স্কুলের শিক্ষক পায়, সে উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হইতে পারে না। সে সময় এ বিষয় লইয়া একটু গোলযোগ উঠিয়াছিল। কোনও ব্যক্তি, কোন সাময়িক পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।* প্রবন্ধের নাম—'উপাধি উৎপাত।' আমি তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

"সেদিনকার উপাধিসত্র মনে পড়ে। বেলভেডিয়ারে সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলাতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধিধারীদিগের সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে একজনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা, মহারাজা, নবাব থাকিতে, একজন রায় বাহাদুরের প্রতি সকলের যে নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপ্রসাদে মানুষ ধন্য হয় না—নিজগুণে ধন্য হয়, এ কথা আমরাও—উপাধিলোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয়-গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা, মহারাজা, নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতিসাগরে

* লেখক—বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; পত্র—'সাহিত্য', ১২৯৯ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা।

তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।

"আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিতণ্ডাপ্রিয়, গর্ব্বিত পাদ্‌রী হেষ্টী, ছদ্ম-নামধারী বঙ্কিম বাবুর রচনা ও তর্ককৌশলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তখন বঙ্কিম বাবু সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে সম্মানের প্রার্থী নহেন, স্বজাতির সুখ্যাতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।

"ইংরাজ রাজার নিকট তিনি এরূপ তেজের কথা বলিতে পারেন না, কারণ তিনি ইংরাজের কর্ম্মচারী। কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া মিনতি করিয়া কহিতেন, 'দোহাই তোমাদের! তোমাদের কর্ম্ম করিয়াছি, তোমরা আমায় বেতন দিয়াছ। কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছি, এখন পেন্‌সন দিতেছ। আমার মাথায় উপাধি চাপাইয়া আর আমায় বিডম্বিত করিও না।" তাহা হইলে হয়ত তিনি রেহাই পাইতেন, নগণ্য রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুরদিগের সমভিব্যাহারে রাজদ্বারস্থ হইতে হইত না। যদি এ কথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিম বাবু 'রায় বাহাদুর' উপাধিগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।"

ইহার কিছু দিন বাদে 'সাহিত্য'-সম্পাদক একখানি 'বিশ্বস্ত' পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম্ম সকলকে জানাইয়া তিনি বলিলেন যে, "নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।" আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে, এই পত্রখানি বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং সাহিত্য-সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের নববর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সি. আই. ই. উপাধি পাইলেন। **Investiture** দরবার হইল ২১শে মার্চ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সুতরাং তিনি দরবারে যাইতে পারেন নাই।

সি. আই. ই উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেকেই অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে সম্মানিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমি জানি, যে কথা আপনি বিশ্বাস করেন না, বা সত্য বলিয়া মনে করেন না, সে কথা কখনও আপনি বলেন না বা লিখেন না। আমি চিরদিন আপনার পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিব।"

গুরুদাস বাবুও চিরদিন বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রখানি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন:—তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে যাহা করিয়া থাকে আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায় কালেজ রিইউনিয়ন নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত।** আমি ঐ কালেজ রিইউনিয়নে যাইতাম। যাইতাম—কৃষ্ণ বন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস, অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাবসৃষ্টির বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্। আমি দ্বিতীয় কালেজ রিইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মরকতকুঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকার অভ্যর্থনা করিতেছিলাম, বিদ্যুৎকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে। কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।*

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:—"সে দিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়ুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভাল স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সে দিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক

* প্রদীপ, প্রথম ভাগ।

প্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ়পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সে দিন আর কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী এক সঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান পাইয়া জানিলাম, তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিম বাবু।"

বঙ্কিম-জীবনী

চতুর্থ খণ্ড

সাহিত্য

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য

যে বঙ্গভাষা আজ সাহিত্য-সম্পদে গৌরবশালিনী, বিবিধ ভাবসম্ভারে বিভূষিতা, সে বঙ্গভাষার জননী কে? বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা; আবার প্রাকৃত ভাষার জননী সংস্কৃত-ভাষা। সংস্কৃত, বিশুদ্ধ ভাষা। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণ লোকে সংস্কৃত হইতে একটু বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত। অবশেষে সেই সাধারণ লোকের ভাষা প্রাকৃত ভাষা বলিয়া অভিহিত হইল। সকল দেশেই এরূপ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতর বা সাধারণ লোকের ভাষা, বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা হইতে অনেক বিভিন্ন। আমাদের দেশেও তাই। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ও চলিত বাঙ্গালায় অনেক প্রভেদ। বিশুদ্ধ বাঙ্গালার অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, চলিত বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় শব্দ প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যখন 'কার্য্য' বলা যায়, তখন উহা সংস্কৃতপ্রসূত, আর যখন 'কাজ' বলা যায়, তখন প্রাকৃত কজ্জ শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ 'কর্ণ' সংস্কৃত, আবার 'কান' প্রাকৃত 'কন্নে'র রূপান্তর। সেইরূপ 'হস্ত' হইতে 'হত্থ', 'হত্থ' হইতে 'হাত' হইয়াছে। 'চন্দ্র' হইতে 'চন্দ', 'চন্দ' হইতে চাঁদ। বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা হইলেও উভয়ের মধ্যে ব্যাকরণগত অনেক পার্থক্য আছে। প্রাকৃতে সাধারণতঃ একটা 'স' আছে—'শ' ও 'ষ' নাই; একটা 'ন' আছে 'ণ' নাই; একটা 'জ' আছে—'য' নাই। বাঙ্গালা ভাষা এ সকল স্থলে এবং সন্ধি ও সমাসে জননীর পথানুবর্ত্তিনী না হইয়া মাতামহী সংস্কৃত ভাষার অনুসারিণী হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তির কাল নিরূপণ করা দুরূহ হইলেও এ কথা বলা যায় যে, মহারাজ অশোকের সময় এক প্রকার প্রাকৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল। সে আজ প্রায় একুশ শত বৎসরের কথা। তার কিছুদিন পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা-রত্ন বররুচিকে প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণ 'প্রাকৃতপ্রকাশ' রচনা করিতে দেখা যায়। সেও প্রায় দুই হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোনও পুস্তক এক্ষণে পাওয়া যায় না। তাহা পাওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থও দুষ্প্রাপ্য। বিদ্যাপতির রচনাই আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হই। অতএব ইনিই বাঙ্গালার আদি কবি। জয়দেবের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় নহে; সুতরাং তাঁহার নামোল্লেখ

এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে বাঙ্গালা বা প্রাকৃত ভাষায় যদি কেহ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহার চিহ্ন বা স্মৃতি এক্ষণে নাই।

বাঙ্গালার আদিকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অনুমান পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে। তাঁহার সম সময়ে আরও দুইজন কবি বাঙ্গালা পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। কিন্তু কে কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। নিম্নে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদিগের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

পঞ্চদশ শতাব্দী

কৃত্তিবাস

ষোড়শ শতাব্দী

কাশীরাম, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, প্রেম দাস, বলরাম দাস, গৌরী দাস, নরহরি সরকার ও মাধব।

সপ্তদশ শতাব্দী

মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ দাস, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী

রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র রায়, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রাম বসু, হরুঠাকুর ও নিতাই দাস।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে প্রধান প্রধান কবিদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে—ক্ষুদ্র কবিদিগের নাম দেওয়া হয় নাই। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বহু কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; মহাভারতের কবি অন্যূন ৩৫ জন; 'মনসার ভাসানে'র কবি অন্ততঃ ৬২ জন। সকলের নাম দেওয়া সম্ভবপর নহে—প্রয়োজনও নাই।

এই সকল কবিদিগের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য বড একটা কেহ যে রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ শুনা যায় না। রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সে রচনা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। শুনা যায়, কবি ভারতচন্দ্র মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, একটা বিপ্লব না ঘটিলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। বিপ্লবটা ধর্ম্মঘটিত হইলেই সাহিত্য যেন অনুপ্রাণিত হইয়া জাগিয়া উঠে। লুথার যখন বাইবেল অনুবাদ করিয়া পোপের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন ইউরোপীয় সাহিত্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সময় যখন বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তখন অনেকগুলি বৈষ্ণব কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজ্যাবেথের সময় যখন প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ঘোরতর কলহ চলিতেছিল, তখন প্রতিভাস্রোতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল, তখন মৃতপ্রায় বঙ্গসাহিত্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাদ করিতে হইলেই সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; আর সে আশ্রয় পদ্য দিতে অসমর্থ। কাজেই গদ্যে বিবাদ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্ম-প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাও "পাষণ্ড-পীড়ন" শীর্ষক পুস্তক রচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদের গালি দিয়াছিলেন। উত্তর প্রত্যুত্তর, তর্ক বিতর্ক উভয় পক্ষে বেশ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মরা 'সমাজ' খুলিলেন, হিন্দুরা 'ধর্ম্মসভা' বসাইলেন। সমাজে ও সভায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠের কোনও ত্রুটি হয় নাই। আবার সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপে ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্র ধরিয়া বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হইল, আর সেই গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়।

কিন্তু দেশে মুদ্রাযন্ত্র না আসিলে কিছুই হইত না। মুদ্রাযন্ত্র আনিলেন, ইংরাজ। পলাশী-যুদ্ধের বিশ বৎসর পরে—ইংরাজ যখন সবেমাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন, তখন চার্লস্ উইল্‌কিন্স নামক একজন মহাশক্তিশালী ইংরাজ কাঠ কাটিয়া, খুদিয়া এক প্রস্ত বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই কাঠের অক্ষর সম্বল করিয়া উইল্‌কিন্স সাহেব হুগলীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এবং সেই যন্ত্রে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত করিলেন। এই ব্যাকরণের প্রণেতা বাঙ্গালী নহে—একজন ইংরাজ। তাঁহার নাম হলহেড। তিনি গ্রন্থশিরে লিখিলেন।—

বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গীনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ ব্রেজী।"

আর একজন ইংরাজ* একখানি বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিলেন। ইংরাজের নিকট আমাদের ঋণের শোধ নাই। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই অক্ষর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, আমাদের ভাষা সৃষ্টির জন্য ব্যাকরণ গড়িয়া দিলেন, শিক্ষার জন্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া দিলেন। লক্ষ লক্ষ মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা পরিপূরিত হউক, শত শত ব্যাকরণ অভিধানে দেশ প্লাবিত হউক, তবু ইংরাজের প্রথম উপকার বিস্মৃত হইবার নহে—ঋণ অপরিশোধ্য।

উইলকিন্স সাহেবের কৃপায় বাঙ্গালীও অক্ষর প্রস্তুত করিতে শিখিল। তাঁহার প্রথম ছাত্র, পঞ্চানন কর্ম্মকার। এক একটি অক্ষর প্রস্তুত করিতে পঞ্চানন একটাকা চারি আনা লইত। এত অধিক মূল্যের অক্ষর আবার বেশী দিন টিকিত না।

---

* ফর্ষ্টর্।

কাজেই সিসার অক্ষর ঢালাই করিতে হইল। কিরূপে ঢালাই করিতে হয়, তাহাও ইংরাজ বাঙ্গালীকে শিখাইলেন।

মুদ্রাযন্ত্র পাইয়া রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার বিপক্ষীয়দের বড়ই সুবিধা হইল। রাজা "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং বেদান্ত ও উপনিষদ প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ প্রবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গভাষা উন্নতির পথে প্রধাবিত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে ভাষা পদ্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া উন্নতি করিতে পারিতেছিল না। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার হস্তে সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেন। ভাষা অবরোধমুক্ত প্রবাহিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিল। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে গিয়া পথ হারাইল। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত পথ কাটিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু সে পথ অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা ভাষার জটিলতা ঘুচাইয়া তাহা মনোহর করিলেন বটে, কিন্তু ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী রহিল,—স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া বিপুল সলিলে অঙ্গ ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার গতি ফিরাইয়া বিভিন্ন পথে আনিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে পথ প্রশস্ত করিয়া কাটিয়া প্রবাহিনীর বক্ষে বান ডাকাইলেন।

রামমোহন রায়ের যুগের পর, বিদ্যাসাগরের যুগ। যদিও এই যুগে বাঙ্গালা উপন্যাস* সর্ব্বপ্রথম রচিত হয়, বাঙ্গালা নাটক** সর্ব্বপ্রথম সৃষ্ট হয়, তথাপি বলিতে হইবে, এই যুগ অনুবাদের যুগ। এই যুগে—এই মধ্য যুগে বাঙ্গালা ভাষার বহুল উন্নতি হইয়াছিল। এতদসম্বন্ধে তৃতীয় যুগের সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত দিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

"প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় হইত। গদ্য রচনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্তলিখিত গদ্যগ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধু জনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। * * * * তাঁহারা কদাচ খয়ের বলিতেন না—খদির বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না—শর্করা

* আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

** ভদ্রার্জ্জুন—রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত।

বলিতেন। পণ্ডিতগণের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ানক ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষা রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের

ঘরের দুলাল” বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন; কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে। এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের* কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল।’ ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নহে। কিন্তু ‘আলালের ঘরের দুলালে’র পর হইতে বাঙ্গালী-লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।”**

বিদ্যাসাগর-যুগে বাঙ্গালা-গদ্য অনেক উন্নতি করিল বটে, কিন্তু আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্টি হইল না। আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্ট হইল, বঙ্কিম-যুগে। সৃষ্টি করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁহাকে অনেক গালি খাইতে হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল, “বঙ্কিমি ভাষা পিতা পুত্রে এক সঙ্গে পড়া যায় না।”***

কেহ বলিয়াছিলেন, “বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লেখা বুদ্ধিহীনের কাজ, সহজ বাঙ্গালা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা মূর্খের কাজ।”****

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, “লম্ফত্যাগ, নিদ্রাগমন” প্রভৃতি শব্দ লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামবাসীরাই “লম্ফত্যাগ” করিয়া থাকে—সহরে লোকেরা নাকি লম্ফদান করিয়া থাকে।*****

এইরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আক্রমণের মধ্যেও মহাপ্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত থাকিয়া ভাষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য

* ইনি র‍্যাসেলাসও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

** লুপ্ত রত্নোদ্ধার।

*** নব্যভারত, ১৩০১।

**** নব্যভারত।

***** রহস্য-সন্দর্ভ

হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান অক্ষয় কীর্ত্তি, ভাষা সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ইংরাজী-প্রিয় কৃতবিদ্যগণকে বাঙ্গালা ভাষা পড়াইবেন, তাঁহার সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না যে, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পড়েন নাই। তাঁহাদের কথা দূরে যাউক্, যে সকল ইংরাজেরা স্বল্পমাত্র বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়াছেন। যাঁহারা শিখেন নাই, তাঁহারা ও ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া সাধ মিটাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী নহে, তাঁহার ভাষায় আড়ম্বর বা জটিলতা নাই। দৌর্ব্বোধ্য ঘুচাইয়া ভাষাকে তিনি সরল করিলেন, বড় বড় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া তিনি তাহাকে সহজ করিলেন, নীরসকে মধুর করিলেন; প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভাব-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাকে মনোমত করিয়া সাজাইলেন, কালিদাসের উপমা-মালা আনিয়া মাতৃভাষার গলায় দোলাইয়া দিলেন, —শ্রীহর্ষের ভাববৈচিত্র্য আনিয়া শিরোভূষণ গড়িয়া দিলেন,—ভবভূতির কবিত্ব আনিয়া মেখলারূপে কটিতে জড়াইয়া দিলেন—ভারতচন্দ্রের লালিত্য ও সারল্য আনিয়া চরণে নূপুরস্বরূপ বাঁধিয়া দিলেন। যে উপমা সংস্কৃত শব্দের সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হওয়া অসম্ভব ছিল, তিনি তাহা অবলীলাক্রমে সরল বাঙ্গালায় লিখিয়া গেলেন—যে ভাব, যে শক্তি, যে লালিত্য বাঙ্গালা ভাষায় অপরিচিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া বঙ্গভাষাকে বিশোভিত করিলেন—দরিদ্রকে রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া জগৎ-সমক্ষে উপস্থিত করাইলেন। যে দারিদ্র্যভাবে নিপীড়িত হইয়া, লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে লুকাইয়াছিল, আজ সে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈদ্যুতিক স্পর্শে—বঙ্কিমচন্দ্র প্রদত্ত আভরণে ভূষিতা হইয়া গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে জগৎ-সমক্ষে দণ্ডায়মানা। যাহার উঠিবার শক্তি ছিল না, সে আজ গিরিলঙ্ঘনোদ্যতা—যে মূক ছিল, সে আজ বক্তৃতা-গর্জ্জনে বঙ্গভূমি প্রকম্পিত করিতেছে—যাহার রূপের বৈচিত্র্য ছিল না, সে আজ ইংরাজ-কৃত ইতিহাস দূরে ফেলিয়া দিয়া নিজের ইতিহাস নিজে লিখিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দুই তিন খানি গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ ও সরল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে বুঝিয়াছিলেন যে, সারল্যই ভাষার সৌন্দর্য্য। তাই তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধু জগদীশ বাবুকে বলিয়াছিলেন :—

"Clearness and simplicity are the best of all ornaments; and that I have arrived at this conviction after much painful experience".

বিষবৃক্ষের ভাষা অতুলনীয়। ভাষার যেমন শক্তি, তেমনই উচ্ছ্বাস। কোথাও বীণার ঝঙ্কার, কোথাও নদীর কুলু কুলু ধ্বনি। স্রোতের ন্যায় ভাষা বহিয়া চলিয়াছে, বাধা নাই, বিরাম নাই। কোথাও তরঙ্গ গর্জ্জন, কোথাও বা নববধূর প্রেমালাপ-

তুল্য কোমল ধ্বনি। সপ্তসুরে ভাষা সঞ্জীবিত—ভাবভারে উচ্ছ্বসিত, এমন ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুল্লর্ভ—অন্য দেশের সাহিত্যেও বিরল।

রামমোহন রায়ের যুগের প্রারম্ভ হইতে বিদ্যাসাগরের যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে রামমোহন রায়ের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন, অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোনমতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে।"*

১৮০১ সালের বাঙ্গালা পদ্য:—[লিপিমালা, রাম রাম বসু প্রণীত।]

"মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন॥
অতএব ভুলভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভনে॥
শতাদিত্য বসু বর্ষ পঞ্চশ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।"

গদ্য:—[উক্ত পুস্তক; কাষ্ঠের অক্ষরে মুদ্রিত।]

"সম্প্রতি শিরসী দেশাধিপ নষ্টতা করিয়া আরঙ্গের নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে দমন হইবেক তাহাতে কি হয় আপনকার ও অঞ্চল ঐ বাঁধালে রক্ষা পায় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। এখান দিয়া যে আনুগত্য হইতে পারে ক্রটি হইবেক না। ইচ্ছা আপনি যাইয়া তোমার ও অঞ্চল যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করি কিন্তু এখানে আর আর অনেক অনেক লোক ওখানকার সহিত বিপক্ষতা করিয়া নষ্টতা করিতে উদ্যত তাহাদের দমন নহিলে ওখানকার উপর বিপত্তি হওনের আটক হইতে পারে না। এই হইল তাহার বাধক তথাচ ক্রাট হইল না। কয়েক হাজার সেনা-সমেত রাজা নবকুমার আপনকার আনুগত্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল ইহা দিয়া ক্রটি হইবেক না। আর আর নিগূঢ় প্রসঙ্গ অনেক যাহা অলিখ্য তাহা ইনি পৌচিয়া আপনকার সুগোচর করিলেন। কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ইহা দিয়া অনেক অনুগত্য হইবেক আমিও এই লোকেরদিগের দমন করিয়া আপনকার ও অঞ্চলের অবশ্য আনিব ইহাতে সন্দেহ করিবা না ওঁরা প্রতুল করা যাইবেক।"

* নব্যভারত, দ্বাদশ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

১৮০২ সালের ভাষা :—[বত্রিশ সিংহাসন, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে।]

ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুই জনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক আছে মস্তকের সমীপে এক প্রস্তরে কথোকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক চ্ছেদন করিয়া বলি দিবে তবে এই স্ত্রী পুরুষের জীব ন্যাস হবে। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য জ্ঞান হইল। তৎপর ধনদত্ত তীর্থদর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথাপ্রসঙ্গে রাজার সমীপে এ সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাব কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন। রাজা আপনি সাক্ষাতে সমস্ত দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎকিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্ত উত্তম লোকে প্রাণপণ করে আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রীপুরুষ দুই জনে জীবিত শরীর হইবে রাজা সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাতে আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত। ইতিমধ্যে দেবা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর।"

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের উৎকট সাধুভাষার উদাহরণ :—[প্রবোধ চন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত।]

"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়ানিল, সে উচ্ছলচ্ছী করাত্যচ্ছ নির্ঝরাশুঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

১৮১৪ সালের ভাষা :—[পুরুষপরীক্ষা, হরপ্রসাদ কর প্রণীত।]

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া নির্ভীক ও বহুপুত্রযুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করেন।"

১৮২০ সালের ভাষা :—[পত্র-কৌমুদী]

"ঐ সকল পাঠশালার বালকেতে উঠান পরিপূর্ণ, আর বালকেরা এস্তাহাম* দিবার নিমিত্তে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেছে আমার এমত বোধ হইল, কিছুকাল আমি এই আমোদ দেখিতেছিলাম, ইতিমধ্যে শাহেব ও মুছলমান ও বাঙ্গালি লোকেরা গাড়ী ও পালকীতে চড়িয়া আইলেন; তাহারদিগকে শ্রীযুত বাবু গোপী মোহন দেবের লোকেরা সমাদর করিয়া বড দালানের মধ্যে বসাইলেন, এবং যে যে কেতাব বালকেরা শিখিয়া থাকে নীতিকথা ও দিগদর্শন প্রভৃতি ছোট বড় এই সকল কেতাবে পরিপূর্ণ এক মেজ দালানের মধ্যে ছিল।"

১৮২৬ সালের ভাষা :—[বহুদর্শন. নীলরত্ন হালদার প্রণীত।]

"দ্বিতীযতো যে সকল ব্যক্তি বিষয়িরূপে খ্যাত এবং যাঁহারদিগের সময বিষয়ানুষ্ঠানে ভুক্ত হওনে এ সকল বহু ভাষার সারোদ্ধার করণে অনবকাশ ও তন্নিমিত্তে প্রস্তাব্য বক্তব্য সভ্য শৌভা ভব্য করণে আয়াস বোধে হতাশ কিম্বা যে সকল ভাগ্যবান

* Examination.

লোকের সন্তান সর্ব্বদা সুখানুরক্ত প্রযুক্ত পরিশ্রমের শঙ্গাতঙ্কায় শাস্ত্ররূপ সমুদ্রে মগ্ন হওনে ভগ্নোদ্যম—"

১৮৩৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা :—[প্রবোধচন্দ্রিকা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত]।

"মরণোত্তর কেবা কার পতি কেবা কার পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোর যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলি ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কাল যাপন কর কেহ কি কাহার স্বামী বলিয়া চুণের ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমরা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ আমাদের কাহার সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহা হইতে। ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমার বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্যলোক।"

১৮৩৬ সালের কবিতা :—বাসবদত্তা, [মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।]

এথায় কামিনী সাজিয়া সাজ।
বসিয়া রসিকা সখীর মাঝ ॥
নাগর না এল হইল নিশা।
ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা ॥
কি হ'ল কি হ'ল ওলো সজনি।
নাথ কই এত হল রজনী ॥
যা গো সখি তোরা জনেক যাও।
বারেক বন্ধুরে আনিয়া দাও ॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কারে কব সই প্রাণ যে কি করে ॥
হেদে মদনিকা চলিয়া গেল।
খেয়ে মোর মাথা কেন না এল ॥

১৮৪৩ সালের বাঙ্গালা ভাষা :—[সমাচারচন্দ্রিকা, ২রা আষাঢ় ১২৫০]

"এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধক-লওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল। তাহাতে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা সুবোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া বরেলীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগ দখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন।"

১৮৫২ সালের বাঙ্গালা ভাষা :—[বাঙ্গালার ইতিহাস, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।]

"কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা ষাটি বৎসরের অধিক কাল নিরুপদ্রবে ছিলেন। সুতরাং বিশেষ আস্থা না থাকাতে তাঁহাদের দুর্গ প্রায় এক প্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ তাঁহারা আপনাদিগকে এমত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যাসের মধ্যেও অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দুর্গমধ্যে এক

শত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল ; তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন ইউরোপীয়। বারুদ পুরাতন ও নিস্তেজঃ ; কামান সকল মরিচাধরা।"

১৮৫২ সালের ভিন্নজাতীয় বাঙ্গালা ভাষা :—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রণীত।]

"এক্ষণে আমারদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, স্বদেশের দুরবস্থা দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের তন্নিরাকরণার্থে লোকদিগকে ভৌতিক শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত।"

১৮৫৭ সালের বাঙ্গালা ভাষা :—[চরিতাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহাত্মা বিদ্যাসাগর প্রণীত।]

"একদিন একটি স্ত্রীলোক সিমসনের নিকট কোন বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। ঐ গণনাতে চণ্ড নামাইবার আবশ্যকতা ছিল। সিমসন এই অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তিকে বিকট বেশ ধারণ করাইয়া নিকটবর্ত্তী খড়ের গাদার পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, চণ্ডকে আহ্বান করিলেই ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক।"

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ আদর ছিল তাহা বলা হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য সে সময় আদর পাওয়া দূরে থাকুক, যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা ও অবজ্ঞা পাইয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালা নয়, সংস্কৃত সাহিত্যও নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।* ইংরাজি-কৃতবিদ্যগণ মনে করিতেন, সংস্কৃত বা বাঙ্গালা সাহিত্যে শিখিবার কিছুই নাই। যোগীন্দ্রনাথ বাবু এ সময়ের অবস্থা সবিশেষ দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "তাঁহারা (শিক্ষিত সমাজ) সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই ; ইহা কেবলই কুশ ও তৃণের গুণাগুণ এবং ঘৃত দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ, এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভগবদ্গীতায় মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াড, ইনিয়াড এবং ফিল্ডিংয়ের উপন্যাসে মুক্তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহারা গৌরবজনক মনে করিতেন। তাঁহারা আকিলিস্ ও আগামেম্‌ননের উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষের নাম করিতে পারিতেন। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া থাকিতেন, সেক্সপিয়র বা মিল্টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্ব্বে রামচন্দ্রের বনবাস, কি

* লর্ড মেকলে বলিয়াছিলেন, কোন ইউরোপীয় উত্তম পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারি ভারতবর্ষ ও আরব্যের সমগ্র সাহিত্যের সমতুল্য। ডফ সাহেবও ঐ রকম কি একটা বলিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন লিখিত আছে, তাহা তাঁহাদিগের জ্ঞান ছিল না। বেদব্যাস ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব। হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাত-নামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তাহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগেব এবং অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগেব পাঠের জন্য মহাভারত রামায়ণ নামে দুইখানা পদ্যগ্রন্থ আছে, এইমাত্র তাঁহাবা জানিতেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান কবিতেছিল বটে, কিন্তু নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মতে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্র লেখা তাঁহারা অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন।" *

এই ঘোব অমঙ্গল হইতেও আমরা মঙ্গল প্রাপ্ত হইযাছি। পাশ্চাত্য সাহিত্য আমাদের দেশে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাকবিদিগের ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। সেক্সপিযর, মিল্টন, দান্তে, গেটেকে আমরা চিনিলাম—সেলি, কীটস, বার্ণস্, স্থইন্‌বর্ণ প্রভৃতির কল্পনা উচ্ছ্বাসের সহিত আমরা পরিচিত হইলাম—কিরূপে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিযা ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃত করিতে হয তাহাও আমরা শিখিলাম। বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি সকল বিষযেই আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার, মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিল। কেহ বিধবার দুঃখে বিগলিত হইয়া সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (১)—কেহ পাশ্চাত্য ধর্ম্মের অনুকরণে ধর্ম্ম সংস্কারে ব্রতী হইলেন (২)—কেহ রাজনীতি ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন (৩)—কেহ বা দেশহিতৈষণার আদর্শরূপে দেশমধ্যে পূজিত হইলেন (৪)। সাহিত্য-সংস্কার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার একখানি মাসিক পত্রিকা (৫) প্রচার করিলেন; ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অনুশীলন জন্য রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় একখানি মাসিক পত্র (৬) প্রকাশ করিতে ব্রতী হইলেন; ধর্ম্ম-সংস্কার জন্যও মাসিক পত্রের (৭) অভাব হইল না; রুচি মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পত্র (৮) প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ভাষাকে সহজ ও সরল করিবার অভিপ্রায়ে প্যারীচাঁদ মিত্র একখানি কাগজ (৯) প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈদ্যুতিক স্পর্শে বাঙ্গালীর

* মাইকেলের জীবন-চরিত।

(১) মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। (২) মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (৪) রামগোপাল ঘোষ। (৫) সর্ব্ব শুভকরি।
(৬) বিবিধার্থ সংগ্রহ। (৭) তত্ত্ববোধিনী। (৮) বিদ্যাকল্পদ্রুম। (৯) মাসিক-পত্রিকা।

সুপ্ত প্রতিভা জাগরিত হইয়া শতমুখে প্রধাবিত হইল—মুমূর্ষুপ্রায় বঙ্গভূমি যেন নবজীবন পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাঙ্গালী আরও একটী শিক্ষা পাইল। সে বুঝিল যে, মাতৃভাষার উন্নতি সংঘটিত না হইলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন ইংরাজি-শিক্ষিত কয়েকজন বাঙ্গালী মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে যত্নবান্ হইলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। শিক্ষিত সমাজ চমকিত হইল। কেহ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, কেহ বা কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। স্রোত ফিরিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। কিন্তু সকলে নয়।

তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আসর জাঁকাইয়া বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতেছেন। বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচির স্রোতও ফিরিয়াছিল। ভারতচন্দ্র ও তাঁহার অনুকরণকারীদিগের অশ্লীল কবিতা ফেলিয়া সাধারণে তখন গুপ্ত-কবির হাস্যরসানুপ্রাণিত কবিতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। "বাসবদত্তা"-প্রণেতা ছাড়া বড় একটা আর কেহ আদিরসের অনুরাগী হইলেন না।

গুপ্ত-কবি পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে 'খাঁটি বাঙ্গালী কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" এটি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালার কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।" * * *

গুপ্ত-কবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন যুগের প্রভাবও অন্তর্হিত হইল।* আরও যে দুইব্যক্তি গদ্য** ও পাঁচালী*** রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পুরাতন যুগের চিহ্ন লইয়া গুপ্ত-কবির সঙ্গে মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের চিতাধূমে গগন সমাচ্ছন্ন হইতে না হইতে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল। "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য" ও "নীলদর্পণ" ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইল। সকলে স্পষ্ট বুঝিল, নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পর বৎসর মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" প্রকাশিত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়া "অভেদী" নামক উপন্যাস লিখিবার আয়োজন করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত, ইংরাজি, হিন্দি, সাহিত্য হইতে রত্নরাশি আহরণ করিয়া ঘরে আনিতেছেন—অক্ষয়কুমার দত্ত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' তন্ময়। চারিদিকে তখন বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেমন একটা যত্ন পড়িয়া

* ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু।

** মদনমোহন তর্কালঙ্কার—মৃত্যু ১৮৫৮ খৃঃ।

*** দাশরথি রায়—মৃত্যু ১৮৫৭ খৃঃ।

গিযাছে। কিন্তু তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের ভুল ভাঙ্গে নাই, তিনি ইংরাজি ভাষায় গল্প লিখিযা যাইতেছেন। কিশোরী মোহন মিত্রের "ইণ্ডিযান ফিল্ড" নামক পত্রে 'Raj-mohan's wife' ইতি শীর্ষক গল্প লিখিযা যাইতেছেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই সহসা তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন, পৃথিবীময কোনও প্রসিদ্ধ লেখক মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিযা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হযেন নাই—কোনও সাহিত্যিকের প্রতিভা বিদেশীয ভাষায বিকাশ প্রাপ্ত হয নাই—কোন আদর্শ গ্রন্থ পরকীয ভাষায অদ্যাবধি রচিত হয নাই। তিনি আরও বুঝিযা দেখিলেন, পৃথিবীতে ধর্ম্ম, সমাজ বা সাহিত্য-সংস্কার মাতৃভাষা ভিন্ন পরকীয ভাষায অদ্যাবধি সংঘটিত হয নাই। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যদেব, মহম্মদ বা ঈশা, লুথার বা ওযেসলি জনসাধারণের ভাষায, মাতৃভাষায ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিযাছিলেন। অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভেই আপনার ভ্রম দেখিতে পাইলেন; এবং তখন মধুসূদনের ন্যায অনুতপ্ত হৃদযে মাতৃভাষার সেবায আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতিভা নিযোজিত করিলেন। তিনিও হযত মধুসূদন দত্তের ন্যায ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন :—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসনিচয যখন একে একে প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন শিক্ষিত সমাজ কি রূপে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে তাহা ব্যক্ত করিযাছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"যখন স্কুল কলেজে পড়িতাম, তখন * * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজিওযালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে, যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত। * * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ আদর, তখন বঙ্কিম বাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি। এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বই লেখা কেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু আমি ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা পড়িয়াছিল। দিন কতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু আরও একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ

দুই চারিটা ভাষার ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্ত প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। * * * তখন দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও কপাল-কুণ্ডলা কিনিয়া পড়িলাম। তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বঙ্গদর্শনের গ্রাহক হইলাম। বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শনের প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন, 'ঐ আবার কুন্দনন্দিনী একটা কি বাহির হইতেছে'।"*

তিন যুগের কথাই একে এক বিবৃত হইল। প্রথম রামমোহন রায়ের যুগ, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগরের যুগ, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। এটা মোটামুটী কথা। আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইবে যে, রামামাহন-যুগের প্রারম্ভকাল হইতে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রারম্ভকাল হইতে বিদ্যাসাগর-যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অনুবাদের যুগ; বিদ্যাসাগর-যুগেব শেষাংশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-যুগের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অনুকরণের যুগ; বঙ্কিমচন্দ্র-যুগের শেষাংশ সৃষ্টির যুগ। অনুবাদ-যুগের স্মৃতি-চিহ্ন, চরিতাবলী ও বেতাল পঞ্চবিংশতি; অনুকরণ-যুগের দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা; সৃষ্টিযুগের আনন্দ-মঠ ও সীতারাম। উদাহরণ অধিক না দিয়া ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র এই সৃষ্টি-যুগের প্রবর্ত্তক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক শিষ্যও ছিলেন। বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় এতদ্‌সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম;—

"সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভা। সঞ্জীব বাবু, বঙ্কিম-রবি প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথবাবুর 'শকুন্তলাতত্ত্ব', বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্বোধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখর বাবুর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তদপ্তরের একখানি মাত্র কাগজ পরিবর্দ্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটি সুরমাত্র গীতপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয় বাবু "বঙ্গদর্শনে", "নব জীবনে", "সাধারণীতে" বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শিষ্য। রবীন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর সহজ চলিত ভাষা আরও সহজ করিয়া, লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিম বাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশ বাবুর 'বঙ্গবিজেতা' বঙ্কিম বাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্র বাবুর আর্য্যদর্শন বঙ্গদর্শনের অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য-জীবনের প্রবৃত্তি বা জন্মদাতা, তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি।"

* প্রদীপ।

দেখিতে পাইতেছি আজ নয়, বিগত চল্লিশ বৎসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকীয় প্রভাব বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতেছি; চল্লিশ বৎসর বঙ্গসাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কাহারও ছায়া নাই, আর কাহারও পদাঙ্ক নাই, আর কাহারও প্রভাব নাই। অনুবাদ ও অনুকরণ যুগের গদ্য-সাহিত্যিক-রথীদের জ্যোতি ম্লান হইয়া গিয়াছে, প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে, আদর্শ অনাদৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে একমাত্র জ্যোতিঃ, একমাত্র আদর্শ, সাহিত্যাকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"ভাবসম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদ-রূপে গণ্য করিতে শিখি নাই। সাহিত্য-রস যে আমাদের জীবনে খাদ্য পানীয়ের ন্যায় অত্যাবশ্যক তাহা এখনও আমরা সম্যক্ অনুভব করি না। বঙ্কিম বাবুর সৃজনী শক্তি মাতৃভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনের মজ্জার মধ্যে যে প্রবেশ করিয়াছে, বঙ্কিমের প্রতিভা-উৎসের ভাবপ্রস্রবণ হইতে বাঙ্গালী যে নূতন জীবন-রস প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল বঙ্কিমের আবির্ভাবের পরে বাঙ্গালীর জীবনের গঠন যে তদপেক্ষা এক নূতন বৈচিত্র্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহা এখনও আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

"সৌভাগ্যক্রমে আমরা বাল্যকালে বাঙ্গলাভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। স্বল্প ইংরাজি যাহা শিখি তাহার মধ্য হইতে হৃদয়ের পোষণযোগ্য তৃপ্তিজনক কোন রস আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ তৃষ্ণা যথেষ্ট ছিল। কৃত্তিবাস, কাশিরাম দাস, একত্র বাঁধানো বিবিধার্থ সংগ্রহ, আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, বাঙ্গালা রবিন্‌সন্ ক্রুশো, সুশীলার উপাখ্যান, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনচরিত, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি তখনকার কালের গ্রন্থগুলি বিস্তর পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বাঙ্গলা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প ছিল, এবং বালকদিগের পাঠের অযোগ্য গ্রন্থ অনেক বাহির হইত। এবং আমরা অপরিতৃপ্ত আগ্রহের সহিত ভালমন্দ সকল গ্রন্থই নির্ব্বিচারে পাঠ করিতাম। তরুণ হৃদয়ের সেই স্বাভাবিক ক্ষুধা উদ্রেকের সময় বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন যে নূতন আস্বাদ, নূতন আনন্দ, নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলাম তাহা কোনও কালে ভুলিতে পারিব না।

"তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ মনে নাই। যে টুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। * *

"আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্য-ভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

"কিন্তু আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় ; * * তখন বঙ্গ-সাহিত্যেরও যেরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদেরও হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।" *

আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজস্বরে ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন করিবার উপযোগী; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কালাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" *

আর এক স্থানে রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীর যে কি মহৎ, কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়, তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।" *

ভরসা আছে, সে দুর্ভাগ্য আজও আমাদের উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যতটা ঋণী, এতটা আর কাহারও নহে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সর্ব্বোচ্চ।

বঙ্গদর্শন

১২৭৭ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে ১২৭৮ সালের শেষভাগে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বিজ্ঞাপনে কয়েক জন লেখকের নাম ছিল, যথা,—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ জগদীশ নাথ রায়।
„ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

* সাধনা।

শ্রীযুক্ত রামদাস সেন।

এবং „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১২৭৯ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ছাপা হইতে লাগিল, ভবানীপুরের সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে। প্রকাশক হইলেন, খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু।

প্রথম সংখ্যা এক সহস্র ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে সাতটি প্রবন্ধ ছিল, যথা,—

(১) পত্র সূচনা। (২) ভারত-কলঙ্ক। (৩) কামিনী কুসুম। (৪) বিষবৃক্ষ। (৫) আমরা বড লোক। (৬) সঙ্গীত। (৭) ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল।

এই সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি লিখিলেন। পত্র-সূচনাটি অতি সুন্দর, নিম্নে প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনা-পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব ?

"ইংরাজি-ভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ী লোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহিপড়া আর নিমন্ত্রণ রাখিবার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছে আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

"লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং লেক্‌চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতে হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা

হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

* * * *

"এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিমাণ ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল; নিয়মবলে বিলীন হইবে, অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

চারি বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি শেষ সংখ্যায় শেষ পাতায় লিখিলেন :—

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্র-সূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবাব প্রয়োজন নাই।

"এ সম্বাদে কেহ সন্তুষ্ট কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। যদি কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমি এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, আমি এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।

"বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না।

"চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সে জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

প্রথম বৎসর বঙ্গদর্শন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়; তার পর ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শন আফিস কাঁটালপাড়ায় উঠিয়া যায় এবং তথা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২৮২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পরিচালিত হয়। ১২৮৪ সাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯০ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে

দিলাম।

(১) বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সালের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ঐ সালের চৈত্রে শেষ হয়।

(২) ইন্দিরা—১২৭৯ সালের চৈত্র।

(৩) যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সালের বৈশাখ।

(৪) চন্দ্রশেখর—১২৮০ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮১ সালের ভাদ্রে শেষ হয়।

(৫) কমলাকান্ত—১২৮০ সালের ভাদ্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের বৈশাখে শেষ হয়।

(৬) রজনী—১২৮১ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণে শেষ হয়।

(৭) রাধারাণী—১২৮২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

(৮) কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৮৪ সালের মাঘে শেষ হয়।

(৯) কমলাকান্তের পত্র—১২৮৪ সালের পৌষ, ফাল্গুন ও ১২৮৫ সালের শ্রাবণ।

(১০) রাজসিংহ—১২৮৪ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই।

(১১) মুচীরাম গুড়ের জীবন-চরিত—১২৮৮ সালের আশ্বিন।

(১২) আনন্দমঠ—১২৮৭ সালের চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮৮ সালে শেষ।

(১৩) দেবী চৌধুরাণী—১২৮৯ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, বঙ্গদর্শনে আর সম্পূর্ণ হয় নাই।

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় এক হাজার হইয়াছিল। শ্রাবণে বাড়িয়া প্রায় দেড় হাজার হয়। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া প্রায় দুই হাজার গ্রাহক হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে গ্রাহক-সংখ্যা কমিয়া কিঞ্চিদধিক ষোল শত হয়।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়। একটি, আত্মীয়-বিরোধ দ্বিতীয়টী, প্রবন্ধ-লেখকদের দক্ষিণার দাবী। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যস্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ কিনিতে অসম্মত হইয়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।

বঙ্গদর্শন যে সময় প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ১২৮০ সালের কিছু পূর্ব্বে বা পরে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি বর্ত্তমান ছিল :—

আর্য্যদর্শন, বান্ধব, অবকাশ-সহচরী, বাঙ্গালী, হিতবোধ, সরোজিনী, মিত্রপ্রকাশ, সাহিত্যমুকুর, পূর্ণশশী, অবলাবান্ধব, কুমুদিনী, আর্য্যপ্রবর, বামাবোধিনীপত্রিকা, ভ্রমর, বসন্তক, হালিসহর-পত্রিকা, বঙ্গমিহির, হেমলতা, কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা, হিন্দুবিলাস, হিন্দুদর্শন, বিশ্বদর্শন, মাসিক প্রকাশিকা, তমলুক-পত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ,

সহোদর ইত্যাদি।

এতগুলি কাগজের মধ্যে স্থধু বামাবোধিনী পত্রিকা আজও জীবিত আছে।

বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে মনস্বী গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বঙ্গদর্শনে "প্রকাশ্যভাবে গ্রন্থাদির যে সমালোচনা হইত, তাহাতে প্রশংসার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। আর যাহারা অনুপযুক্ত তাহারা বাধ্য হইয়া আপনাদিগের দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উপযুক্ত পথগ্রহণে প্রবৃত্ত হইত। আমার বোধ হয় এই দুইখানি পত্রিকা, বিশেষতঃ বঙ্গদর্শন, যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল ও যে শক্তি প্রয়োগ করিত, তাহা পূর্ব্বকালের রাজশক্তিরই বুঝি অনুরূপ ছিল। সকলেই বঙ্গদর্শন-সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত, তিনি যে গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিতেন, রাশি রাশি পাঠক তাহা অবিলম্বে ক্রয় করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং গ্রন্থকারকে পরোক্ষভাবে প্রোৎসাহিত করিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক যে গ্রন্থের নিন্দা করিতেন, সে গ্রন্থ বড় কেহ কিনিত না। পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে তাহা কীটদষ্ট হইয়া জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। বড় সহজ কি এই শক্তি? কিন্তু একদিন বঙ্গদর্শন তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বকীয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গবেষণা প্রভাবে, সর্ব্বোপরি পক্ষপাতশূন্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনাবশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন সাহিত্য-জগতে এইরূপই রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিল।" *

বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অতি অল্প কথায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষার বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। বঙ্গদর্শন বলিয়া গিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।" * *

পুস্তকাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয়ের নাম সকলেই জানেন; কিন্তু কোন্ কোন্ গ্রন্থ কোন্ কোন্ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন না। আমি নিম্নে একটি তালিকা দিলাম। তাহাতে কোন্ কোন্ সংস্করণ কোন্ কোন্ তারিখে প্রকাশিত

* নব্যভারত, পঞ্চদশ খণ্ড।

** প্রদীপ,—১৩০৫।

হইয়াছিল, তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে যত্নবান্ হইলাম। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তালিকা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সকল সংস্করণের তারিখ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। পুরাতন পুস্তকও কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে একে একে পরিচয় দিলাম।

১। দুর্গেশনন্দিনী—প্রথম সংস্করণ—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় সংস্করণ—৩রা মে, ১৮৬৯। পঞ্চম সংস্করণ—১৫ই জুলাই, ১৮৭৪। ষষ্ঠ সংস্করণ—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই সহস্র। সপ্তম সংস্করণ—১লা অক্টোবর, ১৮৭৯—ছাপা হইল, পনর শত। নবম সংস্করণ—১০ই জুন, ১৮৮৩। একাদশ সংস্করণ—১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৮।

২। কপালকুণ্ডলা—প্রথম সং—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। দ্বিতীয় সং—১৫ই এপ্রেল ১৮৭০। তৃতীয় সং—১৫ই আগষ্ট, ১৮৭৪। চতুর্থ সং—১০ই মে, ১৮৭৮। পঞ্চম সং—২৮এ জুন, ১৮৮১। সপ্তম সং—২৫এ ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

৩। মৃণালিনী—প্রথম সং—১০ই নবেম্বর, ১৮৬৯। তৃতীয়—২২এ নবেম্বর, ১৮৭৪। চতুর্থ সং—২০এ জুন ১৮৭৮। পঞ্চম সং—২৮এ জুলাই, ১৮৮০। ছাপা হইল পাঁচ শত। ষষ্ঠ সং—১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১। সপ্তম সং—২৯ এ আগষ্ট, ১৮৮৩।

৪। বিষবৃক্ষ—প্রথম সং—১লা জুন, ১৮৭৩। দ্বিতীয় সং—২৯ এ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫। তৃতীয় সং—জুন ১৮৮০। চতুর্থ সং—১২৮৮ বঙ্গাব্দ। ষষ্ঠ সং—৭ঠা এপ্রেল, ১৮৮৭। সপ্তম সং—২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৮৯০।

৫। লোকরহস্য—প্রথম সং—২৬এ নবেম্বর, ১৮৭৪।

৬। বিজ্ঞানরহস্য—প্রথম সং—১৯এ এপ্রেল ১৮৭৫।

৭। ইন্দিরা—প্রথম সং—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ। চতুর্থ সং—৬ই জুন, ১৮৮৬। পঞ্চম সং—৩০এ জুলাই, ১৮৯৩। [বর্ত্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

৮। যুগলাঙ্গুরীয়—প্রথম সং—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ। চতুর্থ সং—২৫ জুন, পঞ্চম সং—২৬এ মে, ১৮৯৩।

৯। রাধারাণী—প্রথম সং—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় সং—১৫ই জুন, ১৮৮৬। চতুর্থ—২৬এ মে, ১৮৯৩।

১০। চন্দ্রশেখর—প্রথম সং—১লা জুন, ১৮৭৫। দ্বিতীয় সং—১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৪।

১১। কমলাকান্তের দপ্তর—প্রথম সং—২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬—ছাপা হইল, দুই হাজার।

[কমলাকান্ত নাম দিয়া একটা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়।]

দ্বিতীয় সং—২৭এ জুলাই, ১৮৯১।

[ঢেঁকি নামধেয় একটা নূতন প্রবন্ধ ইহাতে সংযোজিত হয়]

১২। বিবিধ সমালোচন—প্রথম সং—১৯এ জুলাই ১৮৭৬। ছাপা হইল, পাঁচ শত।

১৩। রজনী—প্রথম সং—২রা জুন, ১৮৭৭। দ্বিতীয় সং—২৬এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।

১৪। উপকথা—(অর্থাৎ ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী) প্রথম সং—২৪এ নবেম্বর, ১৮৭৭। দ্বিতীয় সং—ডিসেম্বর, ১৮৮১।

[রেজিষ্টারির তারিখ ১৯এ জানুযারি ১৮৮২]

১৫। কবিতা-পুস্তক—প্রথম সং—৮ই অগষ্ট, ১৮৭৮। দ্বিতীয় সং—১লা অক্টোবর, ১৮৯১।

[নামান্তরিত হইযা 'গদ্য-পদ্য বা কবিতা-পুস্তক' হইল] ছাপা হইল, পাঁচ শত।

১৬। কৃষ্ণকান্তের উইল—প্রথম সং—২৯এ অগষ্ট ১৮৭৮। দ্বিতীয় সং—১৮৮২। চতুর্থ সং—৩০এ নবেম্বর, ১৮৯২।

১৭। প্রবন্ধ-পুস্তক—প্রথম সং—২৭এ এপ্রেল, ১৮৭৯।

[১১টি প্রবন্ধ]—ছাপা হইল, পাঁচ শত।

১৮। রাজসিংহ—প্রথম সং—৪ঠা ফেব্রুযারি, ১৮৮২। চতুর্থ সং—১০ই অগষ্ট, ১৮৯৩।

[বর্তমান আকারে পরিবর্দ্ধিত]

১৯। আনন্দমঠ—প্রথম সং—১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২। দ্বিতীয় সং—২০এ জুলাই, ১৮৮৩। তৃতীয় সং—১৫ই এপ্রেল ১৮৮৬। চতুর্থ সং—২০এ ডিসেম্বর, ১৮৮৬। ছাপা হইল দুই সহস্র। পঞ্চম সং—২১এ নবেম্বর, ১৮৯২।

২০। দেবী চৌধুরাণী—প্রথম সং—২০এ মে, ১৮৮৪। চতুর্থ সং—২৬এ জানুযারি, ১৮৮৭।

[এই সংস্করণটা তৃতীয় কি চতুর্থ, তাহা ঠিক বলিতে পারি না]

পঞ্চম সং—২৫এ ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

২১। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—প্রথম সং—১৮৮৪।

২২। কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম সং—১২ই অগষ্ট, ১৮৮৬। দ্বিতীয় সং—১১ই অগষ্ট, ১৮৯২।

২৩। সীতারাম—প্রথম সং—৪ঠা মার্চ, ১৮৮৭। দ্বিতীয় সং—৩১এ ডিসেম্বর, ১৮৮৭।

২৪। বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম সং—৭ই জুলাই, ১৮৮৭। দ্বিতীয় সং—২৫এ মে, ১৮৯২—ছাপা হইল পাঁচ শত।

২৫। ধর্ম্মতত্ত্ব—প্রথম সং—১৭ই মে, ১৮৮৮। ছাপা হইল দুই সহস্র।

২৬। Bengali Selections [for the Entrance Examination,

1895.] প্রথম সং—১৭ই জানুয়ারি, ১৮৯২। ছাপা হইল পঁচিশ শত।

২৭। সঞ্জীবনী-সুধা—প্রথম সং—৩১এ মে, ১৮৯৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর উপরি-উক্ত পুস্তকাদির যে সকল সংস্করণ হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বিবেচনা করিলাম না।

যে সকল স্থলে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করি নাই সে সকল স্থলে এক সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অনুদিত পুস্তকের তালিকা

(১) কপালকুণ্ডলা—এইচ, এ, ডি, ফিলিপস্ কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অনুদিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসার ক্লেম কর্ত্তৃক জর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হয়।

(২) বিষবৃক্ষ—Poison Tree নাম দিয়া শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৩) কৃষ্ণকান্তের উইল—উপরি-উক্ত মহিলা কর্ত্তৃক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৪) দুর্গেশনন্দিনী—বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

(৫) যুগলাঙ্গুরীয়—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়। [রাখাল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা]

(৬) চন্দ্রশেখর—সন্তোষের জমিদার সুপণ্ডিত বাবু মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

(৭) আনন্দমঠ—বাবু নরেশচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দুইখানি পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। একখানি বিষবৃক্ষের অংশ বিশেষ, অপর খানি দেবীচৌধুরাণী। প্রথম খানি লাট-মহিষীকে দিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়খানি নাকি অপহৃত হইয়াছে। একখানি পুস্তকাকারে বাঁধান খাতায় বঙ্কিমচন্দ্র অতি যত্নের সহিত অনুবাদটি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। যে খাতায় তিনি খসড়া করিয়াছিলেন, সে খাতা আজও আছে। কিন্তু ভাল খাতাখানি খোয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র—বিশ্লেষণ

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হয়; যথা—

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র;
কবি বঙ্কিমচন্দ্র,
ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র,
ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র;
স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র;
সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র, এবং
ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

আমি অতি সংক্ষেপে সকল বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়া যাইব।

সমাজ সংস্কারক

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উদ্যম—বিষবৃক্ষ; দ্বিতীয় উদ্যম—সাম্য ও লোকরহস্য; তৃতীয় উদ্যম—দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ ও কমলাকান্তের কয়েকটী প্রবন্ধ।

সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের বিশেষ কোন উপকার করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা, বহু-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, সকল বিষয়েই তিনি কিছু না কিছু বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কোনও বিষয়েই তাঁহার হৃদয় পূর্ণভাবে ছিল না। তিনি সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমাজের জন্য কখনও চোখের জল ফেলেন নাই। ফেলিলেও যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। অচল ভূধর তুল্য হিন্দুসমাজকে কেহ যে একদিনে নাড়াইতে পারিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রোদনেও দেশে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইল না। তবে মহাপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একদিন না একদিন ফল প্রদান করিবে।

সমাজ-সংস্কারক ও ভাবময় বঙ্কিম

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই এক স্থানে সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বিষবৃক্ষ হইতে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

সূর্য্যমুখী আদর্শ-স্ত্রী অথবা Westernised রমণী কি না, তাহা জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু দেখিব, সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসে কি না—সে নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ যোগ্য কি না। দেখিলাম, সূর্য্যমুখী

প্রেমময়ী। সে প্রেমে একটু আধটু স্বার্থ থাকিতে পারে, কিন্তু সে প্রেম অনন্ত—সে প্রেম গভীর। সূর্য্যমুখীর রূপ আছে, গুণ আছে, প্রেম আছে,—সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভালবাসার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী।

এমন সময় কুন্দনন্দিনী তাহার অতুলনীয় রূপরাশি লইয়া নগেন্দ্রনাথের সংসারে আসিল। সূর্য্যমুখীর চেয়েও কুন্দ সুন্দরী; কেন না, সূর্য্যমুখীর বয়স ছাব্বিশ, কুন্দর বয়স তের। নগেন্দ্রের মতে তের বৎসরই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের সময়। রূপ-প্রিয় কামান্ধ নগেন্দ্রনাথ তের বছরের কুন্দকে পাইয়া ছাব্বিশ বছরের সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

না ভুলিলে সমাজ-সংস্কারক বিধবা-বিবাহ সংঘটন করিতে পারেন না—না ভুলিলে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ড উদ্যত করিতে পারেন না। নগেন্দ্রনাথ ভুলিলেন—কুন্দর রূপ দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলিলেন।

কুন্দ উপযুক্ত পাত্রীও বটে। যে অবস্থায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে, কুন্দতে সে অবস্থা সম্যক্ বর্ত্তমান। বহুবিবাহ যদি কোনও অবস্থায় মার্জ্জনীয় হওয়া সম্ভব হয়, তবে নগেন্দ্রনাথের উন্মত্তাবস্থায় মার্জ্জনীয় হইতে পারে। অবস্থাটি বেশ করিয়া সৃষ্টি করিয়া সংস্কারক পাত্রীকেও বেশ করিয়া সাজাইলেন। তাহাকে রূপ, যৌবন, গুণ, নগেন্দ্রনাথের প্রতি অতুল ভালবাসা দিয়া মনোমত করিয়া গড়িলেন। অবশেষে বালবিধবার বিবাহ ঘটাইলেন।

বিবাহ দিয়া সংস্কারক একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "দেখ, আমি কেমন বিধবার বিবাহ দিয়াছি। নগেন্দ্র ও কুন্দ কত সুখী! একটা বিধবাকে চিরজীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া আমি কত পুণ্য সঞ্চয় করিলাম।"

বলিয়াই সংস্কারক সমাজের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু সাবধান! নগেন্দ্রনাথের মত দুই বিবাহ করিও না। যদি কর, এক স্ত্রীকে বিনাশ করিব।"

"কা'কে বিনাশ করিবে?—কুন্দকে না সূর্য্যমুখীকে?

সংস্কারক উত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখীকে।"

"সূর্য্যমুখীর অপরাধ?"

সংস্কারক বলিলেন, "তার অপরাধ থাকুক, বা না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব না। সে বালবিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; সূর্য্যমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে চিরসুখী করিয়া সমাজকে দেখাইব, বিধবাবিবাহে অধর্ম্ম নাই, অশান্তি নাই।"

ভাবময় বঙ্কিম অমনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "সাধ্য কি তোমার তুমি সূর্য্যমুখীকে মার! সর্ব্বগুণময়ী, নিরপরাধা সূর্য্যমুখীকে যেমন করিয়া পারি, আবার ঘরে আনিব—আবার তাহাকে পাটরাণী করিব। তোমার সমাজ-সংস্কার অতলজলে ডুবিয়া যাক্—আমি সূর্য্যমুখীর নয়ন-কোণে অশ্রুকণা দেখিতে পারিব না।

সংস্কারক-ব। ছি, ছি! ভাবে বিভোর হইলে চলিবে না। সূর্য্যমুখীকে

মার—বিধবা-বিবাহের জয় পরিকীর্ত্তিত হউক—বহুবিবাহের পরিণাম জগত দেখুক।

ভাবময়-ব। যদি কাহাকেও মরিতে হয়, তবে কুন্দ মরুক, ইন্দ্রাণীতুল্যা সূর্য্যমুখীকে—নগেন্দ্রনাথের জীবন-সঙ্গিনী সূর্য্যমুখীকে—কিছুতেই মারিতে দিব না।

সংস্কারক-ব। কুন্দ কিরূপে মরিবে?

ভাবময়-ব। বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করুক।

সংস্কারক-ব। সূর্য্যমুখী কেন আত্মহত্যা করুক না?

ভাবময়-ব। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী, জীবনসঙ্গিনী, সে আত্মহত্যা করিয়া পাপ অর্জ্জন করিতে পারে না।

সংস্কারক-ব। কুন্দই কি আত্মহত্যা করিতে পাবে?

ভাবময় ব। পাবে, য নবযৌবনে বিধবা হইয়া,—হিন্দু রমণীব আজন্মপুষ্ট সংস্কার লইয়া, প্রথম স্বামীর সাহচর্য্য ও অনুরাগ স্বল্পকালমধ্যে বিস্মৃত হইয়া, ভালবাসার খাতিরে সংযম হারাইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পাবে, সে আত্মহত্যা করিয়া দ্বিতীয় পাপও অর্জ্জন করিতে পারে।

সংস্কারক-ব। গোড়ায় কি মতলব ছিল, ভুলে গেলে? বিধবাকে গড়িলে বিবাহ দিতে—সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করিতে, এখন এ কি করিতেছ?

ভাবময়-ব। মতলব, উদ্দেশ্য রসাতলে যাউক, আমি সূর্য্যমুখীর প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না।

আমরা পরিণাম দেখিলাম—ভাবময় বঙ্কিমের কত প্রবল শক্তি তাহাও দেখিলাম। সংস্কারক চিরদিন ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে পরাজিত।

কবি বঙ্কিম

ছন্দ মিলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র খুব কম কবিতাই লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই বাল্যকালে। কিন্তু ছন্দ মিলাইতে পারিলেই যে কবি হয়, এমন কোন কথা নাই। কবিত্ব,—চিত্র বা চরিত্র-অঙ্কনে,—কবিত্ব, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে। আমরা সেই দর্পণানুরূপ বারুণী পুষ্করিণী চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। 'ভোমরার' সেই কালরূপ—সে অভিমানভরা সরলতা—সে গর্ব্ব, সে পতিভক্তি দুইটি কথায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ভ্রমর লিখিয়াছেন, "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি।" ভ্রমর বলিয়াছে,—"তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস।" এইখানেই ভ্রমরের চিত্র সম্পূর্ণ হইল।

প্রফুল্ল বলিল, "আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান-বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না।"

এই একটি কথায় প্রফুল্লের প্রকৃতি আমরা বুঝিতে পারিলাম।

সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া আশ্রয়হীন নবকুমার দেখিলেন, "ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনই ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন; আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র,

সর্ব্বত্র নীরব, কেবল কল্লোলিত সমুদ্র-গর্জ্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুরব।" এই স্বভাবানুকারিণী সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই প্রকৃত কবিত্ব। প্রকৃতির ছায়া নবকুমারের হৃদয়ে—নবকুমারের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রকৃতির বুকে।

'পুষ্প-নাটকে' যুঁই বারিকণার অন্তর্দ্ধানে কাতর হইয়া বলিতেছে, "হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময় জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা? একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুখিলে প্রাণাধিক? হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না? কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প-দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—"

আকুল বাসনার এ চিত্র কি সুন্দর! যিনি এমন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত কবি।

ঔপন্যাসিক ও ভাবময় বঙ্কিম

পূর্ব্বে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে কিরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার দেখান উদ্দেশ্য, ঔপন্যাসিকের সহিত ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ সঙ্ঘর্ষণ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসনিচয়ে কোনও plot নাই, বা তাঁহার উপন্যাস Idealistic—Realistic নহে, এসব গুরুতর কথায় আমার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সুধু দ্বন্দ্বটুকু দেখাইব। দ্বন্দ্ব দেখাইতে হইলে পুস্তকবিশেষের সমালোচনা আবশ্যক। যত সংক্ষেপে সারিতে পারি, চেষ্টা করিব।

উপস্থিত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারামে'র সমালোচনা করিয়া দ্বন্দ্বটুকু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

গ্রন্থখানির প্রথমাংশ পড়িলেই বুঝা যায়, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য, সীতারামকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট করা। কিন্তু সীতারাম কোন্ অপরাধে রাজ্যভ্রষ্ট হইবে? সে বীর, স্বদেশপ্রেমিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, সত্যাশ্রয়ী, পরোপকারী—সে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না। জগতে কেবল একটি মাত্র পাপ আছে, সে জন্য মনুষ্য রাজ্যভ্রষ্ট, লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইতে পারে। সে পাপটি—রমণীর প্রতি অত্যাচার। ঔপন্যাসিক তাহা বুঝিলেন; বুঝিয়া জয়ন্তীর সৃষ্টি করিলেন।

জয়ন্তী, সীতারামের রূপযৌবনশালিনী অপ্রাপ্যা স্ত্রীর সহচরীরূপে আসিল সেই স্ত্রী যখন অন্তর্হিতা, তখন সহচরী ধরা পড়িল। উন্মত্ত সীতারাম তাহাকে টানিয়া আনিয়া শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ উন্মত্ততা মার্জ্জনীয়, কিন্তু অমানুষিক দণ্ডবিধান মার্জ্জনীয় নহে। স্ত্রীর জন্য আমি উন্মত্ত হইতে পারি, কিন্তু রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে পারি না।

এ অত্যাচার না হইলে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইতে পারে না; সুতরাং সীতারামের দ্বারা এ অত্যাচার করাইতেই হইবে। সীতারাম সিংহাসনে বসিয়া

জয়ন্তীকে মঞ্চোপরি দাঁড় করাইলেন; এবং মেঘগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডালকে আদেশ করিলেন, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

চৌত্রিশ শত বর্ষ পূর্ব্বে দুর্য্যোধনও এইরকম একটা আদেশ দিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ সভাতলে দাঁড়াইয়া আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত দুর্য্যোধন আদেশ করিয়াছিলেন, "যাজ্ঞসেনীকে বিবস্ত্রা কর।" যে মুহূর্ত্তে এই আদেশবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে কৌরবরাজ্য ধ্বংস সূচিত হইয়াছিল।

ব্যাসদেবের আগে মহাকবি বাল্মীকিও দেখাইয়া গিয়াছেন, রমণীর প্রতি অত্যাচার না হইলে রাবণ বিনষ্ট হইতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে রাবণ সীতার কেশাকর্ষণ করিযাছিল, সেই মুহূর্ত্তে চিরজাগ্রত সনাতন ধর্ম্ম মেঘমন্দ্ররবে গর্জ্জিয়া বলিল, "রাবণ এতদিনে তোমার ধ্বংসের সূচনা হইল।"

সেই গর্জ্জন বিশ্বময় আজও ধ্বনিত হইতেছে—সেই সনাতন সত্য আজও জাগ্রত রহিয়াছে। সেই গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি—"সীতারাম।" এই সীতারামই রাবণ, এই সীতারামই দুর্য্যোধন। সীতারাম তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়া আদেশ করিলেন, —"কাপড কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

ঔপন্যাসিক বেশ সাজাইলেন; সীতারামের মুখ দিয়া উপযুক্ত দণ্ডাদেশ বাহির হইল। কথাটা পাছে আমরা না বুঝি, তাই ঔপন্যাসিক আমাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেন,—যে কাজ সীতারামের তুল্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নৃপতি সমাধান করিতে আদেশ করিতেছেন, সে কাজ একজন নীচজাতীয় চণ্ডাল সম্পন্ন করিতে অসম্মত। উভয়ের কথাগুলি নিম্নে তুলিয়া দিলাম:—

"—তখন চণ্ডাল পুনরপি রাজাজ্ঞা পাইয়া আবার বেত উঠাইয়া লইল—বেত উঁচু করিল—জয়ন্তীর মুখ প্রতি চাহিয়া দেখিল; বেত নামাইয়া রাজার পানে চাহিল —আবার জয়ন্তীর পানে চাহিল—শেষ বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'কি।' বলিয়া রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিলেন।

চণ্ডাল বলিল, 'মহারাজ! আমা হইতে হইবে না।'

রাজা বলিলেন, 'তোমাকে শূলে যাইতে হইবে।'

চণ্ডাল যোড়হাত করিয়া বলিল, 'মহারাজের হুকুমে তা' পারিব; এ পারিব না।'

ঔপন্যাসিকের অসামান্য কৌশল দেখিলাম। সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য এত আয়োজন। যে কাজ চণ্ডাল, চণ্ডাল হইয়াও করিতে পারিল না—সে কাজ সীতারাম, হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াও করিতে সমুদ্যত। সীতারাম দেখিলেন, কোন হিন্দু জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিবে না। তখন তিনি এক জন মুসলমান আনিতে আদেশ করিলেন। এখানে ঔপন্যাসিকের কার্য্য অতি চমৎকার; কোথাও ভুল নাই, ত্রুটী নাই,—সব ঠিক, জয়ন্তীর আর রক্ষা নাই। চন্দ্রচূড় গ্যান

খাইয়া পলাইয়াছেন—চণ্ডাল পলাইয়াছে। এবার নৃশংস কশাই আসিয়া বলিতেছে, "কাপ ড়া উতার।"

জয়ন্তী সীতারামকে বন্য পশু বলিয়া গালি দিল।

সীতারাম আরও ক্রুদ্ধ হইযা কশাইকে আদেশ করিলেন, "জবরদস্তী কাপড়া উতার লেও।"

উপায়বিহীনা জয়ন্তী তখন জগন্নাথকে ডাকিতে লাগিল। কশাই কাপড ধরিযা টানাটানি করিতে লাগিল। ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী চীৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ, এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।"

এ পর্য্যন্ত সব ঠিক—ঔপন্যাসিকেব কোন ক্রটী নাই। তার পর সব গোল হইয়া গেল। কশাইয়ের এক হাতে উদ্যত বেত্রদণ্ড, অপর হস্তে জয়ন্তীর বস্ত্রাঞ্চল। নিরুপায় জয়ন্তী পশুবৎ সীতারামেব সম্মুখে মঞ্চোপরি বসিযা অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। জয়ন্তীর আর নিস্তার নাই। এমন সময ভাবময বঙ্কিমচন্দ্র কোথা হইতে ছুটিযা আসিযা সকাতরে বলিলেন, "এ কি, সন্ন্যাসিনীর উপর—রমণীর উপর অত্যাচার। কোথায আছ নন্দা?—কোথায আছ সীতারামের সহধর্ম্মিণী? ছুটে এস—জয়ন্তীকে রক্ষা কর।"

ভাবময বঙ্কিমের আহ্বানে নন্দা অমনি ছুটিযা আসিল, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এতকাল ধরিয়া যে কার্য্য করিযা আসিতেছিলেন, ভাবময় বঙ্কিম মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা নষ্ট করিয়া দিলেন। ঔপন্যাসিক তবু একটু যুঝিযাছিলেন; বলিযাছিলেন, "মহারাণি, তোমার ঠাঁই অন্তঃপুরে, এখানে নয। অন্তঃপুরে যাও।"

ভাবময় বঙ্কিম সে কথা গ্রাহ্য না করিযা সীতাবামের প্রতিনিধি কশাইযের উপর 'মার' 'মাব' শব্দে পড়িলেন। ঔপন্যাসিক আর কি করিবেন? তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন; তার পর ভাবময বঙ্কিম একটু শান্ত হইলে বলিলেন, "তুমি এ কি করিলে? জয়ন্তীকে রক্ষা করিয়া যে সব নষ্ট করিলে। আমি কেমন করিয়া তবে সীতাবামের রাজ্য ধ্বংস করিব?"

ভাবময-ব। সংসারে কি জয়ন্তী ছাডা আর স্ত্রীলোক নাই?

ঔপন্যাসিক-ব। সহস্র সহস্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে সব পতঙ্গ মাত্র। মহাকবি বাল্মীকিও তাই ভাবিয়াছিলেন, নতুবা রাবণ ধ্বংসের নিমিত্ত জনক-নন্দিনীর সৃষ্টি করিতেন না।

ভাবময়-ব। তা' তুমি যা' হয় কর—আমি জয়ন্তীকে ছাড়িয়া দিব না।

নিরুপায ঔপন্যাসিক তখন ফুটা কলসীর তলায় গালা আঁটিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—সুন্দরী সাধ্বী রমণীবৃন্দকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া সীতারামের চিত্তবিশ্রামে ফেলিতে লাগিলেন। কিন্তু ফুটা কলসীর ছিদ্র বন্ধ হইল না। মহাশক্তিশালী ঔপন্যাসিকও তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি গালার উপর এক স্তর মাটী লাগাইলেন, এবং সতীত্ব-অপহৃতা ভানুমতী সাজিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আজ

জানিলে বোধ হয় যে, সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ—ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি তার প্রতিফল নাই?"

ফুটা কলসী সারিতে ঔপন্যাসিককে এইরূপে আয়োজন করিতে হইয়াছিল কিন্তু সারিতে পারেন নাই; "সীতারামের" ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমরা যদি সীতারামকে সর্ব্বগুণের আধার দেখিতাম—ক্রোধী ও প্রজাপীড়ক না দেখিতাম—উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র ও পত্নীপীড়ক না দেখিতাম, শুধু একটি পাপে কলঙ্কিত দেখিতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম, ঔপন্যাসিকের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সে একটি পাপ জয়ন্তীর উপর অত্যাচার। যে সর্ব্বগুণের আধার, সে কি রমণীর উপর অত্যাচার করিতে পারে? পারে—স্ত্রীর জন্য পারে। সীতারাম সেই অত্যাচার করুক—সিংহাসনে বসিয়া জয়ন্তীকে বিবসনা করিয়া বেত্রাঘাত করুক; আমরা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন সীতারাম কেন রাজ্যভ্রষ্ট হইল।

দশানন ও দুর্য্যোধন প্রজাপীড়ক ছিলেন না—স্ত্রী ধরিয়া আনিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতেন না। তাঁহারা রাজকীয় গুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তবু তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন কেন? একটি পাপের জন্য।

সীতারাম সে পাপটি করিল না, অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইল। এইখানেই ঔপন্যাসিকত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। বিনাশ কে করিল? ভাবময় বঙ্কিম।

স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিম

একটি কথায় বুঝিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীমাত্রকেই ভালবাসিতেন। কথাটি মূল্যবান্—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" *

বঙ্কিমচন্দ্র কি স্বদেশকে ভালবাসিতেন? তাঁহার স্বদেশপ্রীতি কি প্রকৃতই আন্তরিক? এ কথার উত্তর "আনন্দমঠে"র ছত্রে ছত্রে লিখিত রহিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক-প্রবেশের পথমাত্রশূন্য, নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

বাঙ্গালার অন্ধকারময় অরণ্য, আকাশ প্লাবিত করিয়া উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

"ভক্তি।"

এ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবহমান; নতুবা তিনি গায়িতে পারিতেন না,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

---

* সীতারাম।

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে !"

বাঙ্গালার লতাটি পাতাটি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়। সেই লতা পাতা দিয়া সাজাইয়া তিনি তাঁহার উপাস্য দেবীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন ;-

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

কিন্তু এ ভক্তি নিষ্কাম নয়। নিষ্কাম ভক্তির কথা কমলাকান্তের মুখেও শুনিলাম না। তবে কোথায় শুনিতে পাইব? নিষ্কাম হইবার দিন বুঝি আজিও আমাদের আসে নাই। তবু কমলাকান্ত যাহা বলিতেছে, তাহা অতি সুন্দর। কমলাকান্ত বলিতেছে, "দেখিলাম অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে —অনন্ত, অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণের উদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশ দিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এই মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

অতি সুন্দর। ভক্তিতে আপ্লুত না হইলে কেহ এমনটা লিখিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র একবার কর্ম্মবীররূপে 'আনন্দমঠে' দেখা দিয়াছিলেন। আর একবার কমলা-কান্তরূপে জন্মভূমি চরণে ভক্তি, অশ্রু উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সে রূপ—সে সত্যানন্দ, সে কমলাকান্ত-রূপ অঙ্কনে আমি অসমর্থ। দেশ কালও তেমন নয়।

"বঙ্গদেশের কৃষক" "বাঙ্গালীর উৎপত্তি," "ভারত কলঙ্ক" প্রভৃতি অত্যুপাদেয় প্রবন্ধনিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের বিশেষ পরিচয় দেওয়া এক্ষণে নিরাপদ নহে। তিনি বলিতেন, যাহার স্বদেশ-প্রীতি নাই, তাহার ধর্ম্ম নাই,—মনুষ্যত্ব নাই—সে সকলের ঘৃণ্য।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র-তুল্য সমালোচক বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই সমালোচকের আসন এক্ষণে শূন্য হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কত আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—

"বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সে দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। এখনকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।" *

বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র সমালোচক ছিলেন। কখনও কাহারও খাতির রাখিয়া কথা কহিতেন না, এজন্য সময় সময় গালি খাইতে হইয়াছে—লোকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে, তবু তিনি কখন পথভ্রষ্ট হয়েন নাই। কি প্রকারে তাঁহাকে গালি খাইতে হইয়াছিল, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিব।

একখানি নাটক 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনার্থ প্রেরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই নাটকখানির কিছু তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যিনি নাটক লিখিয়াছিলেন তিনি স্থির জানিতেন যে, তাঁহার নাটকখানি অত্যুপাদেয় গ্রন্থবিশেষ। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার প্রীতিকর হইল না। যে ব্যক্তি তাঁহার নাটকখানির অপ্রশংসা করিয়াছে, তাহাকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি এক আত্মীয়ের শরণাগত হইলেন। এই আত্মীয়ের একখানি কাগজ ছিল। কাগজের নাম—'বসন্তক'। কাগজখানি দেশমধ্যে কিছু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে ভাল ভাল ছবি থাকিত। বিলাতের 'পঞ্চ' কাগজ লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া যে রকম কার্টুন (cartoon) দেয়, বসন্তকও সেই প্রকার ছবি দিয়া লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেন। বসন্তক-সম্পাদক রোরুদ্যমান আত্মীয়ের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া 'বসন্তকে' এক ছবি বাহির করিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র নাম দিয়া তিনি একটি ক্ষেত্র আঁকিলেন। সেই ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ডকায় ষণ্ড ও কয়েকটি ভেক অঙ্কিত হইল। ষাঁড়ের পার্শ্বদেশে লেখা হইল,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর একটি ক্ষুদ্র ভেকের বক্ষের উপর লিখিত হইল,—"বঙ্গদর্শন।" এইরূপে সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে কর্ত্তব্যানুরোধে গালি খাইতে হইয়াছিল।

সূক্ষ্মদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বুঝি লিখিয়াছিলেন—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একদল

* সাধনা।

লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখকসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

"মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত। এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

"ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই! তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল।" *

"উত্তর চরিত" সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, কিরূপে গ্রন্থ সমালোচনা করিতে হয়। এরূপ সমালোচনা বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় আর কখন লিখিত হয় নাই।

বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায় লিখিয়াছেন ;—

"দেশের ভিতর বঙ্কিম বাবু অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার সমালোচনা অনেক সময় অতি তীব্র হইত। কিন্তু তিনি শত্রুতা বা দ্বেষে কখন তাঁহার লেখনীকে বিষপ্রদীপ্ত করেন নাই, এবং মিত্রতাতে কখন অনুচিত প্রশংসা করেন নাই। সাহিত্যের এজলাসে বঙ্গদর্শনের চৌকিতে বসিয়া, তিনি স্বাধীন ও অপক্ষপাতভাবে রায় ফয়শালা লিখিতেন। আবার কেহ তাঁহার নিজের লেখার প্রতিকূল সমালোচনা করিলে তাহাতে তিনি চটিয়া লাল হইতেন না, বরঞ্চ বিশেষ উদারতা দেখাইতেন। প্রায় ৯ বৎসর হইল, তিনি 'সুখস্ফূর্ত্তি ও অনুশীলন' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমি 'নব্যভারতে' তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং আমার বিবেচনায় তাঁহার যে গুলি ভ্রম, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে আমার নাম প্রকাশ করি নাই, 'মীমাংসা-প্রার্থী' বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কয়েকদিন পরে আমি বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি এইবার আমার প্রতি পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে মনে করিলাম, বঙ্কিম বাবু জানেন না যে, আমি মীমাংসা-প্রার্থী নাম লইয়া তাঁহার প্রবন্ধের নিন্দা করিয়াছি। একটু কথার পর তিনি বলিলেন, "তুমিই কি মীমাংসা-প্রার্থী ?" ইহার পূর্ব্বে—'বঙ্গবাসীতে' তাঁহার রচনার কোন কোন ভাবের বিরুদ্ধে আমি তীক্ষ্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অভ্রভেদী ভূধর, অটল বঙ্কিম বাবুর স্নেহ ও অনুগ্রহ আমার প্রতি কখনও ন্যূন হয় নাই।" **

* সাধনা।

** নব্যভারত

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায়। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারগণের মধ্যে অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথম বিবেচ্য। তিনি বিস্তর কবিতা ও নাটকের প্রণেতা। বোধ হয়, আর কোনও লেখকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কোনও কোনও ভাববিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিযা বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিযা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীব সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নূতন পরিবর্ত্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধ হয় সকলের উপবে।

তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'বীরাঙ্গনা' এবং 'ব্রজাঙ্গনা'। প্রথমোক্ত দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা য়ুরোপে 'এপিক্' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ রচনা এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 'তিলোত্তমা' প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্ত সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে রামায়ণ হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিযা কৃতী হইয়াছেন, গ্রন্থের বিষয়টি সেই 'রামায়ণ' হইতেই গৃহীত—রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিন্তু দত্ত সাহেব বাল্মীকির নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঋণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবান্তর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজস্ব সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও ক্রম-পরিণতিতে দত্ত সাহেব উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলতা প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু স্থান আছে, তাহাতে বিস্তারিতভাবে কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং আমরা কবির কলাকুশলতার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে, বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও মিল্টনের নিকটও তিনি অনেক বিষয়ে ঋণী। কিন্তু যে সকল ভাব তিনি উক্ত কবিগণের নিকট সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পরিপাক করিয়া তিনি তাঁহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে, এই কাব্যগ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি

অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কারগুলি কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও বা রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া অনুক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে। কবিতার চরণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথা অনুসারে সকল স্থানে দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিল্টনের কবিতার ন্যায় যতি বা বিরামের স্থানগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগুলি অতি সুললিত ও সুখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং আবেগময়-ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একেবারে নির্দ্দোষ নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গর্জ্জন করে। যেখানে কোনও প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ম্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়; সমুদ্র অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন করে। দত্ত সাহেবের ন্যায় মার্জ্জিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখকের এরূপ বাগাড়ম্বর শোভা পায় না। একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাবৃত্তিও তাঁহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ করা দোষটিও যে একবারে নাই, তাহা বলা যায় না। হোমর ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে, এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও ঐরূপ চুরী লক্ষিত হয়।

তাহার পর, ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণে 'স্তুতিলা', 'স্বনিলা', নির্ঘোষিলা' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে দেখিলে কাব্যখানির দোষগুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন একখানি ইষ্টক দেখিয়া অট্টালিকার ধারণা হয় না, সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পাঠ দ্বারা কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব।

দত্ত সাহেবের অপর গ্রন্থাবলীর মধ্যে তিলোত্তমাসম্ভব সর্ব্বপ্রথমে লিখিত। ইহাও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় 'এপিক' বা মহাকাব্য হইলেও, উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। বিষয়টি তিলোত্তমার জন্ম। তিলোত্তমা ব্রহ্মার সুন্দরতম সৃষ্টি। আর্য্য-দেবতাগণকে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করায়, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্যই তিলোত্তমার সৃষ্টি।

'তিলোত্তমা'র পর আমরা সানন্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক আর একখানি কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিব। মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার স্পর্দ্ধা না থাকিলেও, এই কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক। কতিপয় বীরাঙ্গনার স্বামীর প্রতি পদ্যে লিখিত পত্রের আকারে ইহা পর্য্যায়ক্রমে রচিত।

'মেঘনাদবধে'র পরই ইহা রচিত হয়, এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলঙ্কার, ভাষার চমৎকারিত্ব, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে। 'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহবেদনা বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে এত কবিতা রচিত হইয়াছে যে, নূতনত্ব সৃষ্টি একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু দত্ত সাহেব ইহাতেও অনেক নূতন ও সুন্দর ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষরছন্দেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার সনেটগুলির আমরা বিশেষ প্রশংসা করি না, কিন্তু সেগুলিও অপ্রসিদ্ধতর গ্রন্থকারের যশোলাভের কারণ হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সনেটগুলি য়ুরোপে রচিত হয়। একটি ভার্সেলে লিখিত হয়। কতকগুলি দান্তে, আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার, টেনিসন, ভিক্টর হুগো ও ইতালীকে সম্বোধন করিয়া লিখিত। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সনেটগুলি বহু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রক্ষিপ্তভাবে রচিত।

নাট্যকার-রূপে দত্ত সাহেব তেমন কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত নাট্যগ্রন্থ—'শর্ম্মিষ্ঠা,' 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। প্রথমোক্ত নাটকখানি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উহার মধ্যে কোনখানিই তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী লেখক নাটক-প্রণয়নে যথার্থ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। এমন কি, আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যকার বাবু দীনবন্ধু মিত্রও মনুষ্য-হৃদয়ের উচ্চতর ভাবগুলি চিত্রিত করিতে গিয়া একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দত্ত সাহেব যখনই নাটক লিখিতে বসেন, তখনই তাঁহার অবিসংবাদিত কবি-প্রতিভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার প্রহসনগুলি কিন্তু ভাল। তন্মধ্যে একখানি—'একেই কি বলে সভ্যতা?" বাঙ্গালাভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নিজগুণপ্রাচুর্য্য ব্যতীত অন্য কারণেও সমালোচনার যোগ্য।

আজি কালি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহু পুস্তক প্রসব করিতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই কোনও খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণমাত্র। বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম, দীনবন্ধু ও এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'-প্রণেতার অনুকারী অনেক হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থখানি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ে লিখিত প্রহসন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, অতিরিক্ত মদ্যপান ও তদানুষঙ্গিক দোষগুলি ব্যঙ্গসহকারে প্রকটিত করা। বটতলার ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানগুলিতে মদ্যপানের দোষ সম্বন্ধে এক আনা বা দুই আনা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের রীতিমত বন্যা উপস্থিত হইয়াছে। একটু বৃহৎ আকারের প্রহসনও বিস্তর প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বুঝলে কি না' নামক গ্রন্থখানি জনসাধারণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে, এবং অনেকবার ভদ্রমহোদয়গণের বাটীতে অভিনীত হইয়াছে। উক্ত সমুদায় গ্রন্থই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নকলমাত্র। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কেবল

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইখানি প্রহসনের অন্যতম বলিয়াই নহে, উহার অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও, উহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।

এই প্রশংসনীয় ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অংশবিশেষ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করিলে, ইহার সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কারণ, ইংরাজীশব্দসঙ্কুল উদ্ভট ভাষা এবং তর্কসভাদিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম বাগাড়ম্বরেই উহার অর্দ্ধেক রস নিহিত আছে। নর্ত্তকী ও সুরাপানের আমোদে মত্ত 'জ্ঞানতরঙ্গিণী' নামক এক বৈজ্ঞানিক তর্কসভার গৃহে ইহার প্রধান দৃশ্য স্থাপিত। ইহাতে যেরূপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব ঘৃণার্হ। প্রধান কথা এই যে, অঙ্কিত চিত্রগুলি সত্যের অনুরূপ কি না। বাঙ্গালার লজ্জার কথা হইলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রগুলি বাস্তবানুরূপ। সুরাপানে উত্তেজিত যে সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টা ইংরাজী-বচন-সংবলিত দীর্ঘ বক্তৃতামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদিগকে য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই যথার্থ সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। সুরাপান, নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গীর বেশভূষা-পরিধান ও বর্ব্বরোচিত ইংরাজীভাষার ব্যবহার যাঁহারা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, ইহারাই যে সেই সকল অর্দ্ধশিক্ষিত বাবুদের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহারাই দলে দলে সরকারী অফিসসমূহে বিচরণ করেন, এবং উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে চাকরীর আবেদনপত্র দ্বারা উদ্ব্যস্ত করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাকালে কলিকাতার রাজপথ-সমূহে জনতাবৃদ্ধি করেন, মদ্যের বিপণীগুলি শোষণ করেন, এবং যখন টাউনহলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশ আসন অধিকৃত করেন। যথার্থ শিক্ষালাভ তাঁহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। ইহারা কোনও ইংরাজীস্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করেন, এবং হীনাবস্থা হইলে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই উমেদারী আরম্ভ করেন। ধনবান হইলে ইহারা অসঙ্কোচে উক্ত বয়সেই গর্হিত আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত হন। এই শ্রেণীর লোকে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, এবং দত্ত সাহেবের চিত্রটি বাস্তবানুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ইহাদিগকে একশ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে—তাঁহাদের সংখ্যা (ইংরাজী শিক্ষার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন) তুলনায় অতি অল্প।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের বিষয় কিছু বলিব। ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকার। একমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যগ্রন্থকার বলিলেও বলা যায়। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচখানি নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইখানি প্রহসন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'নীলদর্পণে'র নাম বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত অন্য সকল গ্রন্থ অপেক্ষা য়ুরোপীয় জনসাধারণের নিকট অধিকতর পরিচিত। নীলবিপ্লব-সংক্রান্ত বলিয়াই উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—নতুবা অন্য কোনও কারণে উহা এত প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। যে বিচারালয় পক্ষপাতিতা ও চিত্তচাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া শীঘ্রই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচারালয়

কর্তৃক লং সাহেব যখন দোষী বলিয়া দণ্ডিত হইলেন, তখন য়ুরোপীয় জনসাধারণের চিত্ত অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত সময়ে 'নীলদর্পণ' একখানি অশ্লীল ও ইতরোচিত নিন্দাবাদে পূর্ণ গুণহীন গ্রন্থ বলিযা বর্ণিত হইয়াছিল। আমরা উক্ত মতের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি না, কিন্তু কাব্য হিসাবে আমরা এ গ্রন্থখানিকে অতি নিকৃষ্ট আসনের যোগ্য বিবেচনা করি। ইহার মূল্য যাহা কিছু ছিল, তাহা রাজনীতি-ঘটিত, কাব্য বলিয়া নহে। আমরা এক্ষণে কাব্যকলার বিষয় লিখিতে বসিয়াছি,—রাজনীতির বিষয় নহে; সুতরাং এ পুস্তকের বিষয় আর অধিক কিছু বলিব না।

দীনবন্ধু বাবুর অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে 'লীলাবতী'ই জনসাধারণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু যদিও আমরা ইহার অনেক সদ্‌গুণ আছে বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি আমাদের বিবেচনায 'নবীন-তপস্বিনী' অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থের অধিকতর দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুণের আধিক্যে তাহা আবৃত হইয়া গিয়াছে। সেক্ষপীযরের Merry Wives of Windsor নামক নাটক হইতে ভাবটি লইয়া ইহা রচিত। গল্পটি একটি সুপরিচিত হিন্দু উপকথা। তাহার উপব এক জন হিন্দু ফল্‌ষ্টাফের প্রেমলীলার অলঙ্কার চড়ান। ফলষ্টাফ-স্থানীয় পাত্রটির নাম জলধর। সে এক জন রাজমন্ত্রী। তাহার দেহভার ও উদরেব পরিধি কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক হইলেও, তাহার যৌবন-সুলভ প্রেম-প্রবণতা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার ভালবাসার পাত্রী মালতী, কালীকান্ত নামক জনৈক সদাগরের যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী। মালতীর মল্লিকানাম্নী এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী আছেন। তাঁহার মন অতীব পবিত্র হইলেও রসনাটি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ, এবং উহার ধার পরীক্ষা করিতে তিনি কখনই বিমুখ নহেন। মালতীর প্রতি জলধরেব অনুরাগ ও প্রেম-নিবেদনের কথা শুনিয়া, তিনি তাহাকে মালতী দ্বারা কয়েকটি কার্য্য শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাই নাটকখানির বিষয়ীভূত। প্রথমতঃ, মালতীর সহিত সাক্ষাতের ছলে জলধরের নিজস্ত্রীর সহিত মিলন সংঘটন করা হইল। মালতী-ভ্রমে জলধর তাহার নিকট নিজস্ত্রীর নিন্দা ও মালতীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল; কিছুক্ষণ পরেই কালীকান্ত আসিয়া পড়ায় জলধর পলায়ন করিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই স্ত্রীর নিকট সম্মার্জ্জনীর প্রহার সহ্য করিতে হইল। আর একটু হইলেই ক্রুদ্ধ কালীকান্তের নিকট মালতীবেশধারী দণ্ডিত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দান করিয়া সে অব্যাহতি পাইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য, সদাগরের বাটী। সেইখানে জলধরের আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া সে আশ্বাস পাইয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে জলধর নিজ প্রভু ভগ্নস্বাস্থ্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া কালীকান্তকে আরবদেশে হোঁদলকুৎকুতে নামক কাল্পনিক জন্তুর মাংস সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে। উক্ত জন্তুর মাংস রাজার রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া রাজাকে সে বুঝাইয়াছে। মল্লিকার পরামর্শে

সদাগর আরবদেশে না গিয়া নিজবাটীর সন্নিকটে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকে, এবং পূর্ব্বমন্ত্রণা অনুসারে যে সময়ে জলধর রমণীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সময়ে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কালীকান্তের হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তনে জলধর লুকাইবার উৎকৃষ্টতর স্থান না পাইয়া, অগত্যা একটি কদাকার মুখস পরিয়া একটা আলকাতরার পিপার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তৎপরে একটা তুলার গাদায় লুক্কায়িত থাকে। তাহার ফল সহজেই অনুমেয়। অবশেষে তাহাকে পলায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং মল্লিকা তাহাকে একটি খিড়কীদ্বার দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। উক্ত দ্বারের সম্মুখে আরবদেশীয় জন্তুর জন্য নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড লৌহপিঞ্জর স্থাপিত ছিল। জলধর অন্ধকারে পিঞ্জরমধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হয়, এবং মল্লিকা উহার দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। প্রাতঃকালে পিঞ্জরাবদ্ধ জলধরকে রাজসভায় লইয়া যাওয়া হয়। পথে অদ্ভুত জন্তু দেখিবার জন্য চারি দিকে লোকের ভিড় হইল। কেহ উহাকে ঢিল মারিতে লাগিল। পাছে লোকে চিনিতে পারে, এই ভয়ে ভীত হইয়া জলধর বন্যপশুর ন্যায় তীব্র চীৎকার ও লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কালীকান্তও দেখা দিল, এবং সমস্ত ঘটনা যথাসময়ে বিবৃত হইল।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি নাটকখানির হাস্যরসের আশ্রয়ীভূত। ইহা ব্যতীত আর একটি গম্ভীররসাশ্রিত গল্প এই নাটকে স্থান পাইয়াছে। দুইটি গল্পের পরস্পর সন্নিবেশ তেমন দৃঢ় নহে। শেষোক্ত গল্পটি রাজা ও রাণীকে লইয়া। বহু বৎসর পূর্ব্বে রাণীকে রাজা অন্তঃসত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ করেন। অনেকের ধারণা, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই। এক্ষণে সকলে রাজাকে রাজ্যরক্ষার জন্য পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন রাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। অবশেষে রাজা এক ভিক্ষুক-রমণীর বেশে রাণীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে ঋষিবেশধারী সুন্দর যুবাপুরুষকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন। রাজা যে সুন্দরীকে দ্বিতীয়স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঋষিবেশী পুত্র তাহাকে ভালবাসেন, এবং অবশেষে উভয়ের বিবাহ হইল।

এই গম্ভীর রসের গল্পটি আদৌ প্রশংসাযোগ্য নহে। কিন্তু অপর গল্পটি অতি হাস্যোদ্দীপকভাবে রচিত হইয়াছে। জলধরের চরিত্রটি যদিও মূলতঃ সেক্ষপীয়রের ফলষ্টাফ্ হইতে গৃহীত, তথাপি উহা সুসঙ্গত ও সজীব হইয়াছে, এবং কৌতুকপ্রিয়া অশেষকৌশলসম্পন্না চতুরা মল্লিকা দীনবন্ধুবাবুর অঙ্কিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্র। জলধরের কুৎসিতা ও সন্দিগ্ধচিত্তা স্ত্রীর চিত্রও অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার স্থূলকায় বৃদ্ধ স্বামীকে দেশশুদ্ধ সমস্ত যুবতী পাইবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং ছলচাতুরীর দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টায় আছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকের কৌতুক উৎপাদন করে।*

* সাহিত্য—১৩২৩

ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র

"কৃষ্ণচরিত্র" বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে শতবার মনে উদয় হইয়াছে, যিনি জেবউন্নিসার বিলাসমন্দির আঁকিয়াছেন—কমলমণির গালের কালিটুকু শ্রীশচন্দ্রের মুখে লাগাইয়া দিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া মহাভারত, পুরাণ মন্থন করিয়া এমন গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিলেন ?

কিন্তু এই পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু গালি খাইতে হইয়াছিল। গালি খাইতে হইয়াছিল দুই শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে। প্রথম একদল বলিলেন, আমাদের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নাস্তিক বঙ্কিম বাবুর হাতে পড়িয়া তোমার আমার মত মানুষ হইল।" আর একদল বলিলেন, "শঠ, বঞ্চক, পারদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু আদর্শ পুরুষ বলিলেন কি প্রকারে ?" দুই দলই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বীতরাগ হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা যদি একটু তলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কোনও অপরাধ দেখিতে পাইতেন না। গ্রন্থারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; গ্রন্থমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অপবাদগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার অপরাধ কি ?

অপরাধ একটু আছে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে একটু বিলাতী (Westernise) করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক হিন্দুদের ইহাতে আপত্তি হইতে পারে। কালীয়দমন অথবা বস্ত্রহরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিলে তাঁহাদের মনে ক্রোধ সঞ্জাত হওয়া সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে আলোচনা করিবার বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের অবসর ছিল না। অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যুগানুযায়ী জ্ঞান তাঁহার ভিতরে সে সময় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। দেশ তখন পাশ্চাত্যভাবে এরূপ বিভোর যে, সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু আদর্শের কতকটা নীচে নামিতে হইয়াছিল। আমাদের মনে হয় দেশবাসীকে আদর্শ আর্য্য জীবনে ফিরাইবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবসূচিত গোপীতত্ত্ব তিনি যদি সে সময় স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ হইতে হইত। বঙ্কিমচন্দ্র, ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, তিনি যে, তৎকালীন সমাজতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঐ অংশটুকু বিশদভাবে আলোচনা করিতে সাহসী হন নাই—প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণধর্ম্ম সুধু বুঝাইলেই চলিবে না। যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্যও একটু চেষ্টা করা চাই। সেই উদ্দেশ্যে আমি যদি শ্রীকৃষ্ণকে একটু westernise করি, তাহা হইলে বোধহয় বিশেষ অপরাধ হয় না। ধর্ম্মটাকে একটু চিত্তাকর্ষক করিতে না পারিলে সে ধর্ম্ম জনপ্রিয় হইতে পারে না। যিশু খৃষ্টও তাই বুঝিয়াছিলেন ; তাই তিনি মদ্যমাংসে স্বয়ং অনাসক্ত হইয়াও মদ্যমাংস খাইতে খৃষ্টানদিগকে নিষেধ করিয়া যান নাই। যদি করিতেন তাহা হইলে বোধ হয়

য়ুরোপীয়েরা খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি এতটা আস্থাবান্ হইতেন না।

মহম্মদও বুঝিয়াছিলেন, যে ধর্ম্ম চিত্তাকর্ষক নয়,সে ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী কামিনীপ্রিয় আরবদিগকে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি বহু-বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে ইসলাম ধর্ম্ম তাৎকালিক আরবদিগের এত চিত্তাকর্ষক হইত না।

শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকে সেই হিসাবে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে জটিল অংশগুলিকে নিষ্কাশিত করিতে হয়। এই জন্যই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের জটিল অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। একাদশ বৎসর বয়সের পর শ্রীকৃষ্ণকে আর পূর্ণ প্রেমময় পূর্ণব্রহ্মরূপে দেখিতে পাই না। তখন তিনি মথুরার সিংহাসনে উপবিষ্ট—তখন তিনি আদর্শ মনুষ্যরূপে সংসারধর্ম্মপালন ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বিশ্বশিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ গোপন করিতেন—শ্রীকৃষ্ণকে পরদারনিরত, ক্রূর, প্রবঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিত?—মনুষ্যমাত্রেরই অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষত্ব কোথায় দাঁড়াইত?

"ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। তৃতীয় কীর্ত্তি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা। কিন্তু তিনি টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য। চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে আজ তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নূতন সৃষ্টি তাঁহার কৃষ্ণচরিত, এবং তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন তত্ত্ব। ইহা গীতাপাঠের ফল; কিন্তু কয়জন লোক গীতা পাঠ করিয়া অনুশীলন-তত্ত্বের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন? তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক নূতন আকারে জগতের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেক লোক শ্রীকৃষ্ণচরিত সমালোচনা দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমরা জানি, এ পথের নেতা তিনিই। তিনি গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের এরূপ পরিস্ফুটভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কম্‌টির প্রত্যক্ষবাদ এবং বার্কলির ও শঙ্করের মায়াবাদ অতি সুন্দররূপে বিমিশ্রিত হইয়া এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাতে গীতা আছে, ভাগবত আছে; বেদ আছে, পুরাণ আছে; ইতিহাস আছে, দর্শন আছে; যোগ আছে, কর্ম্ম আছে; মায়া আছে, কায়া আছে; প্রেম আছে, জ্ঞান আছে;—অথবা নাই যে কি, জানি না। ইহাতে ধর্ম্ম-জগতের আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত সকল তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। গুরুবাদ এবং ভণ্ডামীবাদ উপেক্ষিত হইয়া ইহাতে চরিত্র এবং জীবনের ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা যে কি অমূল্য রত্ন, এখনও কেহ বুঝিবে না। যখন মানুষের বহির্ম্মুখী

দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইবে,—অনুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব ধর্ম্ম, কর্ম্ম বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিবে, যখন অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রের আদর, বাহ্যপ্রকাশ অপেক্ষা জীবনের আদর অধিক হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব, এই অনুশীলন-তত্ত্ব এ দেশের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।" *

বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তিকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্ভুক্ত নহে। বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার শেষ। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহা আমূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—যেদিন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিল। তখন বঙ্কিমবাবু ডেপুটিগিরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুয্যির লেনস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও দুই তিনবার প্রকাশ্য সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাহা দূর হইতে; আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম—'ছিলাম' কেন বলি, এখনও আছি। যখন স্কুলে পড়ি, সে অবস্থাতেই ভক্তির পূর্ব্বরাগে হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। অতএব প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্ভ্রম মিশ্রিত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমার তখনকার অবস্থা সেক্ষপীয়র অমর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন,—

Thus, Indian like
* * I adore
The sun, that looks upon his worshipper
But knows of him no more,

এইভাবে কত বৎসর কাটিয়াছিল, ইতিমধ্যে আমি কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রায় প্রবিষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম; এমন সময় ভাগ্যদেবী একদিন আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপনীত করাইলেন।

উপলক্ষ্যটা বলি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। লিওটার্ড নামে একজন আধা ইংরেজ আধা ফরাসী সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব ও আমার স্বর্গগত বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। আমিও একজন ছোটখাট পাণ্ডা ছিলাম। তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম ছিল—The Bengal Academy of Literature। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবু যাহাতে এই সভার সহিত সংযুক্ত হন, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সম্মতিসংগ্রহরূপ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাই কোন এক অপরাহ্ণে আমি বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন

* প্রবাসী/ভারত, ১৩০১।

'যৌবনে যোগিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনিই ছিলেন প্রধান দূত—আমি সহকারী মাত্র।

গোপালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত—কতকটা স্নেহপাত্রও ছিলেন। তিনি তখন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলি সংগ্রহ ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন—বঙ্কিমবাবু ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই উপদূতের কার্য্য করিতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তখন পর্য্যন্ত আমি 'সাহিত্যিক' বলিয়া পরিচিত হই নাই, যদিও তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি 'সাহিত্যে' ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কারণ, আমার স্মরণ আছে ইহার কিছুদিন পরে কোন বিজ্ঞ সমালোচক নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবজাত শিশু' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইয়া আমরা যথারীতি সংবাদ দেওয়ার পর তাঁহার দ্বিতল কক্ষে নীত হইলাম। আমি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোপালবাবু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্মিতমুখে আমাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, 'সাহিত্যে' আপনার যে 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি।" বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিশেষ সম্মান বোধ করিলাম। আমি বলিলাম, "মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সব আপনি পড়েন নাই।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, "হাঁ অনেকই দেখিতে হয় বই কি। কোথায় কোন্ নূতন লেখকের উদয় হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করি।" প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন যে, আমি শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্রে ওকালতীতে প্রবিষ্ট হইব, তাহাতে তিনি কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে হারাইব।" আমি নির্বন্ধ করিয়া বলিলাম যে, "তাহা কেন? আমি সাহিত্য চর্চ্চা কিছুতেই ছাড়িব না।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ যে উকিলের সাহিত্য-চর্চ্চারূপ দুর্নাম রটে, মক্কেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।" বলাবাহুল্য, বঙ্কিবাবুর উপদেশে আমি তখন মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমি কায়ক্লেশে উভয়কূলই বজায় রাখিয়াছি।

এইবার গোপালবাবু নানারূপ ভূমিকা করিয়া আমাদিগের দৌত্য পেশ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কথায় আবরণ ভেদ করিয়া, আরম্ভেই আমাদের দৌত্য নামঞ্জুর করিলেন এবং সাহিত্য পরিষদ্ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেববাবু জীবিত রহিয়াছেন, তখন আর কেহই Bengal Academy of Literature-এর সভাপতি

হইতে পারেন না। সভার কার্য্য আরও অগ্রসর হইলে এবং সভার কিছু সফলতা দেখিলে তিনি সভায় যোগদান করিবেন কিনা স্থির করিবেন। আমাদের দৌত্য এখানেই শেষ হইল। কিন্তু প্রতিগমনের পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইলাম। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল "ধর্ম্ম-তত্ত্ব" ও "কৃষ্ণ চরিত্রে" নহে, তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমিও তখন গীতার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্ত্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবুর কথা নিঃসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে পরে আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে। গীতার মর্ম্মান্তিক ঘটনা অর্জ্জুনের মোহ। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইলে বিপক্ষ পক্ষে আত্মীয়স্বজন অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুনের চিত্তমোহ উপস্থিত হয় এবং ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে উদ্যত হইয়া করুণ স্বরে পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তিনি আরও বলেন যে, বরং কৌরবেরা তাঁহাকে নিশিত শরে নিহত করুক, তিনি তাহাদের অঙ্গে অস্ত্রপাত করিবেন না।

এবমুক্ত্বাঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ন মানসঃ॥

অর্থাৎ এই বলিয়া অর্জ্জুন রণস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্তে রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইহারই নাম অর্জ্জুনের মোহ। গীতা ইহার নাম দিয়াছেন "কশ্মল"।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষয়ে সমুপস্থিতং।"

এই কশ্মল হইতেই গীতার আরম্ভ। অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে মৌখিক উপদেশে সে মোহ তিরোহিত হইল না, তখন তিনি আপনার বিশ্বরূপ অর্জ্জুনকে প্রদর্শন করিলেন। এই বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতার একাদশ অধ্যায় নিযুক্ত। সেই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের মোহ তিরোহিত হইল। তাহার পর তিনি বলিলেন :—

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

"আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতিলাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

আমার বিশ্বাস, গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিশ্বরূপ দর্শনই গীতার মুখ্য ঘটনা ছিল। মহাভারতের আদি পর্ব্বে যে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে ইহা সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের সারসংগ্রহ। এই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের একটি শ্লোক এই :—

যদা শ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদানাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে, "যখন শুনিলাম যে, অর্জ্জুন 'কশ্মল'-গ্রস্ত হইয়া 'রথোপস্থে' অবসন্ন হইয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দর্শন করাইয়াছেন তখন আর জয়ের আশা করিতে পারি না।"

ভগবদ্গীতার বক্তা সঞ্জয়ও বলিতেছেন যে, ব্যাসের প্রসাদে তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

"শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণে আসিতেছে এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষ অনুভব করিতেছি।"

এখানেও বিশ্বরূপ দর্শনের কথা। এই বিশ্বরূপ দর্শনে যাহার মোহ দূর না হয়, তাহাকে সাংখ্যের ত্রিগুণ-তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব বঙ্কিমবাবু যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতেন, ইহা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক বিশ্বরূপ দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায়—যাহাতে ভক্তের ও ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে এবং যাহাকে বঙ্কিমবাবু গীতার মৌলিক অংশ বিবেচনা করিতেন এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

"যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত মূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। সেইজন্য ভগবদ্গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।"—সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের কি গতি হইবে? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায়েও এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহার

ধ্বনি মূল গীতার ধ্বনির অনুরূপ।* আমার মনে হয়, এ সমস্যার পূরণ এই যে, মূল ভগবদ্গীতা (যাহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তাহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান (arrangement) অন্যরূপ ছিল। গীতার বর্ত্তমান আকারে পুনঃসংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর একথা ঠিক যে বিশ্বরূপ-দর্শন অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি।

বঙ্কিমবাবুর কথা বলিতে গিয়া গীতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বসিলাম। কিন্তু ঐদিন বঙ্কিমবাবু গীতার শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠক ও সমালোচকবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐ দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্ত্তীকালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।**

উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র

দেখা যায়, পুরাকালে পদ্যেরই প্রচলন ছিল ; গদ্যের আদর ছিল না। আইন-কানুন করিতে হইলেও কর্ত্তারা পদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। বেদ, পুরাণ, চণ্ডী সকলই পদ্যে রচিত। পত্রাদিও পদ্যে লিখিত হইত। গদ্য-রচনা তুচ্ছ বোধে উপেক্ষিত হইত।*** আমাদের দেশের চারণেরা পদ্যে কীর্ত্তিগাথা বর্ণন করিত,—গদ্য উপযুক্ত ভাষা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং গদ্যের সৃষ্টি হইল না। গদ্য সৃষ্ট না হইলে উপন্যাস জন্মিতে পারে না। তাই আমাদের দেশে উপন্যাস জন্মিতে অনেক বিলম্ব পড়িয়া গিয়াছিল।

সুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই উপন্যাস বিলম্বে সৃষ্ট হইয়াছে। রাজা আলেকজান্দারের সময় হইতে গল্প লিখিবার বাসনা গ্রীকদের হৃদয়ে জাগিয়া

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২২—২৬ শ্লোক; ১৫ অধ্যায়ের ৫—৬, ও ১২—১৮ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

** নারায়ণ ১৩২২।

*** In early times, the mere art of writing was too difficult and dignified to be employed in prose ;—Dunlop's History of fiction.

উঠে। তাহারা এ প্রবৃত্তি পারস্যবাসীদের নিকট পাইয়াছিল। একুশ শত বৎসর পূর্ব্বে এরিসটাইডিস্ নামধেয় একজন গ্রীসবাসী "মিলেসিয়াকা" শীর্ষক উপন্যাস প্রথম রচনা করেন। কিন্তু সেখানি উপন্যাস নামের যোগ্যই নয়। ক্লিয়ারকাস্ ও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পরে এন্টোনিও ডায়োজিনিস্ লিখিয়া কিঞ্চিৎ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এত গেল পুরাকালের কথা। ঐতিহাসিক কালে, অর্থাৎ মধ্যযুগে দেখা যায়, খৃষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালী গল্প লিখিতে শিখিতেছে। তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Alessandro Manzoni সবে মাত্র চল্লিশ বৎসর মারা গিয়াছেন।

ফ্রাঁসে অনেক বিলম্বে উপন্যাস সৃষ্ট হয়। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখিত হয়। তারপর অনেকেই উপন্যাস লিখিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; —ভলটের, রূসো, জোলা, বল্জ্যাক, ডুমা প্রভৃতি অনেক প্রতিভাসম্পন্ন মহারথী উপন্যাস লিখিয়া ফরাসী-সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কয়জন ভাল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল? ফরাসীদের ঔপন্যাসিক-রত্ন ভিক্টর হুগো অল্পদিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে প্রথম উপন্যাস "Euphues of Lyly" ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। কিন্তু সেখানি ঠিক উপন্যাস নয়,—দর্শনতত্ত্ব বলিলেই হয়। অনেকের মতে রিচার্ডসনের "Pamela"ই প্রথম উপন্যাস। ইহা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্পেনের প্রথম গল্প "Amades de Gaula" ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানি বীরত্বকাহিনী—ঠিক উপন্যাস নহে। এ দুইখানি পুস্তক ছাড়িয়া দিলে Cecilia Faber-এর "La Gaviota" প্রথম উপন্যাস। সেখানি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইবার সময় লিখিত হইয়াছিল।

জর্ম্মানীতে খৃষ্ট সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গল্প লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সে সকল গল্প উপন্যাসের গুণবিশিষ্ট নহে। সুতরাং তাহার বড় একটা মূল্য নাই। গেয়েট্যাই প্রথম উপন্যাস লেখক। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "The sorrows of the young Werther" ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার অনেক পরে জর্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক Wilibld Alexis উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

রুস-রাজ্যে Gogolএর উপন্যাস সর্ব্ব প্রথম। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে প্রেম বা প্রণয় নাই, উচ্ছ্বাস বা প্রফুল্লতা নাই। অপিচ কিছু মৌলিকতা আছে। Tolstoi ও Pissemski যখন উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন Gogol ও তাঁহার অনুকরণকারীরা বিস্মিত হইলেন। টলষ্টয় ত সে দিন মারা গেলেন, তাঁহার চিতাধূমে আজও ইউরোপীয় গগন সমাচ্ছন্ন।

পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাপানী ভাষায় উপন্যাস লিখিত হয়। Murasaki নাম্নী এক জাপানী স্ত্রীলোক "Genji Monogatari" নামক উপন্যাস ১০০৪ খৃষ্টাব্দে

প্রকাশ করেন। ইহা পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস।

ভারতবর্ষে পুরাকালে উপন্যাস ছিল বলিয়া শুনা যায় না। "দশকুমার চরিত" উপন্যাস-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। "কাদম্বরী"তে উপন্যাসের উপাদান বড় বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। শুকপক্ষীর আত্মকথা প্রকৃত উপন্যাস বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। প্রাকৃত, পালি বা অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় হয়ত কোন সময়ে উপন্যাস ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কথা শুনা যায় না। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, "আলালের ঘরের দুলাল"ই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু "Euphues of Lyly" যেমন গুণসম্পন্ন হইলেও বিস্মৃতপ্রায়, "আলালের ঘরের দুলাল"ও তাই। উভয় পুস্তকেরই এক্ষণে বড় একটা আদর নাই।

প্রকৃতপক্ষে রিচার্ডসন যেমন ইংলণ্ডের প্রথম ঔপন্যাসিক, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনই বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, রিচার্ডসনের অনেক উপরে। রিচার্ডসন একটি বা দুইটি চরিত্র লইয়াই থাকিতেন, এবং তাহা ফুটাইতে যত্নবান্ হইতেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসোল্লিখিত সকল চরিত্র ফুটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এবং অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য্যও হইতেন।

স্মলেট, বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক নীচে। স্মলেটের উপন্যাসে সজীব মূর্ত্তি দেখা যায় না; নরনারী চরিত্রগুলি তিনি এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, সে সব চরিত্র বাস্তব জগতে সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত নরনারী চরিত্রগুলি যে সজীব, একথা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

ফিল্ডিংয়ের উপরেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান। কল্পনাশক্তি প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ফিল্ডিং অপেক্ষা অনেক বড়। ফিল্ডিং উপন্যাস-রাজ্যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাস্তব জগতেই আবদ্ধ ছিলেন,—উচ্চ আদর্শ গড়িতে পারেন নাই।

ষ্টার্ণ, ডাঃ জন্‌সন্, চার্লস্ জনষ্টোন্, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করিলাম না।

আর যাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সচরাচর তুলনা করা হয়, সেই যশস্বী ঔপন্যাসিক স্যর ওয়াল্‌টার স্কট অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র কোনও বিষয়ে ছোট, এরূপ বলিতে পারি না। যে সকল বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্কটের উপন্যাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুই ছত্রে যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, সে ভাব স্কট দুই ছত্রে ব্যক্ত করিতে পারেন নাই; যে সামান্য ঘটনা সমাবেশে বঙ্কিমচন্দ্র একটা বড় চরিত্র ফুটাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ সামান্য ঘটনার সমাবেশ স্কটের নিকট প্রায় অপরিচিত ছিল। তা ছাড়া, স্কট বড় একটা আদর্শ নরচরিত্র গড়িতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের কয়জন কবি তাহা পারিয়াছেন, তাহা জানি না। কেহ কেহ বলেন, সেক্সপিয়ার বা স্কট উভয়ের কেহ

পারেন নাই। * 'আইভ্যান হো', 'রিচার্ড ফলষ্টফ্' বা 'ওথেলো'র চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কিন্তু তাহারা আদর্শ চরিত্র নহে। যুধিষ্ঠির বা রাম, প্রতাপ বা চন্দ্রশেখর-তুল্য আদর্শ নরচরিত্র ইংরাজি উপন্যাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ আদর্শ নরচরিত্র গড়িয়া গিয়াছেন, এরূপ আদর্শ নরচরিত্র ইউরোপীয়েরা বড় বেশী গড়িতে পারেন নাই। টলষ্টয়, হুগো প্রভৃতি দুই চারিজন মহাপ্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক ছাড়া বড় যে কেহ পারিয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। আন্নার স্বামী ** আদর্শ চরিত্র হইলেও বাঙ্গালীর নয়নে শৈবলিনীর স্বামী সুন্দরতর। আন্নার স্বামী আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। কিন্তু শৈবলিনীর স্বামী একদিনের জন্যও সে আশঙ্কা করেন নাই; তিনি শুধু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, কেন আমি প্রতাপের ক্রোড় হইতে শৈবলিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম।

চরিত্র-গঠন সচরাচর ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য নহে—বিশ্লেষণই লক্ষ্য। হিন্দু কবিরা চরিত্র গঠিত করেন—ইউরোপীয়েরা তন্ন তন্ন করিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। আমরা মানুষকে অবস্থা বা ঘটনার উপর স্থাপন করিয়া মানুষের ইচ্ছার দ্বারা অবস্থা বা ঘটনা নিয়মিত করি, ইউরোপীয়েরা অবস্থা বা ঘটনাকে মানুষের উপর স্থাপন করিয়া অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা মানুষের ইচ্ছা নিয়মিত করেন। *** জনসমাগমশূন্য নিস্তব্ধ নিশীথে চন্দ্রালোকে জাহ্নবী-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে প্রতাপ যখন শৈবলিনীকে শপথ করাইল, তখন প্রতাপ স্বীয় ইচ্ছার দ্বারা অবস্থা বা ঘটনা নিয়মিত করিল। টম জোন্স **** দেখাইলেন, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা, অবস্থা বা ঘটনা দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে। হিন্দু ও ইউরোপীয় উপন্যাসের মধ্যে প্রভেদ অনেক। আমাদের কাব্য বা উপন্যাস শিক্ষার জন্য, ইংরাজদের কাব্য বা উপন্যাস আমোদের জন্য। আমরা দম্পতী-প্রেম, পিতৃ-ভক্তি, স্বদেশ-প্রীতি, ভগবৎপ্রেম বুঝাইবার জন্য বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ লিখিলাম, ইংরাজেরা Serious, Comic, Romantic উপন্যাস লিখিয়া জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনে প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং ইংরাজি সাহিত্যে আদর্শ চরিত্র বড় বেশী সৃষ্ট হইল না।

শুধু ইংরাজি সাহিত্যে কেন, ইউরোপীয় সাহিত্যেও তাই। ইউরোপীয় উপন্যাসের প্রথম অবস্থায় Spiritual romance, দ্বিতীয় অবস্থায় Comic, তৃতীয় অবস্থায় Pastoral, চতুর্থ অবস্থায় Heroic romance লিখিত হইয়াছিল। ভগবৎ-

* Ruskin's Queen's Gardens.

** Anna Karenina by Tolstoi.

*** বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক টলষ্টয় তাঁহার "War and Peace" নামের গ্রন্থ শেষে বলিয়া গিয়াছেন,—"It is essential to get rid of a freedom of the will that dose not exist."

**** Tom Jones by Fielding.

প্রেম, বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রণয়, স্বদেশ-ভক্তি প্রভৃতি উচ্চবৃত্তি লইয়া বড় একটা কেহ নাড়াচাড়া করেন নাই। আধুনিক কালে চার্লস ডিকেন্স হইতে জর্জ্জ ইলিয়ট পর্য্যন্ত কয়েকজন ইংরাজ ঔপন্যাসিক * নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করিতে যা-কিছু আন্তরিক যত্ন করিয়াছিলেন। জেন্ অষ্টেন, হেনরি উড্, করেলি প্রভৃতি প্রতিভাশালিনী লেখিকারাও মনুষ্যের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিতে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের দময়ন্তী বা লবঙ্গলতা, ব্রজেশ্বর বা সত্যানন্দ, ধ্রুব বা প্রহ্লাদ তুল্য নরনারী-চরিত্র ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা কেহ অঙ্কিত করেন নাই; অঙ্কিত করিবার উপযোগী শক্তি ও কল্পনাও তাঁহাদের ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করিতে চিরদিন প্রয়াস পাইযাছিলেন। তিনি ইংরাজ-প্রদর্শিত সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন না করিয়া মহান্ পথে বিচরণ করিযাছিলেন। ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উৎস সৃষ্টি না করিয়া অনন্ত প্রেমের পারাবারে দেহ ভাসাইয়া ছিলেন। মৃণালিনী হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত সকল পুস্তকই প্রেমোচ্ছ্বসিত। এ প্রেম ত্রিধারায় প্রবাহিত হইযাছে,—দাম্পত্য-প্রেম, স্বদেশ-ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেম। প্রেমের উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত করাই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। ইংরাজদের Serious, Comic ও Romantic উপন্যাসের পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র Religion of conjugal love, Religion of patriotism এবং Religion of humanityর চিত্র অঙ্কিত করিয়া উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। কোন্ চিত্র শ্রেষ্ঠতর? ইউরোপীয় উপন্যাসে অনেক বীরের চিত্র আছে, কিন্তু সত্যানন্দের ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক কয় জন আছেন? এমিলিয়ার ** ন্যায় অনেক সতী থাকিতে পারে, কিন্তু লবঙ্গলতার তুল্য পতিব্রতা কয় জন আছেন? জিঁ ভাঁলজির *** ন্যায় পরহিতব্রতী থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতাপের ন্যায় আত্মোৎসর্গী কই?

বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিষয়ে অনেক ইউরোপীয় উপন্যাসকারের চেয়ে উচ্চে অধিষ্ঠিত। তিনি মনুষ্য-চরিত্র যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন, যেরূপ অল্প কথায় তাহা অঙ্কিত করিতেন, সেরূপ বড় বেশী কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন, সেক্ষপিয়র ও মিলটনেরও এ বিষয়ে ত্রুটী ছিল। **** তাঁহাদেরই যদি ত্রুটী থাকিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও স্কট বা হুগো, মলিয়ের বা গেইট্যা,

* Thackeray ও Charlotte Bronteকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু Frances Burney, Horace Walpole, Anne Radclife প্রভৃতি ক্ষুদ্র ঔপনাসিকদিগের কথা আলোচনা-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না।

** Amelia—by Fielding.

*** Les Miserables—by Victer Hugo,

**** William Barry লিখিয়াছেন,—(Nineteenth Century, 1894, page 719) "It does not seem that Shakespeare and Milton have communicated their deep insight into life, or their essentially spiritual view of man's nature."

টলষ্টয় বা মাজোনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে ?

মনুষ্য-চরিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই চলিবে না, তাহা অঙ্কিত করিতে হইবে। সেক্ষপিয়র, টলষ্টয় যদি এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রও সে হিসাবে কৃতকার্য্য হন নাই বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালীরা মনে করিয়া থাকে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ক্রটি ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বিশেষত্ব ছিল,—তিনি বিনা আড়ম্বরে, অল্প কথায়, সামান্য ঘটনার সাহায্য লইয়া বড় বড় চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা একটা চরিত্র পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে এত বাজে কথার প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন, অকারণ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সূচনা করেন যে, চরিত্র পরিস্ফুট হইলেও সে সকল বর্ণনা পাঠকের সাতিশয় বিরক্তিকর হইয়া উঠে। বিখ্যাত সমালোচক গর্ডন সাহেব বলিয়াছেন,—"Can any one point out to us one of the novelists, who is capable of making his hero and heroine enter a room, at the very climax of their fate, without delaying the catastrophe, to tell us that it is a square room with four walls, and three windows, that each window has two white muslin curtains, carefully tucked back, that there are six chairs and a sofa— • • • ;" সমালোচক সত্য কথাই বলিয়াছেন। ফরাসী ঔপন্যাসিকরা তবু অনেকটা ভাল ; কিন্তু জর্ম্মান নভেল পড়িতে মনুষ্যের ধৈর্য্য থাকে না। ইংরাজী উপন্যাস ততটা মন্দ না হইলেও ক্রমে হইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাস পড়িতে কখনও কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, এরূপ শুনি নাই। তাঁহার কোনও উপন্যাসে এমন অংশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা পরিত্যজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অধিকাংশ পাশ্চাত্য উপন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠতর।

উভয় দেশের ঔপন্যাসিক উপাদানও বিভিন্ন। ইউরোপীয়েরা বর্ত্তমান যুগে যাহা লইয়া উপন্যাস গড়িয়াছেন, হিন্দুরা তাহা লইয়া উপন্যাস গড়েন নাই। পাশ্চাত্য উপন্যাস-কারেরা একটা বৃত্তিকে রক্ত মাংস দিয়া মনুষ্যাকারে গড়িয়াছেন ; আমরা মানুষ গড়িয়া তাহাকে নানা বৃত্তি দিয়াছি। একপক্ষে একটা বৃত্তি সজীব মনুষ্য, অপর পক্ষে মনুষ্য বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি মাত্র। রুচি, নীতি, শিক্ষা অনুসারে সম্ভবতঃ এইরূপ বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, আমরা কিন্তু নানা বৃত্তি শিরা ধমনী সংযুক্ত একটি সজীব মনুষ্য দেখিবার অধিকতর অনুরাগী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা সে চিত্র দেখিতে পাই। ইউরোপীয় উপন্যাসে বড় বেশী দেখিতে পাই না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতর।

বর্ত্তমান যুগে ইংলণ্ডীয় উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সহিত তুলনা হইবার যোগ্যই নহে। ইংলণ্ডের উপন্যাস দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। স্কট, অষ্টেন যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় আর নাই। পণ্ডিতচূড়ামণি William

Barry তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে (Democratic Ideals) লিখিয়াছেন,—"We observe accordingly a marvellous decline in the poetical value of the writings now held up to our admiration. A crude and violent Realism, falsely so called, usurps the place of honour, while trifling personal gossip fills our journals—"

কবিত্ব উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ; যে উপন্যাসে তাহা নাই, সে উপন্যাস অপাঠ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কবিত্ব আছে, বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের কোনও উপন্যাসে তাহা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদেশী উপন্যাস-কারের ন্যায় উৎকট সুখের চিত্র বা "Realism"র খাতিরে উৎকট লালসার চিত্র অঙ্কিত করিতে ব্যাকুল হয়েন নাই। উৎকৃষ্ট লেখকেরা সে সব চিত্র কখন অঙ্কিত করেন না, তাঁহারা কাব্যতুল্য উপন্যাস সৃষ্টি করেন।* উৎকট চিত্র কাব্যে বা উপন্যাসে প্রবেশ করিলে সাহিত্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। জর্ম্মানী ও ইংলণ্ডের অবনতি বিগত শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আগষ্ট ষ্ট্রাইণ্ডবর্গের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন নিভিয়া গিয়াছে। আজ আটাশ বৎসর** ফ্রান্সে বাতি জ্বলে নাই। বাঙ্গালাও গিয়াছে—সম্রাট্‌বিহীন বিশৃঙ্খল রাজ্যে আজ শত শত দস্যুর অস্ত্রাঘাতে বাঙ্গালা উপন্যাস জর্জ্জরিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একা যাহা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তি অনন্যসাহায্যে করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি ভাষা গড়িলেন, উপন্যাস গড়িলেন; গড়িতে তাঁহার পঁচিশ বৎসরও লাগে নাই। ইংলণ্ডে পঁচিশ বৎসরে ইংরাজী উপন্যাস গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সে কার্য্য একজনের দ্বারা হয় নাই,—সপ্তরথীর সম্মিলিত শক্তিতে হইয়াছিল। রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মলেট, ষ্টার্ণ, ডাক্তার জন্‌সন্, চার্লস জনষ্টোন্, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতি ঔপন্যাসিকেরা পঁচিশ বৎসরে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় সেই কার্য্য সেই সময়ে একাকী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তা ছাড়া ইংলণ্ডে প্রথম উপন্যাস "পমেলা" সাদরে অভর্থিত হইয়াছিল, বাঙ্গালায় প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" নিন্দা ও বিদ্রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে রিচার্ডসন্ প্রভৃতির সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তি শিক্ষিত, বাঙ্গালায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও বাঙ্গালা-বিদ্বেষী। এত অসুবিধার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র একা যাহা করিয়াছিলেন, ইউরোপের কোনও ঔপন্যাসিক তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় অল্প সময়ের মধ্যে ভাষা ও উপন্যাস যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেইরূপ উন্নতি সেই সময়ের মধ্যে হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যতটা ঋণী, পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও উপন্যাস-কারের নিকট ততটা ঋণী নহে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-জগতে অতুলনীয়,

***** "The greatest novelists always a small class, produce work which is as
not sea... rable in its art as the finest poetry"—Dunlop's History of fiction.
into life, ...

... র হুগো ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন।*

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লিখিবার প্রণালী এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। তাঁহার লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বাহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইত—প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃ পুনঃ ঘটিত। এমন কি সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। যে পরিচ্ছেদ কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সে পরিচ্ছেদে হয়ত দেখিলাম, হীরার আয়ি আসিয়া "কেষ্টরস" ও "ইষ্টিরসে"র অবতারণা করিতেছে। যে পরিচ্ছেদে দলনী-বেগমের আসিবার কথা, সে পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টার আসিয়া দেখা দিল। এত কাটাকুটী করিতে, সম্পূর্ণ লিখিত পরিচ্ছেদ এককালে উঠাইয়া দিতে আমি আর কোন গ্রন্থকারকে দেখি নাই। আমি কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে বড় একটা পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই। রমেশ বাবু লেখা কমাইতেন না, বরং বাড়াইতেন, হেম বাবু (কবি) খুব দ্রুত লিখিয়া যাইতেন, পরিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেন,—লিখিবার সময় করিতেন—পরদিন করিতেন—ছয় মাস, এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ না কথাটী তাঁহার পছন্দসই হইত—যতক্ষণ না ভাবটি তাঁহার মনঃপূত হইত ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি

* ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কে বড় ইহার একটা বিচার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চলিয়াছিল। বিচারটা অবশ্য য়ুরোপ ও আমেরিকার পাঠকদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারাই ভোট পাইয়াছিলেন। চার্লস ডিকেন্স সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভোটের সংখ্যা ১৪২৯৫৬। তাঁহার নীচে স্কট স্থান পাইয়াছিলেন, তৃতীয় ষ্টিভেনসন্, চতুর্থ ডুমা, পঞ্চম থ্যাকারে, ষষ্ঠ এলিয়ট, সপ্তম হুগো, অষ্টম কিংসলি, নবম অষ্টেন, দশম ব্রোণ্টে, একাদশ মিসেস উড, দ্বাদশ রিড।

আমরাও একবার এক সান্ধ্য-বৈঠকে ভোট লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, টলষ্টয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছিলেন, তাঁর নীচে বঙ্কিমচন্দ্র, তৃতীয় হুগো, চতুর্থ স্কট, পঞ্চম ডিকেন্স ইত্যাদি।

অপর কাহাকেও দেখি নাই।

যতদিন তিনি গভর্মেন্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতায় সানৃকিভাঙ্গার বাসায় অবস্থান কালে দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি আটটার পর লিখিতে আরম্ভ করিতেন; এবং রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তখন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটা কাচের ফর্সিতে বিপুলোদর কলিকায় তামাকু সাজা থাকিত; এবং দক্ষিণ দিকে কিছু আহার্য্য থাকিত। প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে আসিয়া এ কাচের ফর্সি সরিয়া দাঁড়াইল; এবং কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জন্য রূপার ফর্সি আসিল।

সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকল সময়ে একটু একটু লিখিতেন—রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনি সময় পাইতেন, তখনই কিছু কিছু লিখিতেন। সময় কখন বৃথা নষ্ট করিতেন না।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখন বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর, কখন বা তরলমতি বালকের ন্যায় চঞ্চল দেখিতাম। কখন হয়ত তিনি এক ছত্র লিখিয়া তখনই তাহা কাটিয়া দিতেন। আবার একটু ভাবিতেন—লিখিবার পুনর্ব্বার উদ্‌যোগ করিতেন, পরমুহূর্তেই হয়ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকিতেন। কখন বাতায়নসম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুদূর সৌধচূড়া পানে চাহিয়া থাকিতেন—কখন বা কোন পুস্তক বা দ্রব্যাদির গাত্রে হস্ত বিমর্ষণ করিতেন। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া অন্তর্জগতেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এমন আমার মনে হয় না। লিখিবার সময় আমরা কেহ আসিয়া পড়িলে তিনি কখন বিরক্ত হইতেন না, এমন কি আলাপ করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। এমন দিন অনেক গিয়াছে, যে দিন বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লিখিতে পারিতেন না। যদি বা লিখিতেন, তাহাও আবার কাটিয়া দিতেন। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন তাঁহার লেখনী উচ্ছ্বসিতা তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

আমার বেশ স্মরণ আছে, সানৃকিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (সব জজ) মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি ?"

কৃষ্ণধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না—লিখিয়া রাখিতেছি। আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।"

কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র পরমুহূর্ত্তে একটুও চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন ; তাহাতে লেখা রহিয়াছে—কমলাকান্তের দপ্তর।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

উপন্যাসনিচয়ের মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" স্থান সর্ব্বোচ্চ। কাব্যাংশে "কপালকুণ্ডলা" শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। "বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর", "রাজসিংহ" (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ) প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। সর্ব্বনিম্ন স্থান সম্ভবতঃ "মৃণালিনী" অধিকার করিয়াছে। ক্ষুদ্র উপন্যাসের কথা তুলিলাম না।

প্রথম তিন খানি পুস্তক (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "প্রথম তিনখানি বইয়ের জন্য আমি ইংরাজি সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে আইভান্‌হো পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িতাম।"

বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর একজাতীয় উপন্যাস। তিনখানি গ্রন্থের নায়কের সম্মুখে এক একটি প্রলোভন। কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী-রূপে "চন্দ্রশেখরে" জন্ম গ্রহণ করিল ; আবার শৈবলিনী মরিয়া রোহিণী হইল। তিন খানি গ্রন্থের একই প্রতিপাদ্য। তিনটি নায়কের কেহই দুর্ব্বলহৃদয় নহেন ; প্রলোভনের সহিত তিন জনই প্রাণপণে যুঝিয়াছিলেন। যাঁহার প্রণয় নিকৃষ্ট, যিনি গুণ ছাড়িয়া রূপের সেবা করিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি অবশেষে প্রণয়িনীকে সংহার করিয়া নিজে আত্মঘাতী হইলেন। * যাঁহার প্রণয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, যিনি গুণকে উপেক্ষা না করিয়া রূপের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি ধ্বংস হইয়াও হইলেন না। আর যাঁহার প্রণয় বিশুদ্ধ, রূপজ-মোহবর্জ্জিত ও কামনাশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী ও আত্মসংযমী, তিনি চিরদিন অক্ষয়, অমর হইয়া রহিলেন। গোবিন্দলাল নিকৃষ্ট প্রেমিক—প্রতাপ শ্রেষ্ঠ সাধক। নিকৃষ্ট প্রেমিকের চিত্র—দেবতার অধঃপতনের চিত্র কৃষ্ণকান্তের উইলে। মিল্টনের "Paradise regained" অপেক্ষা "Paradise Lost"

* পরবর্ত্তী সংস্করণে গোবিন্দলালের অন্যরূপ পরিণাম দেখান হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠতর। কৃষ্ণকান্তের উইলে যতটা ক্রমবিকাশ আছে, চন্দ্রশেখরে ততটা নাই। প্রতাপ গোড়ায় মানুষ, মধ্যে দেবতা, শেষে দেবতা। গোবিন্দলাল গোড়ায় দেবতা, মধ্যে মানুষ, শেষে পশু। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরকে আঁকিতে যতটা art বা কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছে, প্রতাপ ও শৈবলিনীর অঙ্কনে ততটা art বা কৌশলের প্রয়োজন হয় নাই। এই কারণে কৃষ্ণকান্তের উইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উপন্যাসের বৈচিত্র্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর বৈচিত্র্য এই যে, প্রত্যেক উপন্যাসেই ধনবান্ ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে। ক্ষুদ্র উপন্যাস রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, ইন্দিরাও বাদ যায় নাই। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, সীতারাম, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতিতে রাজা বাদশাহের কথা—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থ ধনবান্ জমীদার লইয়া। কপালকুণ্ডলাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেও আমরা ঐশ্বর্য্যশালিনী মতিবিবির কথা ও পরোক্ষে বাদশাহের কথা শুনিতে পাই। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা দরিদ্র হইলেও তাহারা রাজার ভাণ্ডার লুটিতেছে—রাজাকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ক্ষমতাশালী বা ধনশালী ব্যক্তির প্রসঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসেই আছে।

আর একটা বৈচিত্র্য এই যে, কোনও উপন্যাসের নায়িকার সন্তান সন্ততি নাই। উপনায়িকার থাকিতে পারে, কিন্তু নায়িকার নাই। ভ্রমরের একটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু কয়দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া মরিয়া গিয়াছিল—আমরা তাহাকে মুহূর্ত্তেকের জন্য দেখিতে পাই নাই।

উপন্যাসের পরিচয়

দুর্গেশনন্দিনী

[ইতিবৃত্ত]

অনেকেই অবগত আছেন, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। যখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া

তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাসখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মায় নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়েক মাস লেখনী ধারণ করিলেন না। যে লেখনী কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রসব করিবে, সে লেখনী উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল।—সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থল অভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল,—সঞ্জীবচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন।*

প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে তখন কতকটা চিনিলেন। উপেক্ষিত লেখনী উঠাইয়া লইয়া তিনি কপালকুণ্ডলা লিখিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কাহাকেও শুনাইলেন না—অথবা দেখিতে দিলেন না। তখন তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস, এই আত্মনির্ভরতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার ঘা খাইয়া তিনি বাহিরে কাহাকেও আর দেখান নাই। কিন্তু আমি গোপনে তাহা দেখিতাম। আমার এক্ষণে ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয় আমি এ জন্য তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকিব। যে জন্যই হউক, আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল, তাঁহার পাণ্ডুলিপি অপর কেহ দেখে, এটা তিনি পছন্দ করিতেন না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট অসত্য কথা বলিয়াছিলাম। রমেশ বাবু তখন মেদিনীপুরের কলেক্টার। লোয়াদার ডাক্ বাংলোতে বসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কাকা এক্ষণে কি বই লিখিতেছেন?" কাকার মনোভাব স্মরণ করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "জানি না।" অথচ কিছু দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু একজনকে পুস্তক পড়িয়া শুনাইতেন, আমার খুড়িমাকে। যতটুকু লিখিতেন, ততটুকু পড়িয়া শুনাইতেন। শুনাইতেন, অথবা নিজে শুনিতেন। তিনি বলিতেন, কাণের ন্যায় সমালোচক নাই; একটু তাল কাটিলেই কাণ তাহা

* দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধীয় এই আখ্যায়িকা আমি বাল্যকালে পূজ্যপাদ সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্বন্ধে কোনও কথা কোনও দিন তুলেন নাই। তুলিলে পাছে ভ্রাতৃদ্বয় লজ্জা পান, তাই বোধ হয় তুলেন নাই। পিতার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই।

ধরিয়া দেয়।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, আয়েষা-চরিত্র স্কটের আইভ্যানহোর অন্তর্গত রেবেকা চরিত্রের অনুকরণ মাত্র। আয়েষা, রেবেকার প্রতিকৃতি বটে—অনুকরণ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "আইভ্যানহো পড়িবার আগে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছিলাম।" তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিবার কেনও কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন ও বুঝিতেন, দুর্গেশনন্দিনী একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস মাত্র। তাহা রচনা করিয়া অথবা তাহার রচয়িতা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনী,—ইংলণ্ডের প্রথম উপন্যাস "পমেলা।" এই পমেলারও একটা কলঙ্ক আছে। ফরাসীরা বলেন, Marianne (by Marivaxx) গ্রন্থের অধিকাংশ ঘটনা ও চরিত্র চুরি করিয়া পমেলায় বসান হইয়াছে।

আর বঙ্কিমচন্দ্র যদি আইভ্যানহো হইতে আয়েষাচরিত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা বিশেষ কি অপরাধ করিয়াছেন ? সেক্ষপিয়ার এরূপ অপরাধ করেন নাই কি ? জিরাল্ডি সিনৃথিওর উপন্যাস হইতে কি ওথেলোর প্লট লওয়া হয় নাই ? হলিন্‌সেডের গল্প হইতে কি ম্যাক্‌বেথের আখ্যানাংশ গৃহীত হয় নাই ? না, প্লুটার্ক হইতে কোরিওলেনাস্ উৎপন্ন হয় নাই ?

তা' ছাড়া আর এক কথা আছে ; এক ভাব কি দুই কবির আসিতে পারে না ? মধুসূদন দত্ত যখন "মেঘনাদ বধ" লেখেন, তখন তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। "উত্তররামচরিতের" কথা কখন তিনি শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ তিনি কিরূপে উত্তরচরিতের স্থান বিশেষের ভাব স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন ?* বুঝিলাম যেন, মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্য পড়িয়া তাহার ভাব মেঘনাদ বধের অষ্টম সর্গে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।** কিন্তু ভবভূতির সহিত তাঁহার কোনরূপ পরিচয়ের সম্ভাবনা দেখি না।

কতকাল পূর্ব্বে কালিদাস লিখিয়াছিলেন,—

তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥***

তারপর যুগযুগান্তর বহিয়া গেল। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনে সহসা সে ভাবের উদয় কেন ? তিনি পৃথিবীর অপর প্রান্তে সমুদ্রকূলে বসিয়া নবোদিত সূর্য্য পানে চাহিয়া লিখিলেন,—

"—Sound needed none

* মেঘনাদবধ—৪র্থ সর্গ—ছিনু মোরা সুলোচনা—ইত্যাদি।

** প্রেতলোকের বর্ণনা।

*** কুমারসম্ভব।

Nor any voice of joy ; his spirit drank
The spectacle ; sensation, soul, and form
All melted into him ; they swallowed up
His animal being ; in them did he live,
And by them did he live, they were his life."*

কালিদাস লিখিলেন, স্বরূপা রমণী ব্যভিচারিণী হয় না। সেক্ষপিয়র সে ভাব কোথায় পাইলেন ?** তাই বলিতেছিলাম, দুই কবির এক ভাব আসা বিচিত্র নহে।

উভয় গ্রন্থের মধ্যে—Ivanhoe ও দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য অনেক আছে এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সামঞ্জস্য কোথায় তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে Ivanhoe গ্রন্থের আখ্যানাংশের একটু পরিচয় দিলাম। গ্রন্থখানি হয়ত কেহ কেহ পড়েন নাই, তাই এই পরিচয়।

Lady Rowena দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা, রেবেকা আয়েষা, Buis Guilbert ওসমান, Ivanhoe জগৎসিংহ। বিদূষকেরও অভাব হয় নি—Wamba বিদ্যাদিগ্‌গজ রূপে অবতীর্ণ। সামঞ্জস্যের কথা পরে বলিব ; আগে ইংরাজী গ্রন্থের একটু পরিচয় দিই।

আইভ্যান্‌হো পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত। অপরাধ, তিনি Lady Rowenaকে ভাল বাসিয়াছিলেন। Rowena হীন বংশোদ্ভবা বলিয়া পিতা Cedric এর ক্রোধ নহে। পালিতা কন্যা রওএনা রাজবংশোদ্ভবা ; রাজবংশীয় এথেলষ্টোন নামধেয় কোন অকর্ম্মণ্য পুরুষের সহিত রওএনার বিবাহ দিয়া ইংলণ্ডে Saxon রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা Cedric এর হৃদয়গত বাসনা। পুত্র আইভ্যানহো সে বাসনার পথে কন্টক বলিয়া গৃহ-তাড়িত। পুত্র দীর্ঘকাল পরে পরিব্রাজকের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া পিতৃগৃহে এক রাত্রির জন্য প্রত্যাগমন করিলেন। পিতা বা প্রণয়িনী কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। Ivanhoe পরদিবস প্রত্যুষে রেবেকার পিতা আইজ্যাকের সমভিব্যাহারে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

তারপর Tournament। তথায় ইংলণ্ড ও নর্ম্মাণ্ডির বীরাগ্রগণ্য যোদ্ধা একত্রিত। দুই দিন যুদ্ধের পর আইভ্যানহো জয়ী হইলেন। বিজয়মাল্য পরাইয়া দিতে সুন্দরী শিরোমণি রওএনা অগ্রসর হইলেন, আইভ্যানহো মূর্চ্ছিত হইয়া পদতলে লুটাইলেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কেহ দেখিল না, পিতা Cedricও তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। অতঃপর রেবেকা তাঁহার লোকজন দ্বারা আইভ্যানহোর মূর্চ্ছাপন্ন দেহ বহন করিয়া প্রস্থান করিলেন ; এবং দুই এক দিন স্বীয় আবাসে রাখিয়া চিকিৎসাদি করিলেন।

---

* Excursion.

** Romeo Juliet.

তারপর দেখিলাম, দুর্গম দস্যু-ভীতিসমাকুল বনময় পথের ভিতর ভিতর দিয়া রেবেকা ও তাঁহার পিতা শিবিকা করিয়া আইভ্যানহোকে লইয়া যাইতেছেন। পথে রওএনা, সেড্রিক প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। দুই দল একত্র হইয়া গমনকালে পথমধ্যে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং নৃশংস জমিদার রেজিনাণ্ডের দুর্গমধ্যে নীত ও আবদ্ধ হইলেন। তথায় রেবেকা শয্যাশায়ী আইভ্যানহোর সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইলেন। ছদ্মবেশী রাজা রিচার্ড যখন আইভ্যানহোর উদ্ধারার্থে দুর্গ আক্রমণ করিলেন, তখন রেবেকাই গবাক্ষপথে দণ্ডায়মান থাকিয়া যুদ্ধের ফলাফল আইভ্যানহোকে শুনাইতে লাগিলেন।

তারপর আইভ্যানহো কারামুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রেবেকার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী Bois Guilbert তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যে দুর্গে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাখিলেন, সেই দুর্গের মহাশক্তি-সমন্বিত অধিপতি রেবেকাকে ডাইনি বিবেচনা করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রেবেকার অপরাধ তিনি ঘৃণ্যজাতীয় জু, তিনি মন্ত্রশক্তি প্রভাবে খৃষ্টান Bois Guilbertকে মুগ্ধ ও বশীভূত করিয়াছেন। রেবেকা তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। যদি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে রেবেকার champion পরাস্ত হ'ন, তাহা হইলে রেবেকাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী Bois Guilbert, অধিপতি ও ধর্ম্মপক্ষ হইতে champion নির্ব্বাচিত হইলেন; কিন্তু অভাগিনী রেবেকার champion কেহ নাই। রেবেকা উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আইভ্যানহোর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। আইভ্যানহো তখন সবে শয্যা ছাড়িয়াছেন। তিনি সেই অবস্থাতেই কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে রেবেকার champion স্বরূপ উপনীত হইলেন। শ্রান্তিতে ও দুর্ব্বলতায় তাঁহার দেহ টলিতেছে, তবু তিনি রেবেকার প্রাণরক্ষার্থে গিলবার্টের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অপ্রত্যাশিত হইলেও যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। রেবেকা মুক্তিলাভ করিলেন।

তার কিছুকাল পরে Ivanhoeর সহিত Rowenaর বিবাহ সংঘটিত হইল; তখন রেবেকা একদিন Rowenaকে বহুমূল্য অলঙ্কার উপঢৌকন দিবার মানসে আইভ্যানহোর গৃহে উপনীত হইলেন। এবং চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিলেন। Ivanhoeর সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটিল না।

ইহাই Ivanhoe গ্রন্থের আখ্যানাংশ। পাঠকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন, কোন্ চরিত্র সুন্দর—রেবেকা না আয়েষা। তিলোত্তমা যেমন ফুটে নাই, Rowena-চরিত্র তেমনি ফুটে নাই বলিয়া মনে হয়। ফুটাইবার জন্য বিপুল উদ্যম হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনার অভাবে ফুটে নাই। জগৎসিংহের চেয়ে Ivanhoe সুন্দর, কিন্তু রেবেকার চেয়ে আয়েষা আরও মিষ্ট,—তাহার চরিত্রে স্বার্থের গন্ধ নাই—আত্মচিন্তার পরিবর্ত্তে আত্মত্যাগই আছে। রেবেকা, আইভ্যানহোর দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে;

আয়েষা উপকার করিয়াছে, কিন্তু উপকার প্রার্থী হইয়া জগৎসিংহের দ্বারে কখন দাঁড়ায় নাই। দিয়াছে সব, কিন্তু লয় নাই কিছু। এই হিসাবে আয়েষা শ্রেষ্ঠতর।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"দুর্গেশনন্দিনী পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের আইবানহো পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে একবার ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইবানহো পড়ি নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?' আমি বলিয়াছিলাম, 'না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই, এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি আইবানহো পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।" *

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্ত্তী জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, দুর্গেশনন্দিনীর অভিনব সংস্করণে দিগ্‌গজকে নূতন রূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিম বাবু উত্তর দেন যে, "এক শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয় লেখক মনে করেন, বিদ্যা-দিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখবন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সে চরিত্রের কোন কোন স্থল নূতন করিতে হইয়াছে।"

দুর্গেশনন্দিনী, নূতন যুগের প্রথম উপন্যাস। যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। একজন অপরিচিত নবীন গ্রন্থকারের উপন্যাস অনুকরণ-প্লাবিত বঙ্গদেশে কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তখনকার একখানি সাময়িক পত্র হইতে সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

সমালোচনা

"বাঙ্গালাতে যত গদ্যকাব্য হইয়াছে, তৎসকলই প্রায় বিদ্যাসুন্দরের ছায়াস্বরূপ বোধ হয়; এবং সেই বিদ্যাসুন্দরও সংস্কৃত চৌর পঞ্চাশতের অনুকরণ মাত্র। ফলে এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হন। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট বাল্যকালে আমরা রূপকথা শুনিতাম, এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে কহিতেন, "এক রাজার দুই রাণী, সো দো, সোকে রাজা বড় ভাল-বাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।" তিনি এক দিবসের নিমিত্তেও এই উপষ্টের অন্যথা করিতেন না, নব্য গ্রন্থকারেরাও সেইরূপ আদর্শের অন্যথা করিতে বিমুখ। রত্নাবলীতে শ্রীহর্ষ নায়কের আদর্শ স্বরূপে বৎসরাজকে পৌরুষবিহীন অল্পবুদ্ধি রোদনশীল কামাতুর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদবধি সেই ভাব নায়ক-মাত্রেতেই দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি অন্যথা দেখা যায় না। এই প্রযুক্ত আমরা বঙ্গীয়

* প্রদীপ—১৩০৪।

সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইয়াও বাঙ্গালী গদ্যকাব্যপাঠে অত্যন্ত অনুরাগবিহীন। পরন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করায় সে বিরাগের দূরীকরণ হইয়াছে। আমরা তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজী নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় নাই। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুরাগী; যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী; যাঁহারা মহদ্গুণে পরিতৃপ্ত হন; তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক্ প্রকারে পোষক সন্দেহ নাই।

• • •

"গল্পের মুখ্য পদার্থ আদিরস হইলেও তাহার কুত্রাপি অসহনীয় বর্ণন হয় নাই, ও স্থানে স্থানে উপহাস বর্ণন দ্বারা চিত্ত বিস্ফারণের উপায় করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণন শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণনা গ্রন্থকারদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কলা তাল বেল প্রভৃতি কয়েক ফল মূলের সমাহার করিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। বঙ্কিম বাবু তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা তিলোত্তমার রূপ বর্ণনে প্রতীত হইবে।

* * *

"শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু হাস্য-রসোদ্দীপনে বিলক্ষণ যত্নশীল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এইক্ষণে বাঙ্গালী পুস্তক ভদ্রমহিলারা পাঠ করিয়া থাকেন ইহা তিনি সর্ব্বত্র স্মরণ রাখেন নাই, অথবা তাঁহার পুস্তক তাহাদিগের গ্রাহ্য করিবার সম্যক্ চেষ্টা পায়েন নাই। অনেক কথা আছে যাহা স্পষ্টাপেক্ষা পরোক্ষে ভদ্র হয়, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনেক গ্রন্থকারের সহৃদয়তার হানিকর হইয়া থাকে।

* * * *

"গ্রন্থকারের বর্ণনায় প্রধান সেনাপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা যে প্রকারে জগৎসিংহের বন্দী ও পীড়িতাবস্থায় সেবা করিয়াছে তাহা কদাপি কোন যবন-সম্বন্ধে সংলগ্ন বোধ হয় না। আস্মানির চরিত্রও স্থানে স্থানে ইউরোপীয় প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর আস্মানির রূপ ব্যাজস্তুতিতে যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনে তাহার লক্ষণ রক্ষা করা হয় নাই, পরস্পর অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। রচনা সম্বন্ধে বক্তব্য যে তাহা সাধারণতঃ শুদ্ধ ওজোগুণবিশিষ্ট এবং স্বভাবসিদ্ধ হইলেও স্থানে স্থানে চ্যুত সংস্কৃতিদোষে আক্লিষ্ট আছে। কয়েক স্থানে গ্রন্থকার "লম্ফ ত্যাগ করিয়া"

পদ লিখিয়াছেন, ইহা পরিশুদ্ধ গৌড়ীয় নহে। লোকে লম্ফ "প্রদান" করিয়া থাকে, কদাপি ত্যাগ করে না, কেবল পল্লীগ্রামবাসীরা "লাফ ছাড়িয়া" থাকে, বোধ হয় বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক তাঁহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক, ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক্ সাধুবাদ করিলাম।"*

'আশমনির অভিসারে'র কথা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন; কিন্তু প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা নাই—কিছু কিছু পরিত্যাগ করা হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

দুর্গেশনন্দিনী—পরিত্যক্ত অংশ

"হাঁ খাইবে বই কি—এই খাও, দেখ" বলিয়া আশমনি হস্ত ধরিয়া টানিয়া বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজন পাত্রের নিকট বসাইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, ছি! ছি! ছি! রাম, রাম, রাম! করিলে কি? করিলে কি? উচ্ছিষ্ট মুখ, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে?"

"ক্ষতি কি? পিরীতে সব হয়।"

ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন।

"খাও।"

"গণ্ডুষ করিয়াছি, গাত্রোত্থান করিয়াছি, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে, আবার খাইব?"

"হাঁ খাইবে বই কি? আমারই উচ্ছিষ্ট খাইবে।"

এই বলিয়া আশমনি ভোজন-পাত্র হইতে এক গ্রাস অন্ন লইয়া আপনি খাইল। ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আশমনি উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন-পাত্রে রাখিয়া কহিল, "খাও।"

ব্রাহ্মণের বাঙ্ নিষ্পত্তি নাই।

"খাও; শোন।"

আশমনি গজপতির কানে কানে কি কহিল।

ব্রাহ্মণ আসন হইতে অর্দ্ধ হস্ত লাফাইয়া উঠিলেন।

"তবে খাই", বলিয়া দিগ্‌গজ উচ্ছিষ্ট অন্ন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন। নিমেষ মধ্যে ভোজন পাত্র শূন্য করিয়া কহিলেন—

"সুন্দরি! কই?"

"মর্, এঁটো মুখে?"

"হুম্ হুম্—আঁচাই আঁচাই" বলিয়া গজপতি আস্তে ব্যস্তে মুখে জল দিতে লাগিলেন; কতক জল লাগিল, কতক জল লাগিল না; দন্ত মধ্যে আধপোয়া

* রহস্য সন্দর্ভ—২য় পর্ব্ব।

চালের অন্ন পান্তা হাঁড়িতে রহিল।

"কই সুন্দরি—অধর-সুধা কই ?"

"মর্ আগে হাত মুখ মোছ।"

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কোচায় হাত মুখ পুঁছিতে লাগিলেন।

* * *

"এখন সুন্দরি ?"

"এ দিকে আইস।" দিগ্‌গজ আশমনির কাছে গিয়া বসিলেন।

"মুখের কাছে মুখ আন।"

দিগ্‌গজ আশমনির মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

"হাঁ কর।"

যা বলে তাই। দিগ্‌গজ আধ হাত হাঁ করিলেন। আশমনি রুমাল হইতে একটি তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিল ; দিগ্‌গজ হাঁ করিয়া রহিলেন।

পাণ চিবাইয়া পাণের পিকে গাল পরিপূর্ণ হইলে আশমনি সেই সমুদায় ছেপ দিগ্‌গজের হাঁর ভিতর নিক্ষেপ করিল।

দিগ্‌গজ এক গাল থুতু মুখের মধ্যে পাইয়া অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন ; প্রেয়সী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরসিক বলে ; গিলিতেও পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা গেলেন ; নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় গালের মধ্যেই রহিল।

এই অবকাশে আশমানি একটি খড়িকা লইয়া দিগ্‌গজের বিপুল নাসিকার মধ্যে প্রেরণ করিল ; হাঁছি আসিল, আর মুখ মধ্যস্থ সমুদয় অমৃত রাশি বেগে নির্গত হইয়া দিগ্‌গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিল।

কপালকুণ্ডলা

[ইতিবৃত্ত]

নাগোয়াতে* অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন একজন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন অনেক রাত্রি। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্যেরা সকলেই নিদ্রিত। এমন সময় বাটীর দ্বারে সবলে করাঘাত হইল। পুনঃ পুনঃ করাঘাতে ভৃত্যেরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান ?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবুকে ডাক।" ভৃত্যেরা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, পরে পরামর্শ করিয়া বাবুকে

* বর্ত্তমান কাঁথি।

উঠাইল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নরকপাল-হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখ-মণ্ডল শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গাররেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ডাকিতেছ কেন?

কাপালিক। আমার সঙ্গে এস।

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপালিক। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিযা প্রস্থান করিল। এবং পরদিবস নিশীথে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করিল; এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। তৃতীয় দিবসও আসিয়াছিল। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিবস প্রত্যাখ্যাত হইযা কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। আমার মনে হয়, এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি।

কপালকুণ্ডলা—পরিত্যক্ত অংশ

চতুর্থ সংস্করণ কপালকুণ্ডলার শেষ দুই ছত্র ছিল,—"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্ত-বায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার প্রাণত্যাগ করিলেন।"

পরবর্ত্তী কোনও এক সংস্করণে শেষ দুই ছত্র ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিল; যথা—"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্ত-বায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" *

বিষবৃক্ষ

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

• • •

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ বাবুর ** নিকট একদা বলিয়াছিলেন, "কুন্দনন্দিনীর বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ, তাহা আমি স্বীকার করি।"

---

* কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতন্ত্র পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

** বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশ বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা ?"

বঙ্কিমচন্দ্র নাকি উত্তর দিয়াছিলেন, "কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।"

হরদেব ঘোষালের পত্র দুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

পুস্তকখানি ধীরভাবে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এ চাঞ্চল্য—শক্তির। ইঞ্জিনে ষ্টীম হইলে ইঞ্জিনখানি যেমন মৃদু মৃদু কাঁপিতে থাকে, এ চাঞ্চল্য তদ্রূপ। গ্রন্থকার কালিদাসের কবিতা-পাঠ-উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে বলিতেছেন, 'তোমরা অধৈর্য্য হইও না।' কিন্তু কবি তখন নিজেই একটু অধৈর্য্য। অগাধ ভাবরাশি তখন তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে—ধনী তাঁহার ধন জগতকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্ত হইবার কথাই বটে। ক্ষুদ্র এক অধ্যায়ের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়া, তাহার বৈধব্য ঘটাইয়া কবি তাঁহার ধনরাশি পরিপূর্ণ পেটিকা খুলিলেন। কালিদাস মেঘদূত লিখিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ লিখিয়া সদ্য-গঠিত বঙ্গসাহিত্যে তত্তুল্য অধিক ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

বিষবৃক্ষে, ইংরাজিতে যাহাকে প্লট (Plot) বলে, তাহা নাই। বাঙ্গালা উপন্যাসে সচরাচর প্লট দেখা যায় না। বিষবৃক্ষে একস্থানে প্লটের উদ্ভব হইতেছিল, গ্রন্থকার অমনি তাহা পদদলিত করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। যে কারণেই তিনি এরূপ করুন, বিষবৃক্ষে প্লট একেবারে নাই।

বিষবৃক্ষে কোন আড়ম্বর নাই—অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই। একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মচারী একবার দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাতে কোনও অসাধারণত্ব দৃষ্ট হয় না। সংসারে সচরাচর যাহা ঘটে, তাহা লইয়াই বিষবৃক্ষ।

গ্রন্থের তিনটি চরিত্র প্রধান,—কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ। তন্মধ্যে কুন্দনন্দিনীর চরিত্র অঙ্কন করিতে গ্রন্থকার যতটা কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এতটা কৌশল আর কোনও চরিত্রে প্রদর্শন করেন নাই। কপালকুণ্ডলা ও ভ্রমরের চরিত্রে এই artর মাত্রা প্রচুর দেখা যায়। কুন্দনন্দিনীতেও তাই। আমরা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রালোচনা সর্ব্বাগ্রে করিব।

কুন্দনন্দিনী

কুন্দ স্বল্পভাষিণী, লজ্জাশীলা। নগেন্দ্র কিছু বলিলে কুন্দ "তাহার চক্ষু দুইটি নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছুই বলে না।" ইহা কৌমারের কথা। তার অনেক দিন পরে নবযৌবনে যখন সে তাহার প্রথম স্বামী তারাচরণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে আসিল, তখন সে ঘোমটা দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে কাঁদিয়া পলাইয়া গেল।

বয়সে লজ্জার মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঘোমটার কথা বলিতেছি না—কান্নার কথা বলিতেছি। স্বামী তাহার বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিতে পীডন করে নাই—ঘোমটা খুলিয়া দেয় নাই, তবু কুন্দ কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। অত্যধিক লজ্জায় নিপীড়িত না হইলে কেহ কাঁদিতে পারে না। তাহার মুখ অপর পুরুষকে দেখাইতে হইল, ইহাই তাহার লজ্জা বা দুঃখের কারণ।

তার পর বৈধব্যগ্রস্ত হইয়া কুন্দ, নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিল। সূর্য্যমুখীর নিকট তখন কুন্দের আদর কমিয়াছে। কুন্দ সূর্য্যমুখীর নিকট না থাকিয়া অন্যান্য পৌর স্ত্রীর নিকট থাকিত। কুন্দ সেই পুরবাসিনীদিগের সংসর্গে থাকিয়াও তাহাদের মত বাক্‌পটু বা প্রগল্‌ভা হইতে পারে নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী গান গাহিতে আসিয়া কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?"

কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না।"

এ লজ্জা কি সুন্দর। কি স্বাভাবিক।

ক্ষুদ্র কথা ছাড়িয়া এবার কুন্দের হৃদয়ের পরিচয় দিব। একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে (ষোড়শ) কবি একখানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। সঙ্ক্ষেপে তাহার পরিচয় দিব।

কুন্দ কাঙ্গালিনী,—নগেন্দ্রনাথকে সুধু দেখিবার বাসনা করে—তদ্ভিন্ন তাহার অন্য বাসনা নাই; যে গৃহে অপরিমিত ধনরাশি লুকায়িত আছে, কুন্দ দূর হইতে সে গৃহটি দেখিবার বাসনা করে—এতদ্ভিন্ন সে ধনলাভের প্রত্যাশা রাখে না। এমন সময় অকস্মাৎ তাহার কাণের কাছে একজন (কমলমণি) বলিয়া দিল, "ওরে, এ ধনরাশি তোর—কিন্তু এ ধনরাশি তুই স্পর্শ করিলে সূর্য্যমুখী প্রাণে বাঁচিবে না—সোণার সংসার ছারখারে যাইবে।"

কুন্দ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শুনিল, সে অপরিমিত ধনরাশি তাহার। সে আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, সে ধনরাশি স্পৃষ্ট হইলে সূর্য্যমুখী প্রাণে বাঁচিবে না, তখন কুন্দ নিজের বাসনা-কামনা পদদলিত করিয়া, ধনের আশা বুকে চাপিয়া, বাপীসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে চলিল, কুন্দ ইহলোকের সমস্ত ত্যাগ করিয়া পরলোকের পথান্বেষণে চলিল।

অসামান্য কৌশলী কবি, কুন্দকে সরোবর-সোপানোপরি বসাইয়া এক অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিলেন। উপরে ইহলোক—নীচে পরলোক, উভয়ের মধ্যস্থলে সোপানোপরি বসিয়া কুন্দ চিন্তা করিতে লাগিল, 'এখন কোন্ দিকে যাই?' কিছুই যখন স্থির করিতে পারিতেছে না, তখন ইহলোকের সর্ব্বস্ব নগেন্দ্রকে চুপি চুপি প্রেমভরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। ডাকিতে ডাকিতে, নগেন্দ্রকে ভাবিতে ভাবিতে কুন্দ যখন ইহকালের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া স্থির করিল, "মরা হবে না," তখন সহসা সূর্য্যমুখীর দুঃখের কথা মনে পড়িল; অমনই স্থির করিল, নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে

"কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মরিবই মরিব।" পরের মঙ্গলের জন্য ইহকালের সুখসাধসহ জীবন বিসর্জ্জন করিতে দুঃখিনী বালিকা বুকে আবার বল বাঁধিল। কিন্তু প্রবল প্রেমের সম্মুখে দুর্ব্বলা পরদুঃখকাতরতা পাছে দাঁড়াইতে না পারে, তাই বিস্মৃত-প্রায় পরলোকের ধ্বনি সাহঙ্কারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল,—স্বর্গারূঢ়া জননীর কথা স্মরণ হইবামাত্র কুন্দ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল, এবং 'অস্খলিত সংকল্পে' জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হইল।

এমনই সময়ে—এক মহামুহূর্ত্তে—উপন্যাসের মহাসন্ধিক্ষণে কুন্দনন্দিনীর ইহকালের সম্পদ, কাঙ্গালিনীর অপরিমিত ধনরাশি আসিয়া কুন্দের গাত্র স্পর্শ করিল; কুন্দ অমনই সব ভুলিয়া গেল,—সূর্য্যমুখীকে ভুলিল—পরলোকগতা জননীকে ভুলিল। ইহলোকের মুকুটমণি বিজয়ী প্রেম, বীণার ঝঙ্কারে প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি হরণ করিতে লাগিল।

তখন এক অপূর্ব্ব লীলা দেখিলাম; দেখিলাম—একদিকে উদ্দাম লালসা, অপর দিকে নির্ম্মল প্রেম; একদিকে বাত্যাবিতাড়িত বারিধির ব্যোম-প্রতিঘাতী গর্জ্জন, অপরদিকে প্রভাতের কোলাহল মধ্যে পত্র হইতে পত্রান্তরে শিশিরবিন্দু পতনের শব্দ; একদিকে 'সহস্রবদন নিঃসৃত অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী' বাক্যাবলী, অপরদিকে ভ্রমরগুঞ্জনপ্রতিধ্বনিবৎ সুধু একটি মাত্র কথা। নগেন্দ্র বলিতেছেন, "শুন কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, 'না।'

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, 'কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?' কুন্দ আবার বলিল, 'না'। নগেন্দ্র বলিল, 'তবে না কেন? বল বল—বল আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?'

কুন্দ বলিল, 'না'।

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ তদুত্তরে বলিল, 'না'।

ইহাই কুন্দের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণ। চারি বৎসর পরে নগেন্দ্রের সহিত কুন্দর এই প্রথম বাক্যালাপ। এই চারি বৎসরে চারি যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এই চারি যুগের কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের পর আজ মহাদুঃখের দিনে বাপীতটে নিভৃতে উভয়ের সাক্ষাৎ। মহাদুঃখভারে নিপীড়িত হইয়া কুন্দ আজ বাপীজলে ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছে—পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার জীবনবলি দিতে আসিয়াছে। এই দুঃখের দিনে প্রাণাধিকের সহিত নিভৃতে কুন্দর এই প্রথম সাক্ষাৎ—এই প্রথম বাক্যালাপ। নগেন্দ্র বুঝিয়াছেন, কুন্দ তাঁহাকে ভালবাসে—কুন্দও জানিয়াছে, নগেন্দ্র তাহাকে ভালবাসেন। কুন্দ শুনিতেছে, নগেন্দ্র বলিতেছেন, "শুন কুন্দ!

আমি বহুকষ্টে এতদিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

এই প্রেম-সম্ভাষণের উত্তরে কুন্দ বলিল, "না"। নগেন্দ্র "অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন", কুন্দ সকল কথার উত্তরে কহিল, "না"। যাহাকে বাপীতটে দেখিবামাত্র কুন্দ আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রাণাধিকের প্রেম-সম্ভাষণেও কি কুন্দর হৃদয় বিচলিত হইল না?—একটা মিষ্ট কথা, একটা প্রেমের কথাও কি বলিতে পারিল না? লজ্জা প্রযুক্তই কি বলিতে পারে নাই? সুধু একটা অর্থহীন "না", একটু নীরব রোদনই কি নগেন্দ্রনাথের আকুল হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি?

হাঁ, তাই বটে। এই "না" কথাটি ছাড়া কুন্দ আর কিছু বলিতে পারে না। যদি বলিত, তাহা হইলে আমরা কুন্দকে চিনিতে পারিতাম না। ক্ষুদ্র একটি কথায় কুন্দ তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহার পরদুঃখকাতরতা, তাহার লজ্জাশীলতা, তাহার গভীর প্রেম, তাহার কোমলতা, তাহার ভয় যেরূপে বুঝাইয়াছে, তাহা শতাব্দী-ব্যাপী বক্তৃতাতেও বুঝাইতে পারা যায় না। এত সুন্দর কথা, এত বড় অর্থময় কথা সমুদায় বিষবৃক্ষের মধ্যে নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোনও পুস্তকে আছে কিনা সন্দেহস্থল।

কুন্দনন্দিনী-চরিত্রের সমুদায় অংশ আলোচনা করিতে হইলে একখানি পুস্তিকা লিখিতে হয়। আমরা তাহাতে নিরস্ত থাকিয়া কুন্দনন্দিনীর দুই একটি দোষের কথা মাত্র উল্লেখ করিব।

কুন্দ দারুণ অভিমানিনী। অভিমান এত বেশী যে, হিতাহিত চিন্তা করিবারও তাহার অবকাশ থাকে না। একদা সূর্য্যমুখী তাহাকে তাড়না করিলেন, কুন্দ অমনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিল। যে কুন্দ "নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না", সে কুন্দ গভীর নিশীথে একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া চলিল। পথ চিনে না—কোথায় যাইবে তাহা জানে না—মাথার উপর মেঘের গর্জ্জন—চারিদিকে নিশাচরের চীৎকার, কুন্দ তবু চলিল। কুন্দ এ শক্তি কোথা হইতে পাইল?

আবার যখন নগেন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাতে বিরত থাকিলেন, তখন কুন্দ বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে কুন্দ বলিয়াছিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার এমনি করিয়া আমার নিকট বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আজিও আমার তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

কুন্দ মরিল অভিমানসঞ্জাত দুঃখে—গৃহত্যাগ করিল অভিমানভরে। অভিমানে

অন্ধ হইয়া, দুঃখে অধীর হইয়া কুন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিস্মৃত হইল—আত্মহত্যায় যে মহাপাপ, তাহা হিন্দুর মেয়ে হইয়াও একবার ভাবিয়া দেখিল না। আর একদিন কুন্দ কমলের কথা শুনিয়া বাপী-সলিলে ডুবিয়া মরিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে দিনে আর এ দিনে অনেক প্রভেদ। সে দিন কুন্দ পরের মঙ্গলার্থ আপন জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিল, আর আজ নিজের চিন্তায় বিভোর হইয়া অসঙ্কোচে মহাপাপে লিপ্ত হইল। কুন্দ যখন বিষ পান করে, তখন সে সূর্য্যমুখীর প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ অনবগত ছিল। অতএব সূর্য্যমুখীর সুখের পথ হইতে অপসৃত হইবার মানসে কুন্দ যে বিষপান করিয়াছিল, এ কথা কোনমতেই বলা যায় না। কুন্দ নিজেই বলিতেছে, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, তাহা হইলে আমি মরিতাম না।"

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কুন্দকে একদিনও ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা স্মরণ করিতে দেখি নাই। কুন্দ কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিত বটে, কিন্তু সে ভালবাসায় ঈশ্বর-প্রীতি বিন্দুমাত্রও ছিল না। কীর্ত্তনের সুর শ্রুতিমধুর, তাই হয়ত কুন্দ কীর্ত্তন শুনিতে চাহিয়াছিল।

কুন্দর চরিত্রে যদি একটুও ধর্ম্মভাব থাকিত, তাহা হইলে সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে সহজে সম্মত হইত না। দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ দোষাবহ আমি বলিতেছি না,—দোষাবহ কিনা, সে বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন; আমি বলিতেছি, যখন হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই—যখন কুন্দের আত্মীয়া বা পরিচিতাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে, এরূপ কথা কুন্দ শুনে নাই, তখন আজন্ম-পুষ্ট সংস্কার পদদলিত করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কুন্দর একটু ইতস্ততঃ করা উচিত ছিল। তা' ছাড়া কুন্দ জানিত যে, যাঁহাকে সে দ্বিতীয় স্বামিরূপে গ্রহণ করিতেছে, তিনি বিপত্নীক নহেন বা পত্নী হইতে সন্তপ্ত নহেন। এরূপ অবস্থায় পতিপরায়ণা সূর্য্যমুখীকে মর্ম্মপীড়িত করিয়া আত্মসুখের জন্য দ্বিতীয় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বে কুন্দর একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। কুন্দ বালিকা নহে—অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী; কুন্দ বুদ্ধিহীনা বা অধীরা নহে—কুন্দ স্থিরবুদ্ধিশালিনী; কুন্দ পিতৃমাতৃহীনা অভিভাবকশূন্যা—কেহ বলপূর্ব্বক উহার বিবাহ দিয়া দেয় নাই। যদি কেহ কিছু বল প্রয়োগ করিয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যমুখী। কেন না নগেন্দ্রের মুখে আমরা শুনিলাম, "সূর্য্যমুখী উদ্‌যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে।" কিন্তু বুদ্ধিমতী কুন্দনন্দিনী কি এতই আত্মচিন্তায় প্রমত্ত ছিল যে, সে বুঝিতে পারে নাই, সূর্য্যমুখী এ উদ্‌যোগে আপন চিতাশয্যা রচনা করিতেছে? যদি তাহা সে বুঝিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, এক প্রেমের শক্তি ছাড়া অন্য কোনও শক্তির প্রভাব কুন্দ এ বিবাহ-ব্যাপারে অনুভব করে নাই। এই প্রেমের শক্তি কুন্দকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল—কুন্দের অন্যান্য যুক্তিনিচয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কুন্দ পরের মঙ্গল-মন্দির-দ্বারে আত্মবলি দিতে আসিয়াছিল, কুন্দের সে দিন আর নাই—কুন্দ এক্ষণে

নগেন্দ্রনাথের ভালবাসা পাইয়া আত্মপরায়ণা ধর্ম্মহীনা হইয়াছে—সে এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া শুধু নগেন্দ্রনাথ-অভিলাষিণী।

আর একটা কথা কুন্দনন্দিনীর মুখে ভাল শুনায় নাই। কুন্দ বাপী-কূলে বসিয়া ভাবিতেছিল, "আমার নগেন্দ্র! আ লো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। আচ্ছা সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো?" কথাটা কি কুলবধূর উপযুক্ত হইয়াছে? এ আকাঙ্ক্ষা, এ হিংসা কোনও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

হিন্দু-বিধবার নিকটও প্রত্যাশা করা যায় না। যতদিন না কুন্দ শুনে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত—যতদিন না নগেন্দ্র কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, ততদিন কুন্দ দ্বিচারিণীর ন্যায় অন্য পুরুষের চিন্তা এরূপভাবে মনোমধ্যে আসিতে দিতে পারে না। স্বাধীনতাপ্রয়াসী সাম্যবাদীরা হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন; কিন্তু আমি চিরজাগ্রত সতীধর্ম্মের দোহাই দিয়া শতবার বলিব, কুন্দ দ্বিচারিণীর ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে ধর্ম্মের প্রতিধ্বনি লবঙ্গলতার মুখে শুনিয়াছিলাম, সে ধর্ম্ম হিন্দুর; যাহা কুন্দের মুখে শুনিলাম, তাহা হিন্দুর নয়—হিন্দু-সতীধর্ম্ম কখনও তাহা নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। লবঙ্গলতা বলিয়াছিলেন, "যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" আর কুন্দনন্দিনীর মুখে কি শুনিলাম? কুন্দ নিজের স্বামীকে বিস্মৃত হইয়া পরের স্বামী কামনা করিল। এ কামনা সতীধর্ম্ম সহ্য করিতে পারে না।

সত্য বটে কুন্দ তারাচরণকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিল। ভালবাসার উপর কাহারও হাত নাই—কুন্দরও হাত ছিল না, সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বেশ করিয়াছিল, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু কুন্দ অপরের ছায়াঙ্কিত হৃদয় লইয়া কিরূপে তারাচরণের সহধর্ম্মিণী হইল? বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কোনও দিন কি কুন্দ তারাচরণকে তাহার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিল? কাণা ফুলওয়ালী রজনী, কুন্দকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিত—বলিতে পারিত, ভবিষ্যৎ-স্বামীকে মুক্তকণ্ঠে বল, আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।* কুন্দ তাহা বলে নাই; না বলিয়া তাহার কলুষিত হৃদয় লইয়া তিন বৎসর স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হইয়া রহিল।

তার পর কুন্দ বিধবা হইল। তখন তাহার বয়স সতর বৎসর। সতর বৎসর বয়সে কুন্দ বেশ বুঝিয়াছে, হিন্দু-সতীধর্ম্ম কি, হিন্দু-বিধবার কর্ত্তব্য কি। কিন্তু একদিনও তাহাকে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখি নাই—একদিনও তাহাকে মৃত-স্বামীর ধ্যানাচ্ছন্ন দেখি নাই। অধিকন্তু মনে হইল, কুন্দ যেন স্বামীর মৃত্যুতে সুখী

* রজনী—পঞ্চম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।

হইল—নিষ্কৃতি লাভ করিল—লাগাম ছাড়িয়া নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে পারিল। এ রকম মেয়ে, এ রকম বধূ হিন্দু গৃহে দেখিতে বাসনা করি না।

তাই বলিতেছিলাম, কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে সকল সদ্গুণ আছে, কেবল ধর্ম্মভাবের অভাব। কবি ইচ্ছাপূর্ব্বকই কুন্দকে এ ধর্ম্মভাব দেন নাই। যদি দিতেন, তাহা হইলে ঘটনার সামঞ্জস্য থাকিত না। কুন্দ সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমা, কোমলতায় শেলির লজ্জাবতী লতা, সারল্যে মিরান্দা, প্রেমে শকুন্তলা—কিন্তু এক ধর্ম্মভাবের অভাবে কুন্দ, শৈবলিনী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চে অধিষ্ঠিত।

এই ত গেল সংসারীর কথা, তা'ছাড়া কুন্দ-চরিত্রের আর এক দিক্ আছে। কুন্দ সংসারের কিছু জানে না—সমাজ-বন্ধনের ধার ধারে না; প্রাণ যাহাকে চায় তাহাকে সে ভালবাসে। কুন্দ প্রাণ ভরিয়া নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিল। তারপর তারাচরণকে বিবাহ করিল। তারাচরণ মরিয়া গেল, কুন্দ ফিরিয়া আসিয়া আবার নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিতে লাগিল। সাম্যবাদীরা বলেন, এ ভালবাসায় কোন দোষ নাই; কেন না "স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়।" আমরা বলি, কুন্দনন্দিনী দূর হইতে দেখিতেই ভাল—কাব্যে, উপন্যাসে, আকাশপথে, সাম্যবাদীর গৃহে সে "শরীরী চন্দ্রকর" বিরাজ করুক, কিন্তু আমাদের হিন্দুগৃহে—সূর্য্যালোকে সে "চন্দ্রকরের" প্রয়োজন নাই। তাই কি কুন্দ মরিল?

কুন্দ ও সূর্য্যমুখীর চরিত্র তুলনা করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"কুন্দ চটুল স্রোতস্বিনী, সূর্য্যমুখী গভীর সমুদ্র। * * * অম্লানবদনে সূর্য্যমুখী সুন্দরতম; কুন্দ সুন্দর বলিতে মন উঠে না—কেমন বাধো বাধো ঠেকে। * * * কুন্দর ভালবাসা স্বার্থবিজড়িত না হউক, কিন্তু নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ নহে। পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার সুখ বলি দিতে সূর্য্যমুখী সহজেই পারে, কুন্দ একটু ইতস্ততঃ করে, আপনার সুখের দিকে ছল্ছল্ নেত্রে একবার ফিরিয়া তাকায়। * * * কুন্দ নয়ন দিয়া দেখিবার সামগ্রী—হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। কুন্দ বাহিরের সৌন্দর্য্য, তাহাকে লইয়া ঘরকন্না চলে না। কুন্দ মানবী, বালিকা,—আমরা তাহাকে স্নেহ করি, ভালবাসি, তাহার জন্য অশ্রু ফেলি। সূর্য্যমুখী—দেবী, সংসারী, তাঁহাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, প্রণাম করি। সূর্য্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অহঙ্কার, নারীহৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। * * * বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত আলোচনা করিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, লজ্জাশীলা ভক্তিমতী পতিব্রতা স্ত্রীই বাঙ্গালীর নারীহৃদয়ের আদর্শ। বাঙ্গালী-স্ত্রীর পাতিব্রত্যই ধর্ম্ম। ভালবাসা পাইবার জন্য হৃদয়ের কাতরতা, কিংবা যাহাকে ভালবাসি, তাহার উপেক্ষায় মর্ম্মদহন, পাতিব্রত্যের লক্ষণ নহে—সুখে দুঃখে স্বামীর সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ একীকরণই পাতিব্রত্যের লক্ষণ।" *

* প্রবন্ধ।

সূর্য্যমুখী

সূর্য্যমুখী রমণী-কুল-রত্ন। রূপ, গুণ যথেষ্ট। তাহার বাহির যেমন, অন্তর তেমন। তাহার পবিত্র হৃদয়ে অসীম প্রেম; এ প্রেমের সবটুকুই স্বামী-চরণে সমর্পিত। নীলাকাশ-প্রতিবিম্বিত নীলাম্বুহ্রদবৎ সূর্য্যমুখীর হৃদয় স্বামীর ছায়াতে পূর্ণ—স্বামী ছাড়া তাহার হৃদয়ে আর কিছু নাই। স্বামী তাহার সঙ্গী, সাথী, ক্রীড়া-সহচর; স্বামী তাহার ধ্যান, জ্ঞান, সুখ, শান্তি; স্বামী তাহার বাসনা, কামনা, ইহকাল, পরকাল। যে ভক্তি ও প্রেম সূর্য্যমুখী স্বামী-পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সে ভক্তি ও প্রেম ঈশ্বরেরও বাঞ্ছনীয়। যে আত্মবিস্মৃতি লইয়া সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিয়াছিলেন, সে আত্মবিস্মৃতি কুন্দনন্দিনীর পক্ষেও দুর্ল্লভ। সূর্য্যমুখী জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সুখের জন্য—মরিলে পাছে তাঁহার দুঃখ বাড়ে, তাই সূর্য্যমুখী মরেন নাই। সমুদয় গ্রন্থমধ্যে যদি কেহ পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্মবলি দিয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যমুখী। সূর্য্যমুখী আদর্শ রমণী, আদর্শ স্ত্রী।

আদর্শ—যত দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করেন নাই। যে দিন তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, সেই দিন তিনি আদর্শ রমণীর সিংহাসন হইতে বিদূরিতা হইলেন। বঙ্গকুলবধূ কোন অবস্থাতেই গৃহত্যাগ করিতে পারে না। শুধু বঙ্গকুলবধূ কেন, কোন সভ্যজাতির কোনও কুলবধূ পারে না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইলেন। এ দুর্ব্বলতা অমার্জ্জনীয়। ইংরাজের চক্ষেও যে অমার্জ্জনীয় তাহা Mrs. Wood তাঁহার ইষ্টলিন গ্রন্থে দেখাইয়াছেন।

বিষবৃক্ষ—পরিত্যক্ত অংশ

এই পুস্তকের বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বঙ্গদর্শনে যে অবস্থায় বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছিল, শেষ সংস্করণেও বিষবৃক্ষের প্রায় তদ্রূপ অবস্থা রহিয়া গিয়াছে। দুই এক স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিত্যক্ত অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুনে কীচক মেরে উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।—ইহার পরে :—

আর একজন কোথা হইতে গায়িল :—

আমার নাম হীরা মালিনী,
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে
নারি আমি ধনি।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! তুমি ধনি কে? ভূত না প্রেত্তিনী?"

তখন ঠুন! ঠুন ঝনাৎ! প্রেত্তিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেত্তিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালো চুড়ি; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কানে ঝুমকা, কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেত্তিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন

না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা কোন্ গাছ থেকে?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম্ না বাপ।"

হীরা স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছ, বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! এ বাবা ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত নী নাকি?"

এই বলিয়া আবার আলো স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। বলিল, "তারপর মালিনী মাসী—কি মনে কোরে?"

হীরা বলিল, "মনে করে আর কি? দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধরতে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন—

'আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে রাখ বো
তারে দিবারাতি॥
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলো ডালা,
লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি॥

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি, গিয়েছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।"

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। **Hurrah**! কুন্দ কলি!—Three cheers for কুন্দনন্দিনী। বন্দ্যাতে মন্দ জাতিকং! কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দিনী!

বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁচুবনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। **Hurrah! Hurrah!** for কুন্দনন্দিনী। বল, বলত, বলত কি বলিয়া পাঠিয়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরিত।

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল:—"এতদিনের পীরিত তাহা জানতেম না। প্রথম পীরিত হলো কেমন করে?"

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা' সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরিত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, শুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন এক পাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর ?"

দে। তারপর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা শুনা হয় নাই। তারপর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাহা ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ। শিখে হো ছল ভেলা নটনাগর তারপর মালিনী মাসি! কি বলিযা পাঠয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি! প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিযা হীরা মৃদু হাসিয়া দণ্ডবৎ হইযা, প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
(অনাথিনী)

"ও সূর্য্যমুখী! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও।"

আনন্দমঠ

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ইংরাজদের কিরূপ ধারণা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে Encyclopoedia Britannica হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম :—

"Of all his (Bankim Chandra's) works, however, by far the most important from its astonishing political consequences was the *Ananda Math*, which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. * * * The general moral of the *Ananda Math*, then, is that Bri ish rule and British education are to be accepted as the only alternative to Musalman oppression, a moral which Bankim Chandra developed in his *Dharmatattwa* * * * But though the *Ananda Math* is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the

occasional verses in the book, of which the *Bande Mataram* is the most famous."

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন,—"বিখ্যাত সমালোচক কোলরিজ সেক্স্পিয়রের "রিচার্ড দি সেকেণ্ড"—নামক নাটকে ইংলণ্ডের স্তুতিবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "রিচার্ড দি সেকেণ্ডে" আর কোনও সৌন্দর্য্য না থাকিলেও, এই স্তোত্র উহাকে ইংরাজি-সাহিত্যে এক অমূল্য পদার্থে পরিণত করিত। আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি যে, সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আনন্দমঠে সৌন্দর্য্যের লেশ মাত্র না থাকিলেও, কেবল "বন্দেমাতরম্" গীতের জন্য, আনন্দমঠ, বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে এক অমূল্য রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।" *

আনন্দমঠে অনেক সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একখানি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস মাত্র; কেন না, ইহাতে নৈপুণ্য—ইংরাজিতে যাহাকে art বলে, তাহা খুব কম। আনন্দমঠ স্বদেশ-প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ইহাতে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব বড় বেশী নাই। তবু আনন্দমঠে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা কোনও গ্রন্থে নাই,—কেন না ইহা inspired—অনুপ্রাণিত—সজীব।

পূজ্যপাদ পূর্ণচন্দ্র এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—

বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপ ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃতি করিয়াছিলেন তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল' 'অজন্মা', এই সকল কথা সর্ব্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল তাহা বিবৃতি করিলেন। তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১১৭৬ সালে) ফসল হইল না; এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবান্দেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেননা, টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে যে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইল, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল, কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার

* স্বদেশ প্রতিভা।

তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই, কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে "আনন্দমঠ" লিখিলেন। "বন্দে মাতরম্" গীতটি উঁহার বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

সমালোচন

"বঙ্কিম, তুমি মাতার সুসন্তান ; তুমি বঙ্গের নরকান্ধকারে শাপভ্রষ্ট দেবতা। কেন না, তুমি যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া, যে আগুন লেখনীতে মাখিয়া আনন্দমঠ লিখিতে বসিয়াছিলে, তাহা সপ্তম স্বর্গের মহামৃত অপেক্ষাও পবিত্র এবং দুর্লভ। আজ বঙ্গের সপ্তকোটী হৃদয়-তন্ত্রীর তারস্বর তোমার স্বরে মিলিত, সপ্তকোটী প্রাণ তোমার জলন্ত প্রাণে অনুপ্রাণিত। আজ দ্বিসপ্ত কোটী সজল চক্ষু স্বর্গের দিকে রাখিয়া দ্বিসপ্তকোটি হস্ত তুলিয়া সমস্ত বঙ্গের নরনারী তোমাকে নীরব গম্ভীরে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তুমিই ধন্য এবং কৃতার্থ।

* * * *

"লেখক ভূমিকা বা বিজ্ঞাপনে যে তিনটী কথা বলিযাছেন, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিন্তু তাহার একটীও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বাঙ্গালীর স্ত্রী যে অবস্থাবিশেষে বাঙ্গালীর সহায নয, এ কথা গ্রন্থোল্লিখিত কোন স্ত্রীচরিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই।

"শান্তি দেবী, দানবী, মানবী, পিশাচী, রাক্ষসী যাহা খুসী হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে নয়—একশ সওয়া শ' বৎসর পূর্ব্বের বীরভূম অঞ্চলের বাঙ্গালীর কুলবধু, অথবা আজ কালকার নবীনা বঙ্গবাসিনীও নয়। তবে শান্তির সাহায্যে বা তদভাবে বাঙ্গালীর কি ? কল্যাণী যেমন স্বামীর অসহায় নয়, তেমনি সহায়ও নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন কার্য্য নাই। 'সমাজ-বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র।' জয়োৎফুল্ল সন্তানদিগের লুটপাটে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু 'বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী' এ কথার প্রকৃত অর্থযুক্ত কোন দৃষ্টান্ত গ্রন্থে নাই।

'আনন্দমঠে মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশের কোন চিত্র নাই। এ বাগানের মালী, আস্ত আস্ত, বড় বড় ফুটন্ত ফুলগুলি দিয়া স্বপ্নের রাজ্যে বসিয়া মালা গাঁথিতেই সুপটু। কিন্তু একটীও অস্ফুট কলিকা ফুটাইয়া পাঠকের প্রাণে তাহার বৈচিত্র্য অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কবি, জীবানন্দ ও ভবানন্দের চরিত্র কিছু বিচিত্র করিতে চাহিয়াছেন। জীবানন্দকে আঁকিবার সময় তুলি আঁকা বাঁকা হইয়া চিত্রকরের হাতের কাঁচাম প্রকাশ করিয়াছে। নিমাইএর ঘরেই প্রথমে এই ছবির গলদ ধরা পড়িয়াছে। * * তৎপরে আনন্দমঠে শান্তির সঙ্গে কলহকালে এই কালিমা ঘনতম হইয়াছে। * * ভবানন্দের চরিত্র এর অপেক্ষা স্বাভাবিক বোধ হইল।

"শান্তির অবতারণা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই নিষ্ফলতার সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ, ভবানন্দের পতনও অর্থশূন্য হইয়াছে বলিতেও দোষ হয় না। * *

"সত্যানন্দের চরিত্র কিছু স্বপ্নময়, কিছু ঐন্দ্রজালিকতাপূর্ণ কিন্তু আসক্তিবর্জ্জিত, এবং কার্য্যময়। তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং তেজ একত্র সমাবিষ্ট,

জটিলতা-ভেদী তীক্ষ্নবুদ্ধি এবং সরলতাময় অন্তর তাঁহার উচ্চ ভূষণ। কিন্তু * * অদ্ভুত চরিত্রে জনসমাজের উপকার অল্পই হয়। আনন্দমঠের চরিত্রগুলির প্রায়ই পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সত্যানন্দের চরিত্রও কবি ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

"জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্তের খেলা খেলিয়া বাঙ্গালীর কুসুম-কোমল প্রাণের দুর্ব্বলতা না দেখাইলেই ভাল হইত। জীবানন্দের মৃতদেহ বাঁচাইয়া চারি কুল রাখিতে গিয়া, সকল কুলের ধ্বংস হইয়াছে। এ প্রতিজ্ঞা নয়, এ প্রায়শ্চিত্ত নয়, শুধু ফাঁকি। * *

"কবি নিজ কলমে আনন্দমঠকে উপন্যাস বলিয়া কোথাও কিছু বলেন নাই। সাধারণের বিশ্বাসানুসারে আমরা এই গ্রন্থকে উপন্যাস মনে করিয়াছি। উহাকে রূপকময় আখ্যায়িকা বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাহাতে আনন্দমঠের গৌরব কিছুই থাকে না।" *

সুদীর্ঘ সমালোচনার অত্যল্প অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। সমালোচক মহাশয়ের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সদ্বিবেচক।

বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে, একদা আমার ভগিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা) তাঁহার পিতার নিকট "বন্দে মাতরম্" গানের কথা তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "একদিন দেখিবে—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমি এই গল্পটি আমার ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম।

বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিতেছেন, "একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু প্রভৃতি। নবীন বাবু কথায় কথায় আনন্দমঠের সুপরিচিত "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিম বাবুকে বলিলেন, 'এমন ভাল জিনিসটাকে আধ সংস্কৃত, আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটী করা হইয়াছে; এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না।' বঙ্কিম বাবু ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন—'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল

* নব্য-ভারত, ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।

লেগেছে, তাই ও রকম লিখিছি। লোকের ভাল লাগে কিনা ভেবে আমি লিখ্‌ব!"*

"বন্দে মাতরম্‌" শব্দের অর্থ লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলেন, ইহার মর্ম্মার্থ—"Hail to thee, Mother!" কিংবা 'I reverence thee, Mother!" Dr. G. A. Grierson বলেন, "হিন্দুধর্ম্মের কোনও দেবীর উদ্দেশে—সম্ভবতঃ সংহারকর্ত্রী কালীর উদ্দেশে এই গান লিখিত হইয়াছে," ** সার হেন্‌রি কটন প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বন্দে মাতরম্‌ সঙ্গীতটি জননী বঙ্গভূমির আবাহন মাত্র।"*** W. H. Lee এই গানটির যে মর্ম্মানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কটন সাহেবের মতের পোষকতা করে। J. D. Anderson লিখিলেন,—"আনন্দমঠের ১ম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে, বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা কালীপ্রতিমার পূজা করিয়া বলিতেছে, মা—যা হইয়াছেন; আর একটি মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমাকে দেখাইয়া বলিতেছে, মা—যা হইবেন। বন্দে মাতরম্‌ স্তোত্র এই দুই প্রতিমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে।" ****

বিলাতে বসিয়া S. M. Mitra বলেন, "Bankim Chandra composed it in a fit of patriotic excitement after a good hearty dinner, which he always enjoyed". *****

ব্রিটানিকা বলিতেছেন, "The poem, then, is the work of Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali. * * * Lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators". * *

"During Bankim Chandra's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instanee, during the Ilbert Bill agitation nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it, is impossible to believe".

বাঙ্গালী বেশ জানে, "বন্দে মাতরম্‌" গানের অর্থ কি; বাঙ্গালী জানে, গানের

* সাধনা তৃতীয় বর্ষ।
** লণ্ডন টাইমস্‌, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৬।
*** ঐ ঐ ১৩ই ঐ ঐ।
**** লণ্ডন টাইমস্‌, ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯০৬।
***** Indian Problems, London, 1908.

ভিতর বিদ্রোহবহ্নির ধূম নাই—সংহারকর্ত্রী কালীরও আবাহন নাই ; গানটি জন্মভূমির স্তোত্র মাত্র। জন্মভূমিকে জননীরূপে—আরাধ্যা দেবীরূপে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বক্ষমতাময়ী প্রকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার আবাহন গাহিতেছেন। কমলাকান্ত যে প্রতিমার পূজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সত্যানন্দ সেই প্রতিমার আবাহন গাহিয়াছিলেন। উভয়ের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন ডাকিতেছিলেন, "মা" "মা" রবে ; আর একজন গাহিতেছিলেন, "বন্দে মাতরম্।" একজন ভক্তের প্রতিমা—"রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।" * আর একজন ভক্তের প্রতিমাও তাই,—"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।" ** একজন বলিতেছেন, "এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।" আর একজন বলিতেছেন, "এই মা যা হইবেন।" একজন বলিতেছেন, "এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা-রূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা"—আর একজন গাহিতেছেন, "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরং।" একজন যে হৃদয় লইয়া গাহিতেছেন, "জয় জয় ভক্তি শক্তিদায়িকে," আর একজনের হৃদয়েও সেই সুর প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে,—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি।"

তাই বলিতেছিলাম, উভয়ের—কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের—মন্ত্র এক, হৃদয় এক প্রতিমা এক।

ধ্যানে বা কল্পনায় বা মন্ত্রে দোষ নাই, দোষ—মন্ত্রের অসদ্ব্যবহারে, দোষ—দেশকালপাত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও দিন মনে স্থান দেন নাই যে, তাঁহার আরাধ্যা দেবীর পূজার মন্ত্র একদিন নরঘাতী বর্ব্বরের মুখে ধ্বনিত হইবে ; কিন্তু তিনি ইহা বেশ জানিতেন, একদিন না একদিন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালায় নূতন জীবন আনিবে—নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিবে। কেমন করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানি না, তবে দুই একজনের নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

কাঁটালপাড়া-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ত্রিশ বৎসর আগেকার একটি কথা বলিয়াছেন, তিনি সে সময় বঙ্গদর্শনের কার্য্যাধ্যক্ষ, অথবা প্রুফ-রিডার অথবা এমনি একটা কাজ লইয়া বঙ্গদর্শনের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি

* কমলাকান্তের দপ্তর, একাদশ পরিচ্ছেদ।
** আনন্দমঠ, প্রথমখণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ।

বলেন, একদা তিনি বঙ্গদর্শনের কাপি চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "কাপি লেখা হয় নাই।" রাম বাবু বলেন, "কাপির অভাবে কাজ বন্ধ আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন নাকি ঝটিতি "বন্দে মাতরম্" গানটি লিখিয়া দিলেন।

আমার বিশ্বাস, এ গান ঝটিতি লিখিবার নয়। আত্মস্থ না হইলে—তন্ময় না না হইলে—অনুপ্রাণিত না হইলে এ গান লেখা যায় না। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণ লেখকদিগের ন্যায় যা'-কিছু-একটা লিখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছাপাইতে দিতেন না।

বন্দে মাতরম্ গানের একটা ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ অনুবাদ সাহেবের নয়—বাঙ্গালীর। অনুবাদকারী নিজের নাম গোপন করিয়া রাম শর্ম্মা নামে পরিচয় দিয়াছেন।

Mother, to thee I bow !
Rich with fine streams and fruits art thou !
Cool breezes, cornfields green, are thine,
Mother mine !

The silver thrilling moonlight night,
Gay groves with blooms and flowers bedight !
Sweet smiles, mellifluous speeches, are thine,
Giver of bliss and boons benign,
Mother mine !

With many million ardent throats,
Singing thy praise with swelling notes
With many millions sturdy hands,
Defending thee with sharpen'd brands,
How art thou weak, when these are thine
Mother mine !

Yes, might immense is thine
From throng on throng of ruthless foes,
From perils dire, and whelming woes,
Defender and Deliverer thou !
To thee I bow,
Mother mine !

Wisdom and Righteousness thou art !
Thou, sovereign spirit of the heart,
And vital air within !

Thou givest vigor to the arm,
And to the breast devotion warm ;
In every home, in every shrine,
The image all adore is thine,
Mother mine !

Thou, ten-armed Durga, whom fell demons
fear !
Thou, lotus-ranging Lakshmi, ever dear !
Goddess of Art, bright Saraswati thou !
To thee I bow !

O Fortune's Pow'r divine !
Faultlessly fair,
Beyond compare,
Rich with fine streams and fruits art thou !
Mother mine !

Mother, to thee I bow !
With robe of green, devoid of guile,
With grace adorn'd and lovely smile,
Earth ever bounteous, thou !
Nourisher, cherisher benign,
Mother mine !

আনন্দমঠ—পরিত্যক্ত অংশ

প্রথম সংস্করণ—পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

শান্তি। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছতলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণপূর্ব্বক, তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ ঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণচর্ম্মের উপর মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপরে উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে হে তুমি বেল্লিক ?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক ? মানুষের হাঁটুর উপর কি বসবার জায়গা ?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া শুইয়া আছ ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের ?

জীব। কার ঘর ?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি ?

শান্তি। তোমার বোনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহুদিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ এক রকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে পাই ? মঠের ভিতর না হতো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সাঙাত। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুন ঠাক্‌রুণদের আঁচলের ভিতর লুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর সন্তানে সন্তানে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, দু ঘা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বশরীর জলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড়

মিঠা লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে, এলেই ঠ্যাঙে লাঠি মারবো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও পারেন না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "মহাশয়, এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগদখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগদখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতর মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখন মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার? মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল, তোমার নাম কি?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী? তাই এমন?

জীব। তাই কেমন?

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি করবো?

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা' আমার বলতে ভয় কি? লোকে বলে জীবানন্দ ঠাকুর বড় গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?"

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই বলে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লুক হে।

জীব। তুমি উল্লুক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি—ঘলায় বায়াবোচাচঃ, তুমি স্তম্ভ্ ভিশ্চ্ শাং—তুমি ষ্টূভিষ্ট্ ষ্যদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল। পরচুলা খসিয়া পড়িবে।

শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা ভণ্ডটা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপ্‌টাইয়া ধরিতে গেল। স্পর্শমাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, "একি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা দেখ গো! একজন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনো না। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেঁচায়; শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ জোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড।" শেষ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিকে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুমুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন? তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমায় বলে মহাবীর?"

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। জোর করিয়া ছাড়াও না।

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিল না যে, তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন, "তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচ্‌কি হাসিয়া বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল, "প্রাণাধিক, আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নইলে স্ত্রী-জাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেমভিক্ষা চাইতে যাব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল, "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। ছি! পুরুষ মানুষের ভালবাসার ভাণ করাকে ধিক্! আমাকে চিনিতেই পারিলে না!"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নইলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নইলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নইলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময় জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল, "কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল, "গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল। 'আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দ ঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ও দিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই থাক্ কি বাঘেই থাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোঁসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।"

শুনিয়া একজন গোঁসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে?"

গোঁসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল, ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল, জীবানন্দ বলিল, "এসো আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?"

শান্তি বলিল, "আমি কেন আসিলাম? তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন?—আমার সখ্। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়?—একটি পুরুষ মানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।"

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। বৃক্ষেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছিঃ! পুরুষ এমন!

উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পঞ্চম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় ভালই করিয়াছিলেন। আমরা শান্তিকে অধিকতর শান্ত ও সংযত দেখিলাম। কিন্তু বিপুল কবিত্বরস হইতে বঞ্চিত হইলাম। সেক্ষপীয়ার প্রণীত Merchant of Veniceর এক স্থানে (Act V. Scene i) Portiaর মুখ হইতে এইরূপে একটা কথা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মূল সংস্করণে ছিল,—I will never come in your bed until I see the ring প্রথম অংশ অশ্লীল বোধে Clarendon seriesএ পরিবর্ত্তিত হইল, লিখিত হইল, "I will never be your wife" এ পরিবর্ত্তনে শ্লীলতা সংরক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যটুকু বিনষ্ট হইল।

আনন্দমঠে আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুই একটি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিলাম:—

উপক্রমণিকা—প্রথম পাতা শেষ ছত্র

বঙ্গদর্শনে আছে—

'আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "প্রিয়জনের প্রাণসর্ব্বস্ব।" এই শেষ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণে লিখিলেন—"ভক্তি।"

ভক্তি কথাটি তদবধি আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

প্রথম সংস্করণে পুস্তক-শেষে যে চারি ছত্র লিখিত ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে সেই ছত্র কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল, বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না, পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর বলেন নাই। সম্ভবতঃ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া বলিতে আর সাহস করেন নাই।

রাধারাণী—পরিচয়

গৃহ-বিগ্রহ রাধাবল্লভজীউর রথযাত্রা প্রতিবৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। পূজনীয় যাদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে বসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। তাহার আত্মীয় স্বজনের বহুসন্ধানার্থ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।

রাজসিংহ—পরিচয়

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার 'রাজসিংহ' সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন ?"

তার কিছু আগে 'রাজসিংহ' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর বাবুর কথার উত্তর করিলেন, "কেহ কেহ বলেন, আমার দুষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলে পিলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"

উত্তরে বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও চন্দ্রশেখর বাবু বলিয়াছিলেন, "মাণিকলালের মত ২।১ টা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।" এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে রাজসিংহ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। *

যুগলাঙ্গুরীয়—পরিচয়

তাম্রলিপ্তের ঘটনা লইয়া যুগলাঙ্গুরীয় রচিত। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায়

* সাধনা তৃতীয় বর্ষ।

পনর বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তমলুকে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তমলুকের ম্যাজিষ্ট্রেট। তমলুক পূর্ব্বে যখন তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিবিধ নামে * পরিচিত ছিল, তখন সমুদ্র তমলুকের পদধৌত করিত।

এক্ষণে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমুদ্র গিয়াছে, রূপনারায়ণ আসিয়াছে। কোথা হইতে কবে এ বিপুলকায় নদ আসিয়া তমলুকের পদনিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিলেন, তখন তমলুকে সে বাণিজ্য নাই, সে শ্রী নাই; কিন্তু স্মৃতি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে কবিকুলতিলক মধুসূদন দত্ত তমলুকে আসিয়াছিলেন; তখন কবিবরের প্রথম যৌবন। তাঁহার মনের গতি চঞ্চল। হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থাশূন্য হইয়া তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা, রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয় দেখিলেন, পুত্রকে কলিকাতার সংসর্গ হইতে দূরে না রাখিলে পুত্র অচিরে ধর্ম্মত্যাগী হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি মধুসূদনকে তমলুকের রাজার ** নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজনারায়ণ বাবু, রাজার উকিল ছিলেন। রাজা সানন্দে তাঁহার উদ্যান-বাটী ছাড়িয়া দিলেন। এই উদ্যান-বাটীর পদনিম্নে রূপনারায়ণ প্রবাহিত। সে উদ্যান, সে বাটীর এক্ষণে চিহ্ন নাই; কেবল কয়েকখানা ইট আছে। কয়েকদিন পরে তাহাও থাকিবে না। মানুষের ধনৈশ্বর্য্যের এইরূপ চিহ্নই থাকে। রাজা বিপন্ন হইয়া একজন দ্বারবানের নামে বাড়ী বেনামী করিলেন। দ্বারবান লুকাইয়া ওয়াট্‌সন কোম্পানীকে বাড়ী বেচিয়া আসিল। কোম্পানীকেও কিছুকাল পরে ডেরাডাণ্ডা উঠাইয়া চলিয়া যাইতে হইল। রূপনারায়ণও দেখিয়া শুনিয়া সরিয়া পড়িল।

কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে আসিয়াছিলেন, তখন সে উদ্যান-বাটী সৌন্দর্য্যশালী ছিল। জানি না কেন, মধুসূদনের তমলুক ভাল লাগে নাই। তিনি তাঁহার সুহৃদ গৌরমোহন বসাককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তমলুককে "nasty place" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "Muse disdains to 'repair' to such a place as I am writing you from, i.e. Tamluk."

কিন্তু গৌর বাবু যখন তমলুকে হাকিম (Sub Divisional officer) হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার তমলুক ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তমলুকে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারও তমলুক ভাল লাগিয়াছিল। সে সময়—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হতশ্রী হইলেও "nasty place" নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিশালহৃদয় রূপনারায়ণে দেখিলেন, "মৃদু পবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয়

---

* তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্ত, তমোলিপ্তী ইত্যাদি

** লোকে রাজা বলিয়া ডাকিত, কিন্তু রাজা নহেন—ক্ষুদ্র জমিদার মাত্র।

শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।” আর বঙ্কিম সেই সমুদ্রবৎ বিপুলকায় রূপনারায়ণ তটোপরি দেখিলেন, “এক বিচিত্র অট্টালিকা। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা।” এই দৃশ্য—তমলুকের এই দৃশ্য—তাঁহার হৃদয়ে গভীর অঙ্গপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা ভোলেন নাই। পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র উঠাইয়া লইয়া যুগলাঙ্গুরীয়তে আঁকিয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর—পরিচয়

প্রতাপ যেখানে বলিতেছেন যে, “তোমার বিষের ভয়ে আমি দেবগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম,” সেই স্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, প্রতাপের অসাধারণ বলবান্ চরিত্রে সেরূপ ভাব কেন? বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, প্রতাপ বস্তুত: অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাঁহার মহত্ত্ব এবং তাহাই প্রকৃতি সঙ্গত। প্রলোভনের নিকট হইতে দূরে থাকাই ভাল।

চন্দ্রশেখর—পরিত্যক্ত অংশ

চন্দ্রশেখর বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে চন্দ্রশেখর উক্ত পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয়। তারপর যখন ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রশেখর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, চন্দ্রশেখর নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। আবার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই নূতন কলেবরের উপর নানা বর্ণের রং দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণ—উপক্রমণিকা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা! (হাসিতে হয় তোমরা হাসিও—আপত্তি নাই। আমি জানি, অঙ্কুরেও বৃক্ষের গুণ আছে। জন্মাবধি মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম স্নেহশালিতা।) বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বন্ধনীর ভিতরের অংশ প্রথম সংস্করণে ছিল, পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ভীমা পুষ্করিণী ছিল—শৈবলিনী, লরেন্স ফষ্টর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছিল। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থারম্ভে দলনী বেগমকে আনা হইল; দ্বিতীয় স্থান শৈবলিনী প্রভৃতিকে দেওয়া হইল।

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ডে “ভ্রাতার স্নেহ” বলিয়া একটা পরিচ্ছেদ ছিল,

পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তা' ছাড়া আরও কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে ; অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

গুরগণ খাঁ বিহ্বলের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দলনী বিবি আবার ফিরিয়া আসিলেন।

গুরগণ খাঁর পদতলে পতিত হইলেন, বলিলেন, "আমি মুখরা বালিকা—কি বলিতে কি বলিলাম—আমার উপর রাগ করিবেন না। নবাবের অনিষ্ট ঘটিলে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করিব। আমায় রক্ষা করুন—ভগিনী বধ করিবেন না। আমায় ক্ষমা করুন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন।"

ভগিনীর কাতরোক্তি শুনিয়া সেনাপতি বলিলেন, "যুদ্ধের কোন সূচনা এখনও হয় নাই। তুমি কেন অনর্থক কাতর হইতেছ ? যুদ্ধ কোথায় ?"

দলনী কহিলেন, "আপনি তবে নৌকা ছাড়িয়া দিউন।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "সে নবাবের ইচ্ছা।"

দলনী দেখিলেন, সকল কথা বৃথা হইল। ভগ্নাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। গমনকালে বলিলেন, "আপনি সাবধান থাকিবেন। আমাকে আপনার শত্রু করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আমি আপনার শত্রুতা করিতে পারি।"

* * *

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুরগণ খাঁ আজ্ঞা করিলেন, "শীঘ্র ঘোড়া লইয়া আইস।"

গুরগণ খাঁর অশ্বালয়ে সর্ব্বদা অশ্ব সজ্জিত থাকিত। তখনই সজ্জিত অশ্ব সম্মুখে আনীত হইল, তদুপরি আরোহণ করিয়া গুরগণ খাঁ অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া দলনীর পূর্ব্বেই দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ রাত্রে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে ?"

প্রহরী চিনিয়া অভিবাদন করিল। কহিল, "হুজুরের হুকুম।"

গুরগণ খাঁ কহিলেন, "আচ্ছা। আমার হুকুম আর তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। বদলির সময়ে এ কথা প্রহরীকে বুঝাইয়া দিও।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রহরী সেলাম করিল। গুরগণ খাঁ ফিরিলেন।

যাইবার সময় পথিমধ্যে গুরগণ খাঁ দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়া গিয়াছিলেন। চিনিয়াছিলেন। দ্রুতবেগে তাহাদিগের পার্শ্ব দিয়া অশ্ব ধাবিত করিয়াছিলেন, রাত্রে তদবস্থায় কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এখন দুর্গদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার সেই দুইজন স্ত্রীলোকের সম্মুখীন হইলেন। তখন অশ্ব থামাইলেন। বলিলেন, বেগম সাহেব, তোমার সঙ্গে কে ? বলা বাহুল্য যে ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি দলনী—পদব্রজে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

দলনী 'বেগম সাহেব' সম্বোধন শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল,—তাহার হৃদয়ের

শোণিত শুকাইয়া গেল—কিন্তু তখনই ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল—উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে কুল্‌সম্—পথিমধ্যে বিপদ্ ঘটাইতেছেন কেন ?"

গুরগণ খাঁ কহিল, "তোমাদের দুর্গপ্রবেশ আমি নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।"

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্ন বল্লরীবৎ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভ্রাতঃ আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না ?"

গুরগণ খাঁ বলিলেন, "আমার গৃহে আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিব। আমার কোন অনুচরের গৃহে তোমার স্থান করিয়া দিব।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে আমার স্থান হইবে।"

তৃতীয় খণ্ডে অগাধ জলে সাঁতারের কথা সকলেরই স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। প্রতাপ জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশিতে জাহ্নবীজলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে শৈবলিনীকে শপথ করাইতেছেন। প্রতাপ বলিতেছেন,—"শপথ কর যে, এ জন্মে আমি তোমার ভ্রাতা—তুমি আমার ভগিনী। তুমি আমার কন্যাতুল্যা—আমি তোমার পিতৃতুল্য—তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ নাই। এ জন্মে তুমি আমাকে অন্য চক্ষে দেখিবে না—অন্যরূপে ভাবিবে না। শপথ কর।"

এ শপথের কথা প্রথম সংস্করণে আছে, পরবর্ত্তী সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণে একটা পরিশিষ্ট ছিল, তৃতীয় সংস্করণে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে সে পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিলাম ;—

পরিশিষ্ট

লরেন্স ফষ্টর, নবাবের তাম্বুর বাহিরে আসিয়া কি করিবেন, কোথা যাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, যবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাঁহার শত্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরাজ-সেনা একদল যবনকে প্রহার করিয়া তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়া যাইতেছিল। ফষ্টর একজন মৃত যবনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া সেই ইংরাজদিগের সঙ্গে মিশিলেন। কিন্তু পরিচ্ছদে ধরা পড়িলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক তাঁহার পরা ছিল না।

সার্জ্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ? পোষাক পর নাই কেন ?"

ফষ্টর বলিল, "আমি লরেন্স ফষ্টর, মুসলমানেরা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "দুইজন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়া যাও। সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে।" যুদ্ধাবসানে লরেন্স ফষ্টর, সেনাপতির নিকট আনীত হইলেন। সেনাপতি দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "জানি। লরেন্স ফষ্টর পলাতক, রাজবিদ্রোহী—যবনসেনামধ্যে পদগ্রহণ করিয়াছে ; উহাকে ফাঁসি দেওয়া যাইবে।"

বিচারান্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়া ফষ্টরের ফাঁসি হইল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে দুই

চারিটা কথা কহিয়াই জানিল যে, শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। আহ্লাদে, সুন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সেই দিনই পুনর্ব্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। রামানন্দ স্বামী আসিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন স্থির করিলেন।

রামানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিলেন। কেন প্রতাপ মরিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলেন না। চন্দ্রশেখর কিয়দ্দিবস প্রতাপের শোকে এত অধীর হইয়া রহিলেন যে, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বিস্মৃত হইয়া রহিলেন। রামানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

নবাব কাসেম আলি খাঁ উদয়নালা হইতে মুঙ্গেরে পলাইলেন। তথায় জগৎ-শেঠদিগকে গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া বধ করিলেন। এবং যে সকল ইংরেজ বন্দী ছিল, তাহাদিগকে সমরুর হস্তে বধ করাইলেন। এই সকল দুষ্কার্য্য করিয়া, মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাটনা যাত্রা করিলেন।

গুরগণ খাঁ অতি চতুর। তিনি নবাবের আদেশ ক্রমে উদয়নালা যাইবার জন্য, নবাবের পশ্চাৎ যাত্রা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উদয়নালা পর্য্যন্ত যান নাই—নবাবের অগ্রেই ফিরিয়াছিলেন, ভাবগতিক বুঝিয়া নবাবের সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, এরূপ কৌশল করিলেন। কিন্তু এক্ষণে নবাবের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইলেন। পথিমধ্যে নবাব, সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা বিদ্রোহের ছল করিয়া গুরগণ খাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তাহার পরে নবাবের অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিল, তাহা ইতিহাসে লিখিত আছে। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরুষোত্তমের যাত্রী হইয়াছিলেন,—বাঙ্গালার শেষ যবন রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিলেন।

কুলসম্ যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের ভৃত্যবর্গের সহিত পলায়ন করিয়াছিলেন। কাসেম আলি ফকিরি গ্রহণ করিলে, সে মীরজাফরের অবরোধে নিযুক্ত হইল। দলনীকে কখনও ভুলিল না।"

কৃষ্ণকান্তের উইল

গোবিন্দলালের অধঃপতনের প্রথম কারণ, রোহিণীর প্রতি তাহার দয়া। গোবিন্দলাল প্রথমবারে চোর রোহিণীকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিল, দ্বিতীয়বারে আত্মঘাতিনী রোহিণীর জীবন রক্ষা করিল। এই দয়া, এই উপকার গোবিন্দলালের

কালস্বরূপ হইল। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে উপকার করে সে উপকৃত ব্যক্তিকে কখন বিস্মৃত হইতে পারে না। গোবিন্দলাল, রোহিণীর উপকার করিয়া, তাহার প্রতি দয়া দেখাইয়া তাহাকে হৃদয়ের একাংশে আসন প্রদান করিল।

গোবিন্দলালের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ হইল, তাহার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ। ভ্রমর যদি গোবিন্দলালের চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ না দিত, তাহা হইলে গোবিন্দলালের হৃদয়ে নিদারুণ অভিমান সঞ্জাত হইবার সুযোগ হইত না। দুর্ব্বলহৃদয় অভিমানী ব্যক্তি মাত্রই মনে করে আমায় যদি লোকে অকারণ চোর মনে করিল, তবে সত্য সত্য চোর হওয়ায় দোষ কি? গোবিন্দলাল যখন দেখিল, তাহার সকল স্নেহের আধার, বিশ্বাসের আধার ভ্রমর তাহাকে অন্য রমণীগত মনে করিয়াছে, তখন আর ভ্রমরের নিকট স্নেহ, বিশ্বাস রাখিবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় কারণ, কৃষ্ণকান্তের শেষ উইল। এই উইল গোবিন্দলালের অভিমান অনলে ফুৎকার প্রদান করিল। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী ও বুদ্ধিমান্ হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়া সমস্ত বিষয় ভ্রমরকে দান করিলেন। গোবিন্দলালের অভিমান সহস্রমুখে গর্জ্জিয়া উঠিল। অভিমানান্ধ হৃদয় লইয়া গোবিন্দলাল গৃহত্যাগ করিল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তিত অংশগুলি লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল শাস্ত্রী মহাশয় "ভারতবর্ষে" একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ; আমি এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন চতুর্থখণ্ডে ১২৮২ সালে ইহার প্রথম নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের বিলোপ সাধন করেন। ১২৮৪ সালে বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেকার অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনের দশম পরিচ্ছেদ হইতে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হয়। দশম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪০৯, ৪৫১, ৫৬১ পৃষ্ঠা দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্ব্বে প্রথম নবম পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িলে ভাল হয় না? কেন না যাহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।' ১২৮৫ সালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দুইটি স্থলে বিশেষ প্রভেদ আছে। গ্রন্থের মধ্যে দুইটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথম পরিবর্ত্তন রোহিণী-চরিত্রে, দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের পরিণামে। কেন এই দুইটী পরিবর্ত্তন হইল ও ইহাতে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কিনা, তাহাই আমাদের বিচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্যান্য পরিবর্ত্তনগুলিও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এইগুলি আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি ও নিজ রচনা সংশোধনপ্রণালীর উদাহরণ

স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রথম পরিবর্ত্তন রোহিণী-চরিত্র। বঙ্গদর্শনের রোহিণী এইরূপ। ব্রহ্মানন্দ যখন হরলালের জাল উইল আসল উইলের পরিবর্ত্তে স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়া হরলালকে টাকা ও জাল উইল ফেরত দিতেছিল, রোহিণী তখন 'বেড়ার গোড়ায় দাঁড়াইয়া' সমস্ত দেখিতেছিল। ব্রহ্মানন্দ টাকা ফেরৎ দিলেন, কিন্তু রোহিণীর মনে অর্থলালসা জাগিয়া উঠিল। সে অর্থলোভে নিজে যাচিয়া হরলালের নিকট উপস্থিত হইল। বঙ্গদর্শনে আছে—

"এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন। তিনি গৃহের বাহির হইলে পর একটা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরলাল তাঁহাকে অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও ?"

স্ত্রীলোকটি দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, "দাসী।"

হর। কেও ? রোহিণী।

স্ত্রীলোকটি বলিল, "আজ্ঞে।"

*　　　　*　　　　*

দুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কাকার কাছে যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কি হইল ?"

হরলাল বিস্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি জন্য আসিয়াছিলাম ?" রোহিণী হাসিয়া মৃদু মৃদু শ্লোক বলিল—

"যাও যাও আর কেলে সোনা কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে।
শুনেছি সব মনের কথা বেড়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে॥"

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বটে, তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই। এখন কি একটা নূতন রোজগারের পন্থা হইল ?"

রো। হইল বই কি ?

হর। কার কাছে ? কর্ত্তার কাছে এ সব কথা যাবে নাকি ?

রো। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে।

হর। কিরূপে ?

রো। তুমি আমাকে ঐ হাজার টাকা দিবে—আমি তোমার উইল বদলাইয়া দিব।

হরলাল বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "সে কি রোহিণী ?" পরে কহিলেন, "আশ্চর্য্যই বা কি ? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে উইল বদলাইবে ?"

রো। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি, আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন।

হর। ফেরৎ ? তবে টাকা আগে দিতে হইবে নাকি ?

রো। সব।

হর। কেন? এত অবিশ্বাস কেন?

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন?

হর। কবে এটা পাবে?

রো। আজিকেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

হরলাল বলিলেন, 'ভাল।' এই বলিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার নোট গণিযা দিলেন।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিম আদ্যন্ত উঠাইয়া দিয়াছেন। উপরের এই কয় পংক্তিতে রোহিণী-চরিত্র কি ঘৃণিত হইযা উঠিয়াছে। সে আড়ি পাতিয়া কথা শুনে, অর্থলোভে জাল উইল বদল করিতে নিজে উপযাচিকা হইযা হরলালের সহিত সাক্ষাৎ করে, নির্লজ্জার মত শ্লোক আওড়ায়, চিরদিন দুষ্কর্ম্মরতা দুর্ব্বৃত্তার ন্যায় আগে টাকা লইতে চায়, শেষে হরলালকে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সাক্ষাৎ করিতে বলে। হরলালের "নূতন রোজগারের পন্থা" কথাটির মধ্যে "নূতন" শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের যদি কোনও ইঙ্গিত অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে রোহিণী-চরিত্রে বড়ই কালিমা পড়ে। আমরা তাহা না হয় না ধরিলাম। কিন্তু আর আর যে দোষগুলি দেখিলাম, তাহা হইতে রোহিণীকে মুক্ত করা অসম্ভব। বঙ্গদর্শনে রোহিণী-চরিত্র বর্ণনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—

"তাহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতি বৎসর মাত্র দেখাইত। * * * নির্জ্জল একাদশী করিত না। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে, সে মাছও খাইত। যখন পাড়ায় বিধবা-বিবাহের হুজুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি।" * * * পল্লীর মেয়েরা যেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের মজলিস্ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী। টপ্পা, শ্যামাবিষয়, কীর্ত্তন, পাঁচালী, কবি রোহিণীর কণ্ঠাগ্রে। শুনা গিয়াছে, রোহিণী ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র অনেক জানিত।"

এ অংশটুকুতেও রোহিণীর নির্লজ্জতা পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি", এ কথা যে রমণী প্রকাশ্যে বলিতে পারে, তাহার নির্লজ্জতা যে চরম সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শনে রোহিণীর আর এক নীচতা ছিল। উইল বদলাইবার সুবিধার জন্য এক নীচ রমণীর প্রলোভন দেখাইয়া রোহিণী কৃষ্ণকান্তের ভৃত্য হরিকে সরাইয়াছিল।

"হরি তখন মতি গোয়ালিনীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী সুন্দরীকে কেবল হরি-মাত্র পরায়ণা মনে করিয়া তাহার সতীত্বের প্রশংসা করিতেছিলেন, সেও রোহিণীর কৌশল। নহিলে দ্বার খোলা থাকে না।" [বঙ্গদর্শন]

আবার ৯ম পরিচ্ছেদে ছিল, "এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া রোহিণী প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল। হরি যথাকালে কৃষ্ণকান্তের শয়ন-কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিয়া যথেপ্সিত স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল।"

এই ঘৃণ্য উপায় রোহিণীর আর এক পাপ।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত পঞ্চম পরিচ্ছেদটী গ্রন্থে আদ্যন্ত উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও তৎপরিবর্ত্তে একটি নূতন পরিচ্ছেদ রচিত হইযাছিল। পুরাতন বঙ্গদর্শন সহজপ্রাপ্য নয়, সেজন্য আমরা এখানে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এই অংশে রোহিণীর বাক্‌চাতুর্য্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

"সুপ্তা সুন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নযনোন্মীলনবৎ, পৃথিবীমণ্ডলে প্রভাতোদয় হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিণীর সহিত হরলাল কথোপকথন করিতেছিল। যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবরমধ্যে সর্পদম্পতী গরল উদ্গীর্ণ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে।

হরলাল বলিল, "তারপর, আমাকে উইলখানি দাও না।"

রো। সে কথা ত বলিয়াছি। উইলখানি আমার নিকটে থাকিবে।

হরলাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। এখন ও উইল আমার।"

রো। আপনারই রহিল। কিন্তু আমার কাছে থাকুক না কেন? আমি ত চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী। ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না, বা আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

হর। তুমি স্ত্রীলোক। কোথায় রাখিবে, কাহার হস্তে পড়িবে, উভয়েই মারা যাইব।

রো। আমি উইল এমত স্থানে রাখিব যে অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না।

হর। তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ। না? কিম্বা গোবিন্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর।

রো। গোবিন্দলালের মুখে আগুন। আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না।

হর। আর যদি কোনও প্রকারে আমি কর্ত্তাকে জানাই যে রোহিণী তাঁহার ঘরে চুরি করিয়াছে।

রো। আমি তাহা হইলে কর্ত্তার নিকটে এই উইলখানি ফিরাইয়া দিব। আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর কথায় করিযাছি। তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনি বিচার করুন। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শূন্যভাগ। আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব।

হরলাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া রোহিণীর হস্তধারণ করিলেন, এবং উইলখানি কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। রোহিণী তখন উইল তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হয় আপনি উইল লইয়া যাউন। আমি কর্ত্তার নিকট সংবাদ দিই যে, তাঁহার উইল চুরি গিয়াছে, তিনি নূতন উইল করুন।"

হরলাল পরাস্ত হইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "তবে অধঃপাতে যাও।"

এই বলিয়া হরলাল সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী উইল লইয়া নিজালয়ে প্রবেশ করিল।"

এই টাকা লইবার পর গোবিন্দলালকে দেখিয়া রোহিণীর মনে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বঙ্গদর্শনে ছিল, পরে বঙ্কিম উহা পরিবর্জ্জিত করেন ;—

"সুমতি বলিতেছেন, 'এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে আছে ?'

কুমতি। হাজার টাকা দেয় কে ? টাকায় কত উপকার।

সুমতি। তা গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায়। তার কাছে ঐ হাজার টাকা লইয়া কেন উইল ফিরাইয়া দাও না ?

কুমতি। টাকা চায় কে ? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে পারিলে টাকাই বা দিবে কেন ? উইল যে বদল হইয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে। তখনই সে কৃষ্ণকান্তকে বলিবে, মহাশয়ের উইল বদল হইয়াছে। নূতন উইল করুন। সে টাকা দিবে কেন ?

সুমতি। ভাল টাকাই কি এত পরম পদার্থ ; কি হইবে টাকায় ? তোমার এতদিন হাজার টাকা ছিল না তাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছিল ? হাজার টাকা কতদিন যাইবে ? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও ; আর কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।" [অষ্টম পরিচ্ছেদ]

এখন দেখা যাক, রোহিণীর চরিত্র-পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? কৃষ্ণকান্তের উইলের চরিত্রগুলির মধ্যে রোহিণী এক প্রধান চরিত্র। রোহিণীই উইল সংক্রান্ত গোলমালে প্রধান কার্য্যকারিণী, রোহিণীই গোবিন্দলালের অধঃপতনে সহায়তাকারিণী। এত বড় একটা চরিত্রকে একেবারে নিছাঁকদুর্ব্ব, ত্তৃতাপূর্ণ করিয়া দোষরাশির সমষ্টিরূপে আঁকিলে পাঠকবর্গের বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও রোহিণীর দিকে থাকে না। নিপুণ লোকের প্রধান কৌশল এই যে পাপীর চিত্র আঁকিলে পাপের প্রতি পাঠকের ঘৃণা জন্মায় বটে, কিন্তু পাপীর প্রতি সহানুভূতি ফুটিয়া উঠে। তাই বঙ্কিম রোহিণী-চরিত্রে এরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন যে, তাহার কলঙ্কিত জীবনের কাহিনীও আমাদের মনে সহানুভূতি জাগাইয়া দেয়। ভোগলালসাপূর্ণ তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে হরলাল কেন প্রলোভন উপস্থিত করিল ? কেন তাহাকে বিবাহ করিবে বলিল ? বঙ্কিম রোহিণী-চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন, রোহিণী টাকার জন্য উইল বদলাইতে যায় নাই। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবে এই আশায় গিয়াছিল। পাছে হরলালের প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগ বিচিত্র বোধ হয়, তাই বঙ্কিম আর একটা উপাখ্যান জুড়িয়া দিলেন। একদিন হরলাল বিপন্ন রোহিণীকে বদ্‌মাইসদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। রোহিণী সেজন্য কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতাকেই অনুরাগের পূর্ব্ব

লক্ষণ বলা যাইতে পারে। আর যৌবনে রোহিণী সংযমে অনভ্যস্তা ছিল, তাই অত শীঘ্র তাহার অধঃপতন হইল। রোহিণী উইল চুরি করিতে গিয়াছিল, কতকটা যেন এই কৃতজ্ঞতায়, কতকটা যেন বিবাহ-লালসায়। রোহিণী হরলালের বিবাহিতা পত্নী হইতে চাহিয়াছিল। অন্য কোনও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ তাহার অভিপ্রেত ছিল না। পরে গোবিন্দলালের সহিত তাহার নিকৃষ্ট সম্বন্ধ কেন হইল, তাহার বিচারের স্থল এ নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রোহিণীর মন যে পাপরতা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে পাই নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর যে ঘৃণিত চরিত্র বঙ্কিম আঁকিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের মনে কেবল ঘৃণার পূর্ণ স্রোত প্রবাহিত করিতে সমর্থ। সহানুভূতির লেশমাত্রও তাহাতে উদয় হইত না। তাই রোহিণীর কেবল পাপভরা জীবনের বদলে তাহার ক্রমশঃ অধঃপতন বঙ্কিম আঁকিয়াছেন। তাই নির্লজ্জতার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা মুখরা রোহিণীরও লজ্জাবিজড়িত ভাব দেখিতে পাই। তাই সন্তুষ্ট চিত্তে নিম্নোদ্ধৃত পরিবর্ত্তিত অংশ পাঠ করি :—

"হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এই কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

ঐ পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র আবার লিখিলেন, "হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকট রাখিল। দেখিয়া রোহিণী বলিল, 'নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

"হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।" পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, রোহিণী টাকার লোভে উইল বদলানরূপ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। হরলালকে বিবাহ করিবে এই আশাই তাহার ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনে রোহিণী যেভাবে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সে অর্থলোভে পড়িয়াছিল, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নোট ফেরৎ দিবার প্রসঙ্গ বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিতরূপ ছিল। রোহিণী কেন জাল উইল রাখিয়াছিল, গোবিন্দলাল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী বলিল "হরলাল বাবুর অনুরোধে।"

"গোবিন্দলাল অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিলেন দেখিয়া রোহিণী বলিল 'তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আনিয়া দেখাইতেছি।' * * *

"গোবিন্দলাল বলিলেন—'আমার কথা শুন। আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও। সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাহার

কাছে পাঠাইয়া দিব। * * *

"রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে হরলাল দত্তের নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল, কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া নোটগুলির উপর পা রাখিয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল। * * *

"রোহিণী উঠিয়া, নোট গুড়াইয়া লইয়া……গোবিন্দলালের কাছে নোট ফিরাইয়া দিল।……গোবিন্দলাল হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যেজন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।"

রোহিণী-চরিত্র হইতে এই হীনতাটুকু অপসারিত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তনে রোহিণী-চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে চিত্রিত রোহিণী অপেক্ষা গ্রন্থে চিত্রিত রোহিণী বহুল অংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

এই সঙ্গে আর একটি ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করা উচিত। কৃষ্ণকান্ত যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া ছুটিলেন। তাহার পর বঙ্গদর্শনে ছিল—

"মনে মনে স্থির সংকল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র পরে ইহা উঠাইয়া দেন। রসিকতা হিসাবেও ইহা কিছুই নহে, অতএব অনর্থক বৈদ্যকে 'হাতুড়ে কবিরাজ' করিয়া কোনও লাভ নাই। কাজেই বৈদ্য-চরিত্রটিও পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিবার পর, বঙ্গদর্শনে ছিল, "গোবিন্দলাল জানিতেন, যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দারা নিঃশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে।" পরে এটুকু উঠাইয়া দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র স্থলে স্থলে গোবিন্দলাল সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশের সময় তাহা পরিহার করিয়াছেন। তাহা সমীচীন হইয়াছে, কেন না পাঠক ও সমালোচক নিজেই তাহার বিচার করিবেন, গ্রন্থকারের মধ্যবর্ত্তিতার কোনও প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকার কিছু না লিখিলেই সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন থাকিবে। পরিবর্জ্জিত মন্তব্যগুলি এই—

জলমগ্না রোহিণীকে গোবিন্দলাল যখন উদ্ধার করিল, তখন বঙ্গদর্শনে মন্তব্য ছিল, "আজি গোবিন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোনা বুঝা যাইবে।"

গোবিন্দলালের অধঃপতনের প্রারম্ভে মন্তব্য ছিল, "গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ঈশ্বরের

জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধন জন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোনও কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নাই। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"

অবস্থানে প্রযুক্ত রসিকতা যে বিসদৃশ শুনায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। তাই কন্যার দুঃখে ব্যাকুলহৃদয় মাধবীনাথের মুখে বঙ্গদর্শনে যে পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে উচ্চারণ প্রযুক্ত হইয়াছিল, বঙ্কিম পরে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে ছিল—

মাধবীনাথ। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নিশাকর। কোথায়?

মা। জিলা জশ্—শ্—শর—

নি। জশ্—শরে কেন?

মা। নীলকুটি কিনূব।"

পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়—

মা। কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?

নি। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুটি কিনূব।"

ঘটনা অসম্ভব বলিয়া যাহাতে বোধ না হয়, সে দিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। গোবিন্দলালকে ভ্রমর শেষ যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এইভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়—

"এই পাঁচ বৎসরে আমি কয় লক্ষ টাকা জমাইয়াছি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। পাঁচ হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব। বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।"

পরে "কয় লক্ষ" স্থলে "অনেক টাকা" "পঁচিশ হাজার" স্থলে "আট হাজার", "পাঁচ হাজার" স্থলে "তিন হাজার," ও "বিশ হাজার" স্থলে "পাঁচ হাজার" লিখিত হয়। এ পরিবর্ত্তন সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত টিপ্পনীটি রোহিণীর মৃত্যুবর্ণনার কৈফিয়ৎ। সেটি এই —"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা তিনি না বুঝিয়া, এ কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে

উপন্যাস-পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

[বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, মাঘ]

আর প্রধান পরিবর্ত্তন গোবিন্দলালের শেষজীবনের ইতিহাস। বঙ্গদর্শনে লিখিত হয় গোবিন্দলাল আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। রোহিণীর মূর্ত্তি যখন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলালের সম্মুখে দণ্ডায়মানা বলিয়া প্রতিভাত, রোহিণীর "প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" উক্তি যখন বিকৃত-মস্তিষ্ক গোবিন্দলালের কর্ণে ধ্বনিত বলিয়া বোধ হইতেছিল, তখন নিম্নলিখিতরূপে বঙ্গদর্শনে গোবিন্দলালের পরিণাম সূচিত হইয়াছিল।

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন। পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

এই আত্মহত্যা গোবিন্দলালের তৎকালীন মানসিক অবস্থায় সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত হয় না। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কলুষিত চিন্তা পরিহার করিয়া ভগবানের চরণ ধ্যানে শান্তিলাভই বাঞ্ছনীয়। তাই বঙ্কিম পরে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন—

"গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন; তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপান-শিলার উপরে পতিত হইলেন। মুগ্ধাবস্থায় মানস-চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীর মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল। ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। একরাত্রে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।"

ভ্রমরের অনুরোধে গোবিন্দলাল ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। অনুতাপে নির্ম্মলচিত্ত হওয়াতে শান্তিলাভও করিলেন। পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কিয়দংশ সংযোজিত করিয়া বঙ্কিম তাহা দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শনে ইহা ছিল না। "ভ্রমরের

মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীকান্ত সেইখানে ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।" শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইল। সন্ন্যাসী বলিল, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিল, "বিষয় আপনার। আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন "বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে কাজ নাই, তুমিই উহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীত ভাবে বলিল, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি, তিনিই আমার ভ্রমর। ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।"

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমে নিরাশ হইয়া নায়ক বা নায়িকার আত্মহত্যা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টর হিউগোর Toilers of the sea উপন্যাসের নায়ক মনের মত রমণীকে পরের হাতে সঁপিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। আমাদের দেশের প্রকৃতি অন্যরূপ। আজকাল পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির অনুকরণে এইরূপ আত্মহত্যা সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে অমরনাথকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করান নাই। পূর্ব্বোক্ত Toilers of the sea উপন্যাসের নায়কের যে দশা, অমরনাথেরও সেই দশা। কিন্তু অমরনাথ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিল, আর পূর্ব্বোক্ত নায়ক আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এইখানে প্রভেদ। আয়েষাও প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের মৃত্যু আত্মহত্যা নহে—আত্মোৎসর্গ। গোবিন্দলালের পরিণাম প্রথমে বঙ্কিম যেরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য ভাবের প্রেরণাতেই ঘটিয়াছিল। পরে প্রাচ্যভাবের অনুসরণে আত্মঘাতী গোবিন্দ-লালের পরিবর্ত্তে অনুতাপবিশুদ্ধহৃদয় ভগবৎপদে সমর্পিতপ্রাণ গোবিন্দলালের চিত্র

অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণী-চরিত্র ও গোবিন্দলালের পরিণাম, এই দুইটির পরিবর্ত্তনই "কৃষ্ণকান্তের উইলে" প্রধান। কারণসহ এই পরিবর্ত্তন দুটি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি।

দেবী চৌধুরাণী

এই গ্রন্থ সমালোচনা কালে বন্ধুবর পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা নারায়ণে লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার culture বা অনুশীলন তত্ত্বের সাহায্যে একটা মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবার ground বা চিত্রের ক্ষেত্র রচিবার প্রয়াসটা বেশ পরিস্ফুট। দেবীচৌধুরাণীর ক্ষেত্র অতি সুন্দর না হইলেও মনোহর বটে। দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তি-মূর্ত্তি—কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে ; অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব বৈষ্ণব ঠাকুরাণী। যখন শক্তি-মূর্ত্তি তখন পুরুষ সম্মূঢ়, ব্রজেশ্বর পিতৃশাসনে সম্মূঢ়, প্রফুল্লর রূপে সম্মূঢ়। এই পুরুষের তৃপ্তি-তুষ্টি সাগর বৌ, বিরক্তি ও বিধৃতি নয়ান বৌ এবং ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা প্রফুল্ল বা দেবীচৌধুরাণী। প্রফুল্লকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালিনী করিতে যাইয়া কবি গোলে পড়িয়াছেন। প্রফুল্লকে একরাত্রির জন্য স্বামিসঙ্গে সুখী করিয়া কবি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের পথে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণাম দেবীরাণীর ব্রজেশ্বরের গৃহে আসিয়া বাসন মাজা—ঘর-সংসার দেখা। যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোনা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই। যেন প্রফুল্ল আসাতেই নয়ান বৌয়ের ঝগড়া থামিল, সাগর বৌয়ের অভিমান দূর হইল, আর ব্রজেশ্বর যেন "নিত্য সর্ব্বগত স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ" পুরুষের হিসাবে, প্রফুল্লের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রফুল্ল, সাগর ও নয়ান বৌ—এই তিন গুণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই তিনের সমাধান করিলেন প্রফুল্ল, সংসারে একটা negative সুখের বা স্বস্তির লহর তুলিলেন প্রফুল্ল, ফলভোগী হইল ব্রজেশ্বর। এইটুকুর জন্য প্রফুল্লকে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞান সবই শিখিতে হইল, কুস্তী করিতে হইলে, লাঠি খেলিতে হইল, নানা ভঙ্গীতে ত্যাগের মক্স করিতে হইল, দেবীরাণীর দোকানদারী বসাইতে হইল, ডাকাতের দলের সর্দ্দার হইতে হইল! ভবানী পাঠকের গুরুগিরির পর্য্যাবসান হইল সাদামাঠা গৃহস্থের কুলাঙ্গনার ঘর-গৃহস্থালীর কার্য্যে—বাসনমাজায় ও সপত্নী বশীকরণে। আদিরসের কবি আদিরসটুকু ভুলিতে

পারেন নাই, domesticityর লোভটুকু সাম্‌লাতেই পারেন নাই। এতটা শিক্ষার পরেও প্রফুল্ল বৈষ্ণবী হইতে পারিলেন না, তান্ত্রিক মতে শাক্ত ভৈরবী হইতেও পারেন নাই। ঝান্সীর রাণীর বা রাণী দুর্গাবতীর বা বাঙ্গালার সোনা বিবির এত শিক্ষা হয় নাই, তথাপি তাঁহারা শক্তিরূপিণী ছিলেন, অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার বহুগ্রামে অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী সংযমপরায়ণা বহু ভৈরবী ও বৈষ্ণবী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের আদর্শও প্রফুল্লের পরিণতি অপেক্ষা অতি উচ্চ স্তরের। গীতার হিসাবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিষ্কাম ধর্ম্মের ছবি আঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রফুল্লের স্বামি-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রফুল্ল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়; উহাকে শাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনেব মাপ-কাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ব্রজেশ্বরে শিবত্বের আরোপ করিয়া প্রফুল্লকে শক্তিরূপে খাড়া করিতেন, তাহা হইলে ব্রজেশ্বরের চিত্র অন্য প্রকারের হইত, প্রফুল্লও আরও একটু ফুটিত। অথবা যদি প্রফুল্লকে বৈষ্ণবী সাজাইতেন তাহা হইলে উহাতে হয় সুভদ্রার নহেত রুক্মিণীর ছায়া পড়িত। দুইয়ের কোনটাই প্রফুল্লে পবিস্ফুট হয় নাই। এত করিয়াও যখন প্রফুল্লের স্বামীর ঘর করিবার আকাঙ্ক্ষা ঘুচে নাই, যখন সাগর বৌকে বজরায় ডাকিয়া রঙ্গভঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই, তখন প্রফুল্লে নিষ্কাম ধর্ম্মের-গীতাতত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ গীতার সিদ্ধান্ত সকলের ছড়াছড়ি দেবীচৌধুরাণীতে করা হইয়াছে। সাধক ভবানী পাঠকের আলেখ্য কোন বিষম দোষ দেখি না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রজেশ্বরের মতন পিতৃভক্ত বাঙ্গালী যুবক অনেক ছিল, ব্রজেশ্বরের জনকের মতন বিষয়ী বাঙ্গালী কর্ত্তা ব্যক্তি অনেক দেখিয়াছি, সাগর বৌ, নয়ান বৌ যে দুই একটা দেখি নাই তাহা নহে; কিন্তু প্রফুল্ল-চরিত্র অপূর্ব্ব; উহা বাঙ্গালার নহে, অথচ বেশ বাঙ্গালীয়ানা মাখান। উহা বাঙ্গালীর ঘরে কখনও ছিল না; বাঙ্গালীর ঘরে কখনও হইবে না। যে উদ্ভটতা শান্তিতে আছে, সে উদ্ভটতা প্রফুল্লেও ফুটিয়াছে। কোনটা বাঙ্গালার নহে, ভারতবর্ষের নহে, অথচ কোনটাকেই বাঙ্গালিত্বের গণ্ডী হইতে বাহিরে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের এইটুকুই কারিগরী—এইটুকুই শিল্প-নৈপুণ্য।

ইন্দিরা—পরিচয়

'ইন্দিরা' ১২৮০ সালে পুস্তকাকারে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার আকার অতি ক্ষুদ্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কনের সময় 'ইন্দিরা', 'উপকথা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্থবারে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। পঞ্চমবারে

"ইন্দিরা" বিপুলাকার ধারণ করিল। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের মূল্য ছিল চারি আনা—পঞ্চম সংস্করণে মূল্য হইল দেড টাকা। এই অনুপাতে আকারও বাড়িল। পনরটি নূতন পরিচ্ছেদ এই বর্দ্ধিত সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল।

পুস্তকখানি নূতন আকার ধারণ করিলেও মূল আখ্যানাংশের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আগে র-বাবু ও সুভাষিণী ছিল না, তাহারা আসিল; নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া আসিল।

প্রথম বারের মুদ্রিত গ্রন্থের যে যে অংশ পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"হারাণী নামে রামরাম দত্তের একজন পরিচারিকা ছিল। আমার সঙ্গে তাহার বড ভাব—সেও দাসী, আমিও দাসী—না হইবে কেন? আমি তাহাকে বলিলাম, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর্। ঐ বাবুটী কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী মৃদু হাসিল। বলিল, "ছি দিদি ঠাকরুণ। তোমার এ রোগ আছে, তা জানিতাম না।"

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, "মানুষের সকল দিন সমান যায না। এখন তুই গুরুমহাশয়গিরি রাখ্—আমার এ উপকার করবি কি না বল্?"

হারাণী বলিল, "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারো জন্য হইলে করিতাম না।"

হারাণীর নীতিশিক্ষা এইরূপ।

হারাণী স্বীকৃতা হইয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। ততক্ষণ আমি কাটামাছের মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। চারিদণ্ড পরে হারাণী ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "বাবুর অসুখ করিয়াছে—বাবু এ বেলা যাইতে পারিলেন না—আমি তাঁহার বিছানা লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কি জানি যদি অপরাহ্ণে চলিয়া যান,—তুই একটু নির্জ্জন পাইলেই তাঁহাকে বলিস্ যে আমাদের রাঁধুনী ঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এ বেলা আপনার খাওয়া ভাল হয় নাই, রাত্রি থাকিয়া খাইয়া যাইবেন। কিন্তু রাঁধুনীর নিমন্ত্রণ কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিবেন না। কোনও ছল করিয়া থাকিবেন।' হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি।" কিন্তু দৌত্য স্বীকৃত হইয়া গেল। হারাণী অপরাহ্নে আসিয়া আমাকে বলিল, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা বলিয়াছি। বাবুটি মানুষ ভাল নহেন—রাজি হইয়াছেন।"

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকে একটু নিন্দা করিলাম। আমি চিনিয়াছিলাম যে, তিনি আমার স্বামী, এই জন্য যাহা করিতেছিলাম, তাহাতে আমার বিবেচনায় দোষ ছিল না। কিন্তু তিনি যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এমত কোনও মতেই সম্ভবে না। আমি তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—

এজন্য আমার প্রথম সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি আমাকে একাদশ বৎসরের বালিকা দেখিয়াছিলেন মাত্র। তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, এমত কোনও লক্ষণও দেখি নাই। অতএব তিনি আমাকে পরস্ত্রী জানিয়া যে আমার প্রণয়াশায় লুব্ধ হইলেন, শুনিয়া মনে মনে নিন্দা করিলাম। কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী—তাঁহার মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য বলিয়া সে কথার আর আলোচনা করিলাম না। মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কখন দিন পাই, তবে এ স্বভাব ত্যাগ করাইব।

অবস্থিতি করিবার জন্য তাঁহাকে ছল খুঁজিয়া বেড়াইতে হইল না। তিনি কলিকাতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। রামরাম দত্তের সঙ্গে তাঁহার দেনা পাওনা ছিল। সেই সূত্রেই তাঁহার নূতন আত্মীয়তা। অপরাহ্নে হারাণীর কথায় স্বীকৃত হইয়া রামরামের সঙ্গে পুনশ্চ সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "যদি আসিয়াছি, তবে একবার হিসাবটা দেখিয়া গেলে ভাল হইত।" রামরাম বাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি? কিন্তু কাগজ-পত্র সব আড়তে আছে, আনিতে পাঠাই। আসিতে রাত্র হইবে। যদি অনুগ্রহ করিয়া কাল প্রাতে একবার পদার্পণ করেন—কিম্বা অদ্য অবস্থিতি করেন, তবেই হইতে পারে।" কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "তাহার বিচিত্র কি? এ আমারই ঘর। একবারে কাল প্রাতেই যাইব।"

পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে ভূরিভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

আমিই মাতাকে বলিলাম, "আমি আসিয়াছি, এ কথা তাঁহাকে জানাইও না। আমি এতদিন ঘরে ছিলাম না, কি জানি তিনি যদি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তবে আসিবেন না। অন্য কোন ছলে এখানে তাঁহাকে আনাও। তিনি এখানে আসিলে আমি সন্দেহ মিটাইব।"

মাতা এ কথা পিতাকে বলিলে তিনি সম্মত হইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমি উইল করিব। তুমি আমার জামাতা এবং পরম আত্মীয় আর সদ্বিবেচক। অতএব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উইল করিব। তুমি পত্র পাঠ এখানে আসিবে।" তিনি পত্র পাঠ আসিলেন। তিনি এখানে আসিলে পিতা তাঁহাকে যথার্থ কথা জানাইলেন।

শুনিয়া স্বামী মৌনাবলম্বন করিলেন। পরে বলিলেন, "আপনি পূজ্য ব্যক্তি। যে ছলেই হউক এখানে আসিয়া যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম, ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনার কন্যা এতদিন গৃহে ছিল না—কোথায় কি চরিত্রে কাহার গৃহে ছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অতএব তাহাকে আমি গ্রহণ করিব না।"

পিতা মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইলেন। এ কথা মাতাকে বলিলেন, মা আমাকে বলিলেন। আমি সমবয়স্কদিগকে বলিলাম, "তোমরা উঁহাদিগকে চিন্তা করিতে মানা কর। তাঁকে একবার অন্তঃপুরে আন—তাহা হইলেই আমি উঁহাকে গ্রহণ করাইব।"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না ; বলিলেন, "আমি সে স্ত্রীকে গ্রহণ করিব না, তাহাকে সম্ভাষণ করিব না।" শেষে মাতার রোদন ও সমবয়স্ক-দিগের ব্যঙ্গের জ্বালায় সন্ধ্যার পর জল খাইতে আসিলেন।

তিনি জলযোগ করিতে আসনে বসিলেন। কেহ তাঁহার নিকট দাঁড়াইল না—সকলেই সরিয়া গেল। তিনি অন্যমনে, মুখ নত করিয়া, আহার করিতেছিলেন, এমত সময়ে আমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁ দেখ, কামিনী, তুই আজও কি কচি খুকি যে আমার ঘাড়ের উপর পড়িস্?"

কামিনী আমার কনিষ্ঠ ভগিনীর নাম।

আমি বলিলাম, "আমি কামিনী নই, কে বল, তবে ছাড়িব।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "এ কি এ?"

আমি তাঁহার চক্ষু ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "চতুরচূড়ামণি! আমার নাম ইন্দিরা—আমি হরমোহন দত্তের কন্যা, এই বাড়ীতে থাকি। আপনাকে প্রাতঃপ্রণাম—আপনার কুমুদিনীর মঙ্গল ত?"

তিনি অবাক হইলেন। আমাকে দেখিয়া যে তাঁহার আহ্লাদ হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম। বলিলেন, "এ আবার কোন রঙ্গ কুমুদিনী? তুমি কোথা হইতে?" আমি বলিলাম, "কুমুদিনী আমার আর একটি নাম। তুমি বড় গোবর-গণেশ, তাই এতদিন আমাকে চিনিতে পার নাই। কিন্তু তোমাকে যখন রামরাম দত্তের বাড়ী ভোজন করিতে দেখিয়াছিলাম, আমি তখনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম। নচেৎ সে দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম না। প্রাণাধিক—আমি কুলটা নহি।"

তিনি একটু আত্মবিস্মৃতের মত হইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এতদিন এত ছলনা করিয়াছিলে কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি প্রথম সাক্ষাতের দিনে বলিয়াছিলে যে, তুমি স্ত্রী পাইলেও গ্রহণ করিবে না। নচেৎ সেই দিন পরিচয় দিতাম।" দানপত্রখানি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলাম। তাহা খুলিয়া দেখাইয়া বলিলাম, "সেই রাত্রেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, হয় তুমি আমায় গ্রহণ করিবে, নচেৎ আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই এইখানি লেখাইয়া লইয়াছি। কিন্তু ইহা আমি ভাল করি নাই। তোমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছি। তোমার অভিরুচি হয় আমি উঠান ঝাঁট দিয়া খাইব—তাহা হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব, দানপত্র আমি এই নষ্ট করিলাম।"

এই বলিয়া সেই দানপত্র তাঁহার সম্মুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলাম।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার আমার সর্ব্বস্ব। তোমায় ত্যাগ করিলে আমি প্রাণে মরিব। তুমি আমার গৃহে গৃহিণী হইবে চল।"

মৃণালিনী

মৃণালিনীর প্রথম দুই পরিচ্ছেদ সপ্তম বা অষ্টম সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেই দুই পরিচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রঙ্গভূমি

মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি তুর্কস্থানীয় কুতব-উদ্দীন, যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন। দিল্লী, কান্যকুব্জ, মগধাদি প্রাচীন সাম্রাজ্য সকল যবন করকবলিত হইয়াছে। অশোক বা হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য বা শিলাদিত্য ইহাদের পরিত্যক্ত ছত্রতলে যবনমুণ্ড আশ্রিত হইয়াছে। যবনের শ্বেতছত্রে সকলের গৌরব ছায়ান্ধকারব্যাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ৬০৬ অব্দে যবন কর্তৃক মগধ জয় হইল। প্রভূত রত্নরাশি সঞ্চিত করিয়া বিজয়ী সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজ-প্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন প্রদান করিলেন।

কুতব-উদ্দীন প্রসন্ন হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে পূর্ব্ব ভারতের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। গৌরবে বখ্‌তিয়ার খিলিজি রাজ-প্রতিনিধির সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন।

কেবল ইহাই নহে, বিজয়ী সেনাপতির সম্মানার্থে কুতব-উদ্দীন মহাসমারোহ-পূর্ব্বক উৎসবাদির জন্য দিনাবধারিত করিলেন।

উৎসববাসর আগত হইল। প্রভাতাবধি "রায় পিথোরার" প্রস্তরময় দুর্গের প্রাঙ্গণভূমি জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। সশস্ত্রে, শত শত সিন্ধুনদপারবাসী শ্মশ্রুল যোদ্ধৃবর্গ রঙ্গাঙ্গনের চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহাদিগের করস্থিত উন্নত-ফলক বর্শার অগ্রভাগে প্রাতঃসূর্য্যকিরণ জ্বলিতে লাগিল। মালাসংবদ্ধ কুসুমদামের ন্যায় তাহাদিগের বিচিত্র উষ্ণীষশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। তৎপশ্চাতে দাস, শিল্পী প্রভৃতি অপর মুসলমানেরা বিবিধ বেশভূষা করিয়া দণ্ডায়মান হইল। যে দুই একজন হিন্দু কৌতূহলের একান্ত বশবর্ত্তী হইল, সাহসে ভর করিয়া রঙ্গদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা তৎপশ্চাতে স্থান পাইল, অথবা স্থান পাইল না, কেন না, যবনদিগের বেত্রাঘাত-পীড়িত এবং ভীত হইয়া অনেককে পলায়ন করিতে হইল।

রাজপ্রতিনিধি সদলে সমাগত হইয়া রঙ্গাঙ্গনের শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন রহস্য আরম্ভ হইল। প্রথমে মল্লদিগের যুদ্ধ, পরে খড়্গী, শূলী, ধানুকী সশস্ত্র অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে মত্ত সেনামাতঙ্গ সকল মাহুত-সহিত আনীত

হইয়া নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে লাগিল। দর্শকেরা মধ্যে মধ্যে একতানমনে ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আপন আপন মন্তব্য সকল পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। একস্থানে কয়েকটি বর্ষীয়ান মুসলমান একত্র হইয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন।

একজন কহিল, "সত্য সত্যই কি পারিবে ?"

অপর উত্তর করিল, "না পারিবে কেন ? ঈশ্বর যাহাকে সদয়, সে কি না পারে ? রোস্তম পাহাড় বিদীর্ণ করিয়াছিল, তবে বখ্‌তিয়ার যুদ্ধে একটা হাতী মারিতে পারিবে না ?"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "তথাপি উহার ঐ ত বানরের ন্যায় শরীর, এ শরীর লইয়া মত্তহস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে সাহস করা পাগলের কাজ।"

প্রথম প্রস্তাবকর্ত্তা কহিল, "বোধ হয় খিলিজি-পুত্র এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছে ; সেই জন্য এখনও অগ্রসর হইতেছে না।"

আর এক ব্যক্তি কহিল, "আরে, বুঝিতেছ না, বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর জন্য পাঁচ জন ষড়যন্ত্র করিয়া এই এক উপায় করিয়াছে। বেহার জয় করিয়া বখ্‌তিয়ারের বড় দম্ভ হইয়াছে। আর রাজপ্রাসাদ সকলই তিনি একক ভোগ করিতেছেন। এই জন্য পাঁচ জনে বলিল যে, বখ্‌তিয়ার অমানুষ বলবান, চাহি কি মত্ত হাতী একা মারিতে পারে। কুতব-উদ্দীন তাহা দেখিতে চাহিলেন। বখ্‌তিয়ার দম্ভে লঘু হইতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন।"

এই বলিতে বলিতে রঙ্গাঙ্গনমধ্যে তুমুল কোলাহলধ্বনি সংঘোষিত হইল। দ্রষ্টৃবর্গ সভয়চক্ষে দেখিলেন, পর্ব্বতাকার শ্রাবণের দিগন্তব্যাপী জলদাকার এক মত্ত মাতঙ্গ মাহুত কর্ত্তৃক আনীত হইয়া, রঙ্গাঙ্গনমধ্যে দুলিতে দুলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মুহুর্মুহুঃ শুণ্ডাস্ফালন, মুহুর্মুহুঃ বিপুল কর্ণতাড়ন, এবং বিশাল বঙ্কিম দন্তদ্বয়ের অমলশ্বেত স্থির শোভা দেখিয়া দর্শকেরা সভয়ে পশ্চাদ্গত হইয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাদপসারী দর্শকদিগের বস্ত্রমর্ম্মরে, ভয়সূচক বাক্যে, এবং পদধ্বনিতে কিয়ৎক্ষণ রঙ্গাঙ্গনমধ্যে অস্ফুট কলরব হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সে কলরব নিবৃত্ত হইল।

কৌতূহলের আতিশয্যে সেই জনাকীর্ণ স্থল একেবারে শব্দহীন হইল। সকলে রুদ্ধনিশ্বাসে বখ্‌তিয়ার খিলিজির রঙ্গপ্রবেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন বখ্‌তিয়ার খিলিজিও রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া গজরাজের সম্মুখীন হইয়া দেখা দিলেন। যাহারা পূর্ব্বে তাঁহাকে চিনিত না, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, অপিচ বিরক্ত হইল। তাঁহার শরীরে বৈর-লক্ষণ কিছুই ছিল না। তাঁহার দেহের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, গঠন অতি কদর্য্য। শরীরের সকল স্থানই দোষবিশিষ্ট। তাঁহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল। "আজানুলম্বিত বাহু" সুলক্ষণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু দেখিতে কদর্য্য সন্দেহ নাই। বখ্‌তিয়ারের বাহুযুগল জানুর অধোভাগ পর্য্যন্ত লম্বিত, সুতরাং অরণ্যনরের সহিত তাঁহার দৃশ্যগত সাদৃশ্য

লক্ষিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া একজন মুসলমান আর একজনকে কহিল, "ইনিই বেহার জয় করিয়াছেন ? এই শরীরে এত বল ?"

একজন অস্ত্রধারী হিন্দু যুবা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "পবননন্দন হনু কলিকালে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "তুই কি বলিস্ রে কাফের ?"

হিন্দু পুনরপি কহিল, "পবননন্দন কলিতে মর্কটরূপ ধারণ করিয়াছেন।"

যবন কহিল, "আমি তোর কথা বুঝিতে পারিতেছি না, তুই তীর-ধনু লইয়া আসিয়াছিস কেন ?"

হিন্দু কহিল, "আমি বাল্যকালে তীর-ধনু লইয়া খেলা করিতাম। সেই অবধি অভ্যাসদোষে তীর-ধনু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

যবন কহিল, "হিন্দুদিগের সে অভ্যাসদোষ ক্রমে ঘুচিতেছে। এ খেলায় আর এখন কাফেরের সুখ নাই। সুভান এল্লা! এ কি ?"

এই বলিয়া যবন রঙ্গভূমি প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিল। বখ্তিয়ার নিজ দীর্ঘভুজে এক শাণিত কুঠার ধারণ করিয়া বারণরাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু বারণ তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া ইতস্ততঃ সমযোগ্য প্রতিযোগীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় একজন মনুষ্য যে তাহার রণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তাহার হস্তিবুদ্ধিতে উপজিল না। বখ্তিয়ার মাহুতকে অনুজ্ঞা করিলেন যে, হস্তীকে তাড়াইয়া আমার উপর দাও। মাহুত গজশরীরে চরণাঙ্গুলি-সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বখ্তিয়ারকে আক্রমণ করিল। বখ্তিয়ার নিমেষমধ্যে করিশুণ্ড-প্রক্ষেপ হইতে ব্যবহিত হইয়া শুণ্ডোপরি তীব্র কুঠারাঘাত করিল। যূথপতি ব্যথায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধে পতনশীল পর্ব্বতবৎ বেগে প্রহারকারীর প্রতি ধাবমান হইল। কুঠারাঘাতে সে বেগরোধের কোন সম্ভাবনা রহিল না। দ্রষ্টৃবর্গ সকলে দেখিল যে, পলকমধ্যে বখ্তিয়ার কর্দ্দম-পিণ্ডবৎ দলিত হইবেন। সকলে বাহূত্তোলন করিয়া "পলাও, পলাও" শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু বখ্তিয়ার মগধ জয় করিয়া আসিয়া রঙ্গভূমে পলায়নতৎপর হইবেন কি প্রকারে ? তিনি তদপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া হস্তিপদতলে প্রাণত্যাগ মনে মনে স্বীকার করিলেন।

করিরাজ আত্মবেগভরে তাঁহার পৃষ্ঠের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল; একেবারে বখ্তিয়ারকে দলিত করিবার মানসে নিজ বিশাল চরণ উত্তোলন করিল; কিন্তু তাহা বখ্তিয়ারের স্কন্ধে স্থাপিত হইতে না হইতেই ক্ষয়িতমূল অট্টালিকার ন্যায়, সশব্দে রজ উৎকীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ যূথপতি ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি তাহার মৃত্যু হইল।

যাহারা সবিশেষ দেখিতে না পাইল, তাহারা বিবেচনা করিল যে, বখ্তিয়ার খিলিজি কোন কৌশলে হস্তীর বধসাধন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মুসলমানমণ্ডলীমধ্যে

ঘোরতর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু অন্যে দেখিতে পাইল যে হস্তীর গ্রীবার উপর একটি তীর বিদ্ধ রহিয়াছে। কুতব-উদ্দীন বিস্মিত হইয়া সবিশেষ জানিবার জন্য মৃত গজের নিকট আসিলেন, এবং স্বীয় অস্ত্রবিদ্যার প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, এই শরবেধই হস্তীর মৃত্যুর একমাত্র কারণ; বুঝিলেন যে, শর অসাধারণ বাহুবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্থূল হস্তিচর্ম্ম, তৎপরে হস্তিগ্রীবার বিপুল মাংসরাশি ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক বিদ্ধ করিয়াছে। শরনিক্ষেপকারীর আরও এক অপূর্ব্ব নৈপুণ্য-লক্ষণ দেখিলেন। গ্রীবার যে স্থানে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডমধ্যস্থ মজ্জার সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানেই তীর প্রবিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সূচীমাত্র প্রবিষ্ট হইলে জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়—পলকমাত্রও বিলম্ব হয় না। এই স্থানে শর বিদ্ধ না হইলে কথনই বখ্‌তিয়ারের রক্ষা সিদ্ধ হইত না। কুতব-উদ্দীন আরও দেখিলেন, তীরের গঠন সাধারণ হইতে ভিন্ন। তাহার ফলক অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, এবং একটি বিশেষ চিহ্নে অঙ্কিত। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই শরত্যাগ করিয়াছিল, সে অসাধারণ বাহুবলশালী; তাহার শিক্ষা বিচিত্র, এবং হস্ত অতি লঘুগতি।

কুতব-উদ্দীন গজঘাতী প্রহরণ হস্তে গ্রহণ করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

কেহ উত্তর দিল না। কুতব-উদ্দীন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর কে ত্যাগ করিয়াছিল?"

যে যবন জনৈক হিন্দুশস্ত্রধারীকে তাড়না করিয়াছিল, সে এইবার কহিল, "জাঁহাপনা। একজন কাফের এই স্থানেই দাঁড়াইয়া তীর মারিয়াছিল দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতেছি না।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূকুটী করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমনা হইয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "বখ্‌তিয়ার খিলিজি মত্তহস্তী যুদ্ধে বধ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর। কোন কাফের তাঁহার গৌরবের লাঘব জন্মাইবার অভিলাষে অথবা তাঁহার প্রাণসংহার জন্য এই তীরক্ষেপ করিয়া থাকিবে। আমি তাহার সন্ধান করিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। তোমরা সকলে গৃহে গিয়া আজিকার দিন আনন্দে যাপন করিও।"

ইহা শুনিয়া দর্শকগণ ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইল। ইত্যবসরে কুতব-উদ্দীন একজন পরিষদকে হস্তস্থিত তীর প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে উপদেশ দিলেন, "যাহার নিকট এইরূপ তীর দেখিবে, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। অনেক সন্ধান কর।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গজহন্তা

কুতব-উদ্দীন, দেওয়ানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বখ্‌তিয়ার খিলিজি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গ লইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমত সময়ে কয়েকজন সৈনিক পূর্ব্ব-পরিচিত হিন্দুযুবাকে সশস্ত্র ধৃত করিয়া আনয়ন করিল।

রক্ষিগণ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে রাজপ্রতিনিধিসমক্ষে উপস্থিত করিল, কুতব-উদ্দীন বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যুবকের অবয়বও নিরীক্ষণযোগ্য। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ন্যূন। শরীর ঈষন্মাত্র দীর্ঘ, এবং অনতিস্থূল ও বলব্যঞ্জক। মস্তক যেরূপ পরিমিত হইলে শরীরের উপযোগী হইত, তদপেক্ষা বৃহৎ, এবং তাহার গঠন অতি রমণীয। ললাট প্রশস্ত বটে, কিন্তু অল্পবয়ঃপ্রযুক্ত অতি বৃহৎ, তাহার মধ্যদেশে "রাজদণ্ড" নামে পরিচিত শিরা প্রকটিত। ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম, তরললোম, তত্তলস্থ অস্থি কিছু উন্নত। চক্ষু বিশেষ আয়ত নহে, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্যগুণে আয়ত বলিয়া বোধ হইত। নাসা মুখের উপযোগী; অত্যন্ত দীর্ঘ নহে, কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, সর্ব্বদা পরস্পরে সংশ্লিষ্ট; পার্শ্বভাগে অস্পষ্ট মণ্ডলার্দ্ধ রেখায় বেষ্টিত। ওষ্ঠে ও চিবুকে কোমল নবীন রোমাবলী শোভা পাইতেছিল। অঙ্গের গঠন বলসূচক হইলেও কর্কশতাশূন্য। বর্ণ প্রায় সম্পূর্ণ গৌর। অঙ্গে কবচ, মস্তকে উষ্ণীষ, পৃষ্ঠে তূণীর লম্বিত, করে ধনুঃ, কটিবন্ধে অসি।

কুতব-উদ্দীন যুবাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া যুবা ভ্রূকুটী করিলেন, এবং কুতবকে কহিলেন, "আপনার কি আজ্ঞা?"

শুনিয়া কুতব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি কি শরত্যাগে আমার হস্তী বধ করিয়াছ?"

যুবা। করিয়াছি।

কু। কেন তুমি আমার হাতী মারিলে?

যুবা। না মারিলে হাতী আপনার সেনাপতিকে মারিত।

ইহা শুনিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বলিলেন, "হাতী আমার কি করিত?"

যুবা। চরণে দলিত করিত।

বখ্‌। আমার কুঠার কি জন্য ছিল?

যুবা। হস্তীকে পিপীলিকা-দংশনের ক্লেশানুভব করাইবার জন্য।

কুতব-উদ্দীনের ওষ্ঠাধরপ্রান্তে অল্পমাত্র হাস্য প্রকটিত হইল।

সেনাপতি অপ্রতিভ হয়েন দেখিয়া কুতব-উদ্দীন তখন কহিলেন, "তুমি হিন্দু, মুসলমানের বল জান না। সেনাপতি অনায়াসে কুঠারাঘাতে হস্তী বধ করিত। তথাপি তুমি যে সেনাপতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তীরত্যাগ করিয়াছিলে—ইহাতে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাকে পুরস্কৃত করিব।" এই বলিয়া কুতব-উদ্দীন কোষাধ্যক্ষের প্রতি যুবাকে শতমুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

যুবা শুনিয়া কহিলেন, "যবনরাজপ্রতিনিধি! শুনিয়া লজ্জিত হইলাম। যবন সেনাপতির জীবনের মূল্য শত মুদ্রা?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তুমি রক্ষা না করিলে যে সেনাপতির জীবন বিনষ্ট হইত, এমত নহে। তথাপি সেনাপতির মর্য্যাদানুসারে দান উচিত বটে। তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিতে অনুমতি করিলাম।"

যুবা। "যবনের বদান্যতায় অতি সন্তুষ্ট হইলাম। আমিও আপনাকে প্রতিপুরস্কৃত করিব। যমুনাতীরে আমার বাসগৃহ, সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একজন লোক দিলে, আমি আপনার পুরস্কার পাঠাইব। যদি রত্ন অপেক্ষা মুদ্রায় আপনার আদর অধিক হয়, তবে আমার প্রদত্ত রত্ন বিক্রয় করিবেন। দিল্লীর শ্রেষ্ঠীরা তদ্বিনিময়ে আপনাকে লক্ষ মুদ্রা দিবে।"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "হইতে পারে, তুমি ধনী। এজন্য সহস্র মুদ্রা তোমার গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু তোমার বাক্য সম্মানসূচক নহে—তুমি সদভিপ্রেত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছিলে বলিয়া অনেক ক্ষমা করিয়াছি—অধিক ক্ষমা করিব না। আমি যে তোমার রাজার প্রতিনিধি, তাহা তুমি কি বিস্মৃত হইলে ?"

যুবা। আমার রাজার প্রতিনিধি ম্লেচ্ছ নহে।

কুতব-উদ্দীন সকোপ-কটাক্ষে কহিলেন, "তবে কে তোমার রাজা ? কোন্ দেশে তোমার বাস ?"

যুবা। মগধে আমার বাস।

কুত। মগধ এ বখ্‌তিয়ার কর্তৃক যবন-রাজভুক্ত হইয়াছে।

যুবা। মগধ দস্যুকর্তৃক পীড়িত হইয়াছে।

কুত। দস্যু কে ?

যুবা। বখ্‌তিয়ার খিলিজি।

কুতব-উদ্দীনের চক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কহিলেন, "তোমার মৃত্যু উপস্থিত।"

যুবা হাসিয়া কহিলেন, "দস্যুহস্তে ?"

কুত। আমার আজ্ঞায় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। আমি যবন-সম্রাটের প্রতিনিধি।

যুবা। আপনি যবন-দস্যুর ক্রীতদাস।

কুতব-উদ্দীন ক্রোধে কম্পিত হইলেন। কিন্তু নিঃসহায় যুবকের সাহস দেখিয়াও বিস্মিত হইলেন। কুতব-উদ্দীন রক্ষিবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে বন্ধন করিয়া বধ কর।"

বখ্‌তিয়ার খিলিজি ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন, পরে, কুতবকে বিনয় করিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই হিন্দু বাতুল, নচেৎ অনর্থক কেন মৃত্যুকামনা করিবে ? ইহাকে বধ করাতে অপৌরুষ।"

যুবা বখ্‌তিয়ারের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিলেন ; বলিলেন, "খিলিজি সাহেব ! বুঝিলাম, আপনি অকৃতজ্ঞ নহেন। আমি হস্তিচরণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আপনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন ; কিন্তু নিবৃত্ত হউন। আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হস্তিবধ করি নাই। আপনাকে এক দিন স্বহস্তে বধ করিব বলিয়া আপনাকে হস্তিচরণ হইতে রক্ষা করিয়াছি।"

রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি উভয়ে উভয়ের মুখাবলোকন করিলেন। খিলিজি কহিলেন, "তুমি নিশ্চয় বাতুল। আপনি প্রাণ হারাইতে বসিয়াছ, অন্যে রক্ষা করিতে গেলে তাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছে। ভাল, আমাকে স্বহস্তে বধ করিবার এত সাধ কেন ?"

যুবা। কেন ? তুমি আমার পিতৃরাজ্যাপহরণ করিয়াছ। আমি মগধ-রাজপুত্র। যুদ্ধকালে হেমচন্দ্র মগধে থাকিলে তাহা যবনদস্যু জয় করিতে পারিত না। অপহারী দস্যুর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিত।

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "এখন বাঁচিলে ত ?"

কুতব-উদ্দীন কহিলেন, "তোমার যে পরিচয় দিতেছ এবং তোমার যেরূপ স্পর্দ্ধা, তাহাতে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি এক্ষণে কারাগারে বাস করিবে। পশ্চাৎ তোমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবে। রক্ষিগণ, এখন ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও।"

রক্ষিগণ হেমচন্দ্রকে বেষ্টিত করিয়া চলিল। কুতব-উদ্দীন তখন বখ্‌তিয়ারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাহেব, এই হিন্দুকে কি ভাবিতেছেন ?"

বখ্‌তিয়ার কহিলেন, "অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যদি কখন হিন্দুসেনা পুনর্ব্বার সমবেত হয়, তবে এ ব্যক্তি সকলকে অগ্নিময় করিবে।"

কুত। সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পূর্ব্বেই নির্ব্বাণ করা কর্ত্তব্য।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইত্যবসরে দুর্গমধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। ক্ষণপরে পুররক্ষিগণ আসিয়া সংবাদ দিল, "বন্দী পলাইয়াছে।"

কুতব-উদ্দীন ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে হইল ?"

রক্ষিগণ কহিল, "দুর্গমধ্যে একজন যবন একটা অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল। আমরা বিবেচনা করিলাম যে, কোন সৈনিকের অশ্ব। আমরা ঘোটকের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহার নিকটে আসিবামাত্র বন্দী চকিতের ন্যায় লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল এবং অশ্বে কষাঘাত করিয়া বায়ুবেগে দুর্গদ্বার দিয়া নির্গত হইল।

কুত। তোমরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে না কেন ?

রক্ষী। আমরা অশ্ব আনিতে আনিতে সে দৃষ্টিপথের অতীত হইল।

কুত। তীর মারিলে না কেন ?

রক্ষী। মারিয়াছিলাম। তাহার কবচে ঠেকিয়া তীর সকল মাটিতে পড়িল।

কুত। যে যবন অশ্ব লইয়া ফিরাইতেছিল, সে কোথায় ?

রক্ষী। প্রথমে আমরা বন্দীরই প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। পশ্চাৎ অশ্বপালের সন্ধান করায় তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সীতারাম

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বন্ধুবর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয় নাবায়ণে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

সীতারাম উপন্যাসে যেন দেবীচৌধুরাণীর obverse proposition solve বা কতকটা বিরোধী ভাবের ব্যঞ্জনা দেখান হইয়াছে। এখানে পুরুষ প্রকট; সীতারাম রায় কর্ম্মী ও তেজস্বী পুরুষ। তাঁহার তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমা। শ্রী যেন ঐশ্বর্য্য, নন্দা যেন হ্লাদিনী, রমা যেন হ্রী বা মোদিনী। রাজার রাণী যেমন হইতে হয়, ঘরণী গৃহিণী যেমন হইতে হয়, নন্দা তেমনই। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমতী, স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা, স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষায় সদা নিরতা; বাঙ্গালার গৃহস্থ কুলাঙ্গনার এক দিকের একটা আদর্শ নন্দা। রমা যেন মোমের পুঁতুল, সোহাগের খুঁটি, যেন আদিরসের মঞ্জুষা; স্বামীর সোহাগে সদাই যেন গলিয়া পড়িতেছেন; স্বামীর মহত্বে বা গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার শক্তি নাই, স্বামীকে লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে। ফলে রমা সদা ভীতা ও সঙ্কুচিতা; সে স্বামীকে পাইলে পুঁতুল খেলা করিতে ভালবাসে, স্বামীর রাজাগিরির, দেশাত্মবোধের কোন ধারও ধারে না। এমন চীনের পুঁতুল, মোমের খেলনা, রাজা-বাদসা ধনীর ঘরে অনেক পাওয়া যায়। ইহাতে অস্বাভাবিকতা নাই। কিন্তু শ্রী—সে কেমন নারী! প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় শ্রী স্বামীবর্জ্জিতা; সে বর্জ্জনকালে, কিশোর বয়সে তাহার কেমন শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল তাহার কোন পরিচয় গ্রন্থকার দেন নাই। শ্রী ফুটিল গঙ্গারামের রক্ষা ব্যাপারে, দ্বিদণ্ড বটশাখায় দাঁড়াইয়া লোক সমাহরণে ও উৎসাহ দানে শ্রী ফুটিয়া উঠিল—বিদ্যুদ্বিলাসের মত ভ্রাতা ও স্বামীর প্রাণ সংশয় বুঝিয়া একবার শ্রী বাঙ্গালী মেয়ের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর শ্রী একটা প্রহেলিকা; সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বটে, কিন্তু জগন্নাথের রথের দড়ীর টানের মত তাহার হৃদয়ে স্বামী-ঘর করিবার সাধটুকু বেশ জাগিতেছে। অথচ যখন সীতারাম তাহার দ্বারস্থ, তাহার জন্য পাগল, সে পাগলামীর ফলে রাজ্য যায়, স্বাধীনতা যায়, তখন শ্রী পাষাণী। এই পাষাণ ভাবটাই সীতারামের পুরুষকারের তাসের ঘর শেষে ভাঙ্গিয়া দিল। শ্রীকে allegory বলিতে পারি না, কারণ allegoryর হিসাবে শ্রীর চরিত্রোন্মেষ ঘটান হয় নাই। শ্রী একটা abstractionও নহে, কারণ অমন ভাবে abstraction ফুটিয়া উঠে না। সীতারাম হেন পুরুষ,—যে দেশের জন্য, জাতির জন্য পাগল, যে স্বীয় পুরুষকারের প্রভাবে অঘটন ঘটাইয়াছিল, যাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মামুদাবাদ ও ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা,—তেমন একনিষ্ঠ সাধক এমন

মোহে পড়িবে কেন? একনিষ্ঠার এমন পরিণাম হয় না। যাহার একনিষ্ঠা আছে, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে, নিশ্চিন্ত না হইলে, তাহার মন অন্য দিকে যাইবে না। সীতারাম বিপদ্‌বেষ্টিত হইয়াও পতঙ্গের ন্যায় শ্রীর রূপে পুড়িয়া মরিল। শ্রীই বা এমন কোন দেশের ভৈরবী যে, ধর্ম্মরাজ্য ছারেখারে যাইতেছে দেখিয়াও টলিল না, সর্ব্বনাশ করিয়া তবে বাহির হইল? এমন allegory আমি বুঝিতে পারিলাম না। সাধনশাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে ইহা বুঝি না, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন-শাস্ত্রের মাপকাঠি লইয়া ইহার পরিমাণ করিতে পারি না। তাহার পর গঙ্গারাম ও রমা— এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। গঙ্গারাম শ্রীর ভাই, সুতরাং শ্রীর সপত্নীর ভ্রাতৃস্থানীয়। গঙ্গারাম সীতারামের কৃপায় সব পাইয়াছিল; জীবন, পদ, ঐশ্বর্য্য, মান-সম্মান, তাহার ইহজীবনের সর্ব্বস্বই সীতারাম-দত্ত। সেই গঙ্গারাম নগরপাল, অবশ্যই বীর ও যোদ্ধা। নগরপালের হিসাবে, শ্রীর ভাইয়ের হিসাবে, রমা তাহাকে ডাকিতে পারে। তাই বলিয়া গঙ্গারামকে সহসা রমার রূপে পাগল করিয়া তুলিতে কোন আদিরসের কবি পারেন না, সাহসে কুলায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে লাভ হইল কি? সিদ্ধান্তবিকাশের পক্ষে উহা সহায়তা করিল না, আদর্শ ফুটাইবার পক্ষে উহা কাজে লাগিল না, ক্ষেত্রের মার্জ্জনা পক্ষে উহার কোন প্রয়োজন নাই। গঙ্গারামের প্রেম এবং শ্রীর প্রতি সীতারামের মোহ যেন allegoryর হিসাবেও ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই উপন্যাসের এই দুইটি ঘটনাই মহাপ্রাণ; গল্পটা এই দুইটি ঘটনার উপরই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের Tragedy এই দুইটি ঘটনা হইতেই পরদায় পরদায় খুলিয়াছে। ফলে, এই দুইটা ঘটনাকে বাদ দেওয়া যায় না, বর্জ্জন করা চলে না। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, গল্পের বনিয়াদের সহিত এই ঘটনা দুইটি ঠিক খাপ্ খায় না।

কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব

কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা যশঃ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কেহ তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়াছেন, কেহ বা পারদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। উভয়েই ভ্রান্ত। আমি সমালোচনা করিতে বসি নাই; শুধু এইটুকু বলিব যে, যাহাকে আমি ভালবাসি তাহাকে সকলে ভালবাসুক, যে ধর্ম্মের আমি অনুরাগী, সেই ধর্ম্মের প্রতি সকলের অনুরাগ বৃদ্ধি হউক, ইহা মানুষমাত্রেরই বাসনা। আমার ছেলের, আমার ঘরবাড়ীর সকলে গুণগান করুক, ইহা আমার অভিপ্রেত। বঙ্কিম তাঁহার বুকজোড়া ধন কৃষ্ণকে কি অলঙ্কার পরাইয়া জগতে বাহির করিবেন, কি অলঙ্কার পরাইলে লোকে আকৃষ্ট

হইবে, ইহা ভাবিয়াই আকুল। এবম্বিধ চিন্তা ভক্ত মাত্রেরই হয়। যিশু বা মহম্মদ উভয়েরই তা' একদিন হইয়াছিল। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণধর্ম্মকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে অবিশ্বাস্য অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। বঙ্কিম প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিলেন। গোপীতত্ত্ব, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াও তিনি সে গুহ্য কথা জগতে প্রচার করিলেন না। না করিবার কারণ খুঁজিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমি যদি এই বস্ত্রহরণ উপলক্ষে বলি যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে যেটি শ্রেষ্ঠ দান, সেই লজ্জা, কে কৃষ্ণকে দান করিতে পারে, তাহাই তিনি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই ছল করিয়াছিলেন, তাহা হইলে অনেকে আমাকে উপহাস করিবেন। আমি যদি বলি যে, যে রাসলীলার নামে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, সেই রাসলীলার নায়ক একজন অষ্টম বর্ষীয় বালক, শৃঙ্গার রস ছল মাত্র—রাসলীলা মোক্ষদায়িনী, তাহা হইলে অনেকে আমার কথা অবিশ্বাস করিবেন। যে বংশীধ্বনির কথা শুনিলে অনেকে কাণে আঙ্গুল দেন, আমি যদি বলি সেই বংশীধ্বনি চতুর্ব্বেদ সৃজনকারী মহদ্ভূতের মুখ মারুত বই আর কিছু নয়—এই বংশীধ্বনি আহ্বান মাত্র—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, ইহাই শুধু বংশী বলিতেছে, তাহা হইলে লোকে হয়ত আমাকে বিদ্রূপ করিবে, এই উপহাস ও অবিশ্বাসের কবল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার মানসে বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের গূঢ় ও গুহ্য অংশ দেখাইলেন না। তাঁহার প্রাণের দেবতাকে আদর্শ পুরুষ গড়িয়াই ক্ষান্ত রহিলেন।

কিন্তু তাহাতে তিনি তৃপ্তি পাইলেন না। না পাইবারই কথা। তাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণ যে জগতে অনাদর লাভ করিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার এই শিক্ষা হইল যে, নানা-সম্প্রদায়-বিভক্ত বাঙ্গালা দেশে কোন দেবতা বিশেষের উপসনা প্রচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে দেশে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত পরস্পর লড়াই করিতেছে, সে দেশে কোনও এক দেবতাকে সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠেকিয়া শিখিয়া তাঁহার কৃষ্ণকে বুকের ভিতর গুটাইয়া লইয়া অনুশীলন-তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেন। এই তত্ত্ব সকলেরই গ্রাহ্য, খৃষ্টান্, মুসলমান কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ইহাতে—এই অনুশীলন-তত্ত্বে গীতা ও ভাগবৎ, বেদ ও দর্শন, যোগ ও কর্ম্ম, মায়া ও জ্ঞান সকলই নিহিত আছে। কমৎের প্রত্যক্ষবাদ, বার্কলি ও শঙ্করের মায়াবাদ মিশ্রিত আকারে এই ধর্ম্মতত্ত্বে স্থান পাইয়াছে।

অপ্রকাশিত রচনা

নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী *

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ভাল, সারি সত্য বল দেখি, তোমার বিশ্বাস কি ? ভূত আছে ?"

বরদা, ছোট ভাই সারদাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। সন্ধ্যার পর, টেবিলে দুই ভাই খাইতেছিল—একটু রোষ্ট মটন প্লেটে করিয়া, ছুরিকাঁটা দিয়া তৎসহিত খেলা করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ বরদা এই কথা কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল। সারদা প্রথমে উত্তর না করিয়া এক টুকরা রোষ্টে উত্তম করিয়া মাষ্টার্ড মাখাইয়া বদনমধ্যে প্রেরণপূর্ব্বক, আধখানা আলুকে তৎসহিত প্রেরণ করিয়া, একটু রুটী ভাঙ্গিয়া বাম হস্তে রক্ষাপূর্ব্বক, অগ্রজের মুখ পানে চাহিতে চাহিতে চর্ব্বণ কার্য্য সমাপন করিল, পরে এতটুকু সেরি দিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইয়া বলিল, "ভূত ? না।"

এই বলিয়া সারদাকৃষ্ণ সেন পরলোকগত এবং সুসিদ্ধ মেষশাবকের অবশিষ্টাংশকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বরদাকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "rather laconic."

সারদাকৃষ্ণের রসনার সহিত রসাল মেষমাংসের পুনরালাপ হইতেছিল, অতএব সহসা উত্তর করিল না। যথাবিহিত সময়ে, অবসর প্রাপণান্তর তিনি বলিলেন, "Laconic ? বরং একটা কথা বেশী বলিয়াছি, তুমি, জিজ্ঞাসা করিলে 'ভূত আছে' —আমি বলিলেই হইত "না।" আমি বলিয়াছি, "ভূত ? না।" "ভূত ?" কথাটা বেশী বলিয়াছি কেবল তোমার খাতিরে।"

"অতএব তোমার ভ্রাতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ, এই স্বর্গপ্রাপ্ত চতুষ্পদের খণ্ডান্তর প্রসাদ দেওয়া গেল।" এই বলিয়া বরদা, আর কিছু মটন কাটিয়া ভ্রাতার প্লেটে ফেলিয়া দিলেন। সারদা অবিচলিতচিত্তে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিল।

তখন বরদা বলিল, "Seriously সারি, ভূত আছে বিশ্বাস কর না ?"

সারি। না।

বরদা। কেন বিশ্বাস কর না ?

সারদা। সেই প্রাচীন ঋষির কথা—প্রমাণাভাবাৎ। কপিল প্রমাণ-অভাবে

* এই ভূতের গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি আর সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। সুরেশ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, সাহিত্য-পত্রের জন্য এ গল্পটি লিখিত হইতেছিল। মৃত্যুর পর ইহা সুরেশ বাবুর নিকট প্রেরিত হয়। পরে আমি হেমেন্দ্রবাবুর নিকট পাইয়াছি।

ঈশ্বর মানিলেন না—আর আমি প্রমাণ-অভাবে ভূত মানিব ?

এই বলিয়া সারদা এক গেলাস সেরি মেষের সৎকারার্থ আপনার উদর মধ্যে প্রেরণ করিল।

বরদাকৃষ্ণ চটিয়া উঠিল—বলিল, "কোথাকার বাঁদর ? ভূত নাই !—ঈশ্বর নাই ! তবে তুমিও নেই, আমিও নেই ?"

সারি। তাই বটে। তোমার মটন রোষ্ট ফুরাইল, দেখিয়া, আমি নেই। আর আমার আহারের ঘটা দেখিয়া, বোধ হয় তুমিও নেই।

বরদা। 'কই খেলি কই ?"

এই বলিয়া অবশিষ্ট মাংসটুকু কাটিয়া ভাইয়ের প্লেটে সংস্থাপিত করিয়া, গ্লাসে সেরি ঢালিয়া দিলেন। সারদা যতক্ষণ মাংসের ছেদন, বিদ্ধন, মুখে উত্তোলন, এবং চর্ব্বণ ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত, ততক্ষণ বরদা চুপ করিয়া রহিল, পরে অবসর পাইলে, সারদা জ্যেষ্ঠকে বলিল, "তুমি নাই, আর আমি নাই—ইহা প্রায় philosophically true কেন না আমরা "mere permanent possibilities of sensation." আর এই আহার করিলাম, ইহাও না করার মধ্যে জানিবে,—কেবল সেই possible sensation গুলার মধ্যে কতকগুলা sensation হইল মাত্র।

বরদা। সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভূত দেখা, ভূতের শব্দ শুনা এ সব possible sensation নহে ?

সারদা। ভূত থাকিলে possible.

বরদা। ভূত নাই ?

সারদা। তা ঠিক বলিতেছি না—তবে প্রমাণ নাই বলিয়া ভূতে বিশ্বাস নাই, ইহাই বলিয়াছি।

বরদা। প্রত্যক্ষ কি প্রমাণ নহে ?

সারদা। আমি কখন ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই।

বরদা। টেম্‌স্ নদী প্রত্যক্ষ করিয়াছ ?

সারদা। না।

বরদা। টেম্‌স্ নদী আছে মান ?

সারদা। যাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায়, এমন অনেক লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বরদা। ভূতও এমন লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সারদা। বিশ্বাসযোগ্য এমন কে ? একজনের নাম কর দেখি ?

বরদা। মনে কর, আমি।

এই কথা বলিতে বরদার মুখ কালো হইয়া গেল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল।

সারদা। তুমি ?

বরদা। তা হইলে বিশ্বাস কর।

সারদা। তুমি একটু imaginative, একটু sentimental—রজ্জুকে সর্প ভ্রম হইতে পারে।

বরদা। তুমি দেখিবে?

সারদা। দেখিব না কেন?

বরদা। আচ্ছা তবে আহার সমাপ্ত করা যাউক।

বর্ষার মানভঞ্জন

নায়কের উক্তি

ত্রিপদী

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ,
হেরিতেছি অপরূপ ভাব,
বরষার আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয় রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন!
বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষকালেতে সব করে;
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে
শোভাহীন হয়ে সদা রয়;
তব মুখচন্দ্র তবে কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।
আকাশেতে জলধর, মনোহর নিশাকর
ঢাকি আছে দিবস যামিনী;
কেন না তোমার তবে, শশীমুখ ঢাকা রবে
অম্বর অম্বরে বিনোদিনী।
মান ভাঙ্গিবার তরে ধরিলাম দুই করে

মুখপদ্মে কর-পদ্ম দিলে ;
বুঝি এই ভাব তার আগমনে বরষার
কমলিনী মুদিতা সলিলে।
এ কালের প্রতিকূল কাননে কোকিল কুল
কুহু কুহু কাকলি না করে।
কোকিল বাদিনী বুঝি, তাই আছে মুখ বুজি
মৌনবতী বরষার ভরে।
গগনের যত তারা বরষা কালেতে তারা
সদা কাল নহে প্রকটিত ;
তাই বুঝি জ্যোতিহারা তোমার নয়ন তারা
অভিমানে রয়েছে মুদিত।
বরষার অনুক্ষণ, বারিধারা বরিষণ
ধারে ধারে ধরাপূর্ণ তায়,
তাই বুঝি নিরন্তর, তব নেত্র-নীরধর
নীর-ধারে ফেলেছি ধরায়।

নায়িকার উক্তি

পয়ার

শুনিয়া শেষের শ্লেষ কুপিল কামিনী ;
বিধুমুখে মৃদুরবে কহিল মানিনী।
বরষার ধর্ম্ম যদি বারি বরিষণ,
তবে কেন জলহীন তোমার নয়ন।
দুঃখিনীর দুঃখ তাপে হইয়া সদয়,
তোমার নয়নে কেন বৃষ্টি নাহি হয়।
পলকে পলকে তার নলকে দামিনী।
মানে মানে মান হরি মানিনী ভামিনী,
গরবেতে গৃহে যায় গজেন্দ্র গামিনী।
মানের নিগূঢ় ভাব শেষে গেল বোঝা,
সুখেতে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন সোজা। *

* এই কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ইহা সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তলিখিত নোটবুক মধ্যে কবিতাটি পাওয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য*

বাঙ্গালায় জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খাঁটী বাঙ্গালা সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য হইয়া থাকিবে। যতদিন এদেশে উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার সাহায্যে প্রচারিত হইবে, যতদিন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষ সাধন করিবেন; বঙ্গসাহিত্য ততদিন বঙ্গদেশের লোক সাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য এই নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও লোকশিক্ষার কার্য্যে তেমন পর্য্যাপ্ত নহে।

অনেকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি অল্পলোকেই পড়িয়া থাকে; এ দেশের শিক্ষিত মাত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন না; তাঁহারা ইংরেজি পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা, তাহা বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লোকই রীতিমত বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, কেন না বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, যাহা আগাগোড়া পড়া চলে। তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা পুস্তক পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও চলে। দেশের শিল্পী, দোকানদার, যাহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং রাখিয়া থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফস্বলের ব্যবহারজীব, সরকারী কাছারীর নিম্নস্তরের কর্ম্মচারী, যাহাদের ইংরাজী বিদ্যা আফিসের কার্য্যের সীমায় নিবদ্ধ, এবং গ্রাম্য তালুকদার যাহারা ইংরাজীও জানে না, কাছারির কাজও বুঝে না—এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে; ইহারাই বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করে। অর্থাৎ নিরক্ষর কৃষক ও উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে রত থাকিবে। অবশ্য, এই দেশীয় শিক্ষাকে সর্ব্ববিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন করিতে

* ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক পঠিত। ইংরাজী প্রবন্ধটা না দিয়া অনুবাদটাই দিলাম। এই বঙ্গানুবাদ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে "সাহিত্য"-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন। এই সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে; কারণ, এই সকল শ্রেণীর লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; ইহারাই জনসাধারণ।

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্মৃতির প্রভাব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কেবল এই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও একটা ভাবে বিচলিত বা উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করি, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করি, গদ্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি। তখন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জনসাধারণ ইংরেজী ভাষাবোধে একেবারেই বধির; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত একটী ইংরেজী শব্দেরও অর্থ বোধ করিতে পারে না। অথচ সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; নহিলে কোনও ফলোদয় হইবে না। আমার মনে হয়, একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে পারিলে, সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব হইবে, সে তরঙ্গ জন জন আঘাত করিয়া দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে। অন্যপক্ষে, কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, জাতিব্যাপী বিরাট কার্য্যের সূচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই হেতু সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিত্য,—জনসাধারণের সাহিত্য হইবে।

বাঙ্গালার জনসাধারণের সেব্য এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে উদ্ভূত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহা উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয়ত প্রমাদসঙ্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না; স্থির ও ধীর ভাবে, বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উদ্রিক্ত করিতে হইবে। কারণ জাতির সাহিত্য যে ভঙ্গী অবলম্বন করিবে, সেই ভঙ্গী অনুসারে জাতির বিশিষ্টতার উপর উহার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে। জন সাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই উভয়ের উপর আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাহিত্য অনুসারে জাতির বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সে যুগে যাহারা লেখা পড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা পড়া করিত। বিশেষতঃ জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হয়,

তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত হইত। সুতরাং উহার প্রচার ছিল; জনসাধারণ উহা আদরের সহিত শুনিত। কাজেই জয়দেবকে বাঙ্গালার লোক-সাধারণের কবি বলা চলে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। একটা জাতির বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহময়, অতি কঠোর পাদুকার চাপ যখন বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার হয়। গীত-গোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া কোন খানেই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক উন্নত ভাবের বিকাশ মাত্র নাই। আছে কেবল রমণীসুলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোন খানেই একটা নূতন সত্যের—একটা অপূর্ব্ব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,—তা তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক কবি হউন, বা বিষয়ী-বিনোদক কবি হউক,—এমন একটা ভাবের কথা মানুষকে শিখাইয়া যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মনুষ্য জাতি উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন; তাঁহার ধরণ স্বতন্ত্র। তিনি যে কবি গুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলি না। তিনি নিশ্চয়ই একজন উচ্চাঙ্গের কবি। তাঁহার শব্দাচরণ ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ; শব্দ গুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণ-পথে ভাসিয়া যায়। শব্দ যোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু তাঁহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের সন্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে কেবল রক্ত মাংসের উপদ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। দুর্ব্বল, স্থবির, কর্ম্মহীন জাতি যেমন কামকলা বিতানে সুখবোধ করে, তেমনই সে জাতির কবিও সে সুখলিপ্সার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কাম কাব্যের ইন্ধন যোগাইয়াছেন। এই জয়দেবই পরবর্ত্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শস্বরূপ হইয়া আছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বটে, পরন্তু অনেকেই তাঁহার পদলালিত্য, কবিজনোচিত ভাবমাধুর্য্য প্রাপ্ত হন নাই। ইঁহাদের পরে নবদ্বীপের রাজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের মত কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রন্থ। শেষে কবি, পাঁচালী যাত্রায় ঐ এক রীতিতে টপ্পা ও অন্যান্য প্রেমসঙ্গীতেও পুষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এইভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কামকবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। স্থবির, দুর্ব্বল, কর্ম্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই উপযোগী; উহা দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পার্শ্বে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব্ব সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সবল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার তীক্ষ্ণতা হারায় নাই। তাই কুল্লুক ভট্ট ও ভবদেবের কাল হইতে জগন্নাথের কাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের ও নব্যস্মৃতির কত গ্রন্থই রচনা করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। টীকার উপর টীকা, ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা বাহির হইয়া স্মৃতি-শাস্ত্রকে একরূপ দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিবিশেষের তাড়নায় ব্যক্তিমাত্রকেই কতকটা অধীর হইতে হইয়াছে। এই স্মৃতিশাস্ত্র গোভিলের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বগামী ঋষি মুনির দ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শূলপাণি জীমূতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বন্ধনী যেন লৌহশৃঙ্খলে বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উল্লাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের সকল বৃত্তিই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের নিগড়ে যেন আবদ্ধ—পিণ্ডীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের সকল ব্যাপারে—সুখে দুঃখে বাঙ্গালীর গুরুপুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অপর পক্ষে বাঙ্গালার নব্যন্যায় মনীষার চমৎকার বিকাশে অপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় হইলেও উহা কখনই দেশের লোকসাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচায়ক মনীষার অতুল্য বিকাশের দ্যোতক এই নব্য ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পূর্ণ অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়ের কচকচি বলিয়া ওদিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ এই নব্যন্যায়ের কচকচির অন্তরালে যে অপূর্ব্ব বাস্তবতা (Rationalism) নিহিত, সত্য অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা জনকয়েক মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার দ্বারা জাতির চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোনও উপকারই হয় নাই। পরন্তু এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কজাল স্মৃতিশাস্ত্রের বিতণ্ডায় অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার ও পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে না জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভূত উপকার সাধিত হইত। এই নব্যন্যায় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ থাকাতে উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটী বিষয় অর্থাৎ নব্যন্যায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘাত করিয়া জাতির চরিত্রের উন্মেষ সাধন করিয়াছিল। কর্ম্মশূন্যতা চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, এবং সদ্ধর্ম্মসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কয়টী মিলিয়া মিশিয়া বাঙ্গালীর কামকলা গন্ধ পরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীসুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্ব্বল মনীষায় তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভাবসৃষ্টি বিষয়ে স্থবির জাড্য

জড়িত, অথচ অতি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি লইয়া বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে ; এবং উহারই সাহায্যে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ নিগড়ের ন্যায় দুশ্ছেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব ছিল—নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যের চর্চায় নিজে দুর্ব্বল, কোমল কাম সন্ধুক্ষণে সদারত, সুতরাং নিশ্চল ও নিজের দুঃখ কষ্টের অনুভূতি শূন্য হইয়া সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনের অরুণোদয় হইল। (উহা ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় এবং সঙ্গে ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির বিস্তার)। অবশ্য, এমন স্থবির, গতিশূন্য জাতির পক্ষে নবজীবন ও নবভাবোদয় সম্ভবপর কিনা, তাহা বিচার্য্য। যাহা হউক, এই নবজীবনের—নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার এক প্রবল অস্ত্র বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা মুদ্রাযন্ত্র। এই নবভাব সঙ্ঘাতে, নবজীবনের প্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগোবিন্দ শ্রেণীর সাহিত্য ছাড়িয়া, একটা নূতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। বাঙ্গালী জাতির মনীষার ইতিহাস কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না ; কেন না, সে কথা সকলেই জানে এবং বুঝে। তবে যাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, নিম্নলিখিত গোটা কয়েক ব্যাপারের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাহি।

১। বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। এই সাহিত্য লোক সাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাঙ্ক্ষার মুখে যোগান দিতে হইবে।

২। শীঘ্রই এবম্ভাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গালায় অতি মাত্রায় বাড়িবে। এই টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুন উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিসাব করিলেই চলিবে না, উহাদের গুণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩। এখন পরিমাণ যাহাই হউক গুণের হিসাবে যে ভাল বহি বাহির হইতেছে না, তাহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে।

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক প্রচারের একখানি ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা এখনও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাঘ্য হইলেও গুণের পক্ষে উহা জঘন্য তাহা বলিতে হইবে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক। দুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু অবশিষ্ট সকলগুলিই হীন অনুকরণ মাত্র, অথবা সংস্কৃত সাহিত্যের গালগল্পে পূর্ণ, অথবা সাদা মাঠা বাজে কথায় পূর্ণ। এমন কেন ঘটিতেছে, তাহার দুইটী কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি।

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (fawning) ও অভাবজীর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথবা স্কুলের ছেলেরা গ্রন্থকার

হয়। কিংবা কর্ম্মহীন, ব্যবসায়হীন বাজে লেখকই গ্রন্থকার সাজিয়া বসে। কেন না এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহারা দেশের লোককে নূতন ভাবে শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের দশজনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাঁহারা এ কার্য্যকে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার যোগ্য বলিয়া মনে করেন না; যে তীব্রবুদ্ধি তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীন বৃত্তি মাত্র, তাহার পদের ও শিক্ষার যোগ্য নহে। যদি কচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়া কোন বহি লেখেন, ত সে পুস্তকে তাঁহার নাম থাকে না; উহা বিনামা বাহির হয়—চুপি চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু যে কয়খানি ভাল বহি বাহির হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রন্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না যে, সবাই এই ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। জন কয়েক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা কয় জন? এবং কয়খানিই বা পুস্তক রচনা করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই।

২। ভাল সমালোচনার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুস্তকগত ভাল মন্দের কথা নির্ব্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকের নাই বলিলেও হয়। দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত পুস্তক সমালোচনার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা বড়ই দোষের কথা যে, বাঙ্গালী জাঁকজমকের ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটী মনোহর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকুকে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারে না। বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি অল্পায়াস-সাধ্য, পরন্তু সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। চিত্তগত এই দোষের জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, উন্নত সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়। যাঁহারা বাঙ্গালী থিয়েটারের শ্রোতৃমণ্ডলীর ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাঁহারা অনেকটা বাঙ্গালীর প্রশংসার মূল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উৎকট উদ্ভট ভাষা, সেই বিকট কট্‌কটে ভাববিন্যাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার স্রোত চলিতেছে, আর স্থির ধীরভাবে লোকে তাহা শুনিতেছে, এবং অম্লানবদনে প্রশংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর করিতেছে। এই অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিতেছে না; এবং এই হেতু বাঙ্গালার সৎসাহিত্যের অন্য সকল শাখাই যেন শুকাইয়া যাইতেছে।

এই সঙ্গে আমি আর একটী কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিকে বড়ই ছোট—বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হেতু বাঙ্গালার সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে না। অনেকেই মনে

করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্গালার জন সাধারণের জন্য যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাস ঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া লেখা হয়। শব্দ চাতুর্য্যের ও মাধুর্য্যের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাখ্যান, মনুষ্যচরিত্রের অথবা মানবতার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুস্তকে করিতে নাই। আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থ বিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী পাঠকের পড়িতে নাই। যদি বা এই অদ্ভুত সমাচার শুনাইতে হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোকা সাজাইয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না। যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে। সে শুষ্ক নীরস ছেলেভুলান পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন যাঁহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী প্রায়শঃ পাঠ করে, তাঁহারা এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া পুস্তক রচনা করেন নাই। মনে হয়, এই হেতু Vernacular Literature Society বা বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তক-রাশির প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতি-প্রচারিত সাময়িক পত্রখানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইতেছে।

এইবার সাহিত্য প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহা সত্য বটে, যে বহি বিকাইবে, তাহা লইয়া ফেরীওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে, পরন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যোগানের মুখে টানের সৃষ্টি করিতে হইবে। ফেরীওয়ালারা বহুগ্রামে বহি বেচিতে যায়, কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুঁথি বড়ই কদর্য্য। বিশেষতঃ তাহারা নিয়মিত ফেরী করে না, ক্বচিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে পুস্তক প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফস্বলের বহুস্থান হইতে অভিযোগ শুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয় সাহিত্য প্রচার সমিতির (Vernacular Literature Society) অনেক স্থানে শাখা দোকান আছে। সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রচার বাড়ে সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এপক্ষে সুব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এইভাবে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে; পরন্তু প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠাগার না থাকিলে কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটী পাঠাগার খোলা চলে। শিক্ষা বিভাগের

পরিদর্শক কর্ম্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটী করিয়া পাঠাগার খুলিতে পারেন। বিশেষতঃ শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যধিক; তাঁহারা অল্প চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠাগারের সংখ্যা বাড়িলেই সৎসাহিত্যের চর্চ্চারও প্রসার বাড়িবেই; লোকের একটা রুচিরও সৃষ্টি হইবে। এ কাজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না।

প্রবন্ধ পাঠের পর বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-কামনায় ব্রত রহিয়াছেন। তিনি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষপাতী, অনুবাদের পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নানা পুস্তকের রচনা হইয়াছে; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। পরন্তু এখন বিচার্য্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটী এজেন্সী খুলিতে হইবে। এই এজেন্সীর সাহায্যে পুস্তক প্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা বুঝা যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাড়িলে, এবং পুস্তক সকলের কাটতি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা করিতে হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে। আমার মনে হয় যে, এই এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দূর হইবে।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলেন যে, পাঠ্য পুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই এত কথা উঠিতেছে। পাঠ্য পুস্তক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে; এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্যপুস্তক; অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে; আর চিত্তবিনোদক পাঠ্য পুস্তক; যথা উপন্যাস গল্প, নাটক, কাব্য গ্রন্থাদি। প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, ইতিহাস ও চিকিৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে। এই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে; কিন্তু এখনও সে সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে সে বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান গ্রন্থসকলের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গড়িতে হইতেছে। এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক শব্দের জন্য অনুরূপ ইংরেজী শব্দ বাছিয়া উহাদের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ, ইংরেজী বহিসকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভাবে দেখিয়া শুনিয়া শব্দ চয়ন করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থ-দ্যোতনার পক্ষে কোন গোলমাল ঘটে না। এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অনুকূল বাঙ্গালা শব্দের রচনা করিলে অর্থসঙ্গতি বিষয়ে

কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকসকল বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়; শেষে বিজ্ঞান-বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা আরব্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরব্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা আরব্ধ না হইলে, তৎ তৎ বিষয়ের গ্রন্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যদি পঠন পাঠন না হয়, চিকিৎসা শাস্ত্র পডাইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয না। কলিকাতা, আগ্রা, মান্দ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি নগরে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইযাছে বলিযাই, সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিযাই দেশীয় ভাষায লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। বিজ্ঞানের অন্য শাখার পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। বিজ্ঞানের পঠন পাঠন স্কুল কলেজে না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পাঠ্য পুস্তকসকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় না হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান-বিষয়ের প্রচার হওয়া প্রযোজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তকসকলের অনুবাদ করিযা অভাব মোচন করা আবশ্যক। শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনাআপনি রচিত হইবে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পরন্তু গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রন্থাদির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে চিত্তবিনোদক হইবে না। গৃহস্থালীর কথা, দেশের ইতিহাসের কথা লইয়া উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন করিতে পারিবে। ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহা বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না। কাব্যের পক্ষেও ঐ একই কথা খাটে। অতএব এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে না পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে না, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস লিখিয়া এই সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আলালের ঘরের দুলালের ভাষা যেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও তেমনি সদুপদেশপূর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন বঙ্গসাহিত্যেরও আদর বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা পড়িতে চাহেন না। কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয়জন ইংরেজী শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহারা ত নব্য বঙ্গসাহিত্যের পুস্তক সকল পড়িতে পারে। এই সকল গ্রন্থের পঠন পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্তির পোষণ করা হইবে। এই সকল পুস্তকের পরিবর্ত্তে ভাল ভাল

উপন্যাস রচনা করিয়া দিলে পাঠকের মন প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে দেশের ও সমাজের রুচি বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবেন, পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে পরে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে পারিবে। *

বঙ্গদর্শন যুগে বঙ্কিমচন্দ্র একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার নাম দেন 'ভিক্ষা'। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয নাই। মুদ্রিত না করিবার বিশেষ কারণ এই যে, ইহা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনুমোদিত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অষ্টাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ১৯ এ ফাল্গুন তারিখে চুঁচুড়ায় বাৎসরিক সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশন হয়। সেই সভায় মহারাজ নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; এবং আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদে বৃত হইয়া এক অত্যুপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় আমাকে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ আমি পাঠ করিব ইহা সভাধিবেশনের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তজ্জন্য দূরদেশ হইতে অনেকেই আসিয়াছিলেন এবং প্রবন্ধটী দেখিবার জন্য কেহ কেহ হুড়াহুড়ি করিয়াছিলেন। আচার্য্য সরকার মহাশয়ের হস্তে প্রবন্ধটী অর্পণ করিয়া আমি কৌতূহলী দর্শকবৃন্দের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি।

প্রবন্ধটী পঠিত হইলে সভার মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভট্টপল্লীবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রবন্ধের স্থলবিশেষ আপত্তিজনক বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের গোলমাল থামাইতে অসমর্থ হইয়া সভাপতি মহাশয় আমাদিগকে আহ্বান করিলেন। আমরা তখন মণ্ডপের বাহিরে ফটো তুলাইতে ছিলাম। ফটো তুলিতেছিলেন, আমাদের এক বন্ধু চন্দননগরের বিনোদ ধর। Groupএর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, বৃত্রের ন্যায় দেহ লইয়া সুরেশ সমাজপতি। সুরেশের এক পাশে আমি, অপর পার্শ্বে—আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমাদের চারিযুগের জলধর দাদা। আমাদের এক পাশে কবি অক্ষয় বড়াল, অপর পার্শ্বে পাঁচকড়ি দাদা। আমাদের অনিন্দ্যজ্যোতিঃ কৃষ্ণবর্ণের পার্শ্বে গৌরবর্ণ পাঁচুদা ও অক্ষয়কে মানাইতেছিল ভাল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ আমাদের বপুর অন্তরালে তাঁহার দেহ-যষ্টি লইয়া কোথায় লুকাইয়াছিলেন। আরও দুই একজন সাহিত্যিক বন্ধু সেই Groupএর মধ্যে ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা যখন আমাদের দেবলাঞ্ছিত রূপ কাগজে উঠাইতে ব্যস্ত, তখন সভাপতির নিকট হইতে আমাদের আহ্বান আসিল।

* সাহিত্য—১৩২০

আহুত হইয়া যথাকালে আমরা সভায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম, চারি পাঁচ ব্যক্তি সমস্বরে চীৎকার করিতেছেন। তীব্র নস্তের গন্ধেও সভাস্থল আমোদিত। পাঁচকড়ি বাবু, পরে সুরেশ দুই চারি কথায় প্রতিবাদকারীদের শান্ত করিলেন। সুরেশের কথার সারমর্ম্ম এই যে, প্রবন্ধের লেখক একজন ব্রাহ্মণ, পাঠকও একজন ব্রাহ্মণ, সুতরাং ব্রাহ্মণ-শ্রোতাদের এ প্রবন্ধ শ্রবণে কোন আপত্তি হইতে পারে না। যদি ব্রাহ্মণেতর অপর কেহ এই প্রবন্ধ রচনা বা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে দোষের হইতে পারিত।

পাঁচকড়ি বাবুর বক্তব্যের মর্ম্ম এই ছিল যে, সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলে কিছু রূঢ় ও কর্কশ হয়। সেই দেখানর ভিতর যদি কিছু অসত্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা দোষের হইতে পারে না। প্রবন্ধ-মধ্যে যদি একটী বাক্যও অসত্য থাকে, তাহা হইলে আমরা কেহ তাহা মার্জ্জনা করিব না। আপনারা দেখান কোন্ কথাটি, কোন্ ভাবটি অসত্য।

প্রতিবাদকারীরা শান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আজ আমি এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সাহস পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য, কাহারও প্রাণে ব্যথা দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ভিক্ষা

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি, এ যাত্রা ভিক্ষা করিয়া কাটাইব। আমাদের দেশ—ভাল দেশ, ভিক্ষায় বড় মান ; যে নির্ব্বোধ, সে পরিশ্রম করুক, আমি ভিক্ষা করিব।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি অন্ধ, কি খঞ্জ, কি বধির, কি পীড়িত, কি দীন-দুঃখী। এ দেশে ভিক্ষা করিতে সে সব আড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? ভিক্ষা করিলেই হইল।

কে ভিক্ষা না করে ? দীন-হীন, ধনবানের নিকট ভিক্ষা করে, ধনবানও দীন-হীনের নিকট ভিক্ষা করে। বড় বড় প্রকাণ্ডোদর জমীদারেরা চাষী প্রজাদের কাছে ভিক্ষা করেন ; আজ পিতৃশ্রাদ্ধ, কাল পুত্রের যজ্ঞোপবীত, তার পরদিন কন্যার বিবাহ। প্রজার নিকট ভিক্ষা না করিলে এসব কর্ম্মে মান থাকে কই ? বড় বড় কুলীন, তাঁহারা স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা করিয়া উদর পরিপূরণ করেন, নহিলে নবধা কুললক্ষণ উজ্জ্বল হয় না। বড় বড় অধ্যাপক আচার্য্য গোস্বামীরা ভিক্ষা করেন, নহিলে পরকালের কাজ হয় না।

তাঁহারা একান্ত পরহিতৈষী সন্দেহ নাই।

কে ভিক্ষা না করে? আমাদের দেশে সকলেই ভিক্ষা করে, কেবল ভিক্ষুক বিশেষে আর ভিক্ষার সময় বিশেষে, ভিক্ষার বিশেষ বিশেষ নাম আছে মাত্র। জমীদারের ভিক্ষার নাম মাঙ্গন, তাঁহাদের অনুচরদিগের ভিক্ষার নাম পার্ব্বণী, ভব-পারাবারের ত্রাণকর্ত্তা গুরুবর্গের ভিক্ষার নাম প্রণামী, আত্মীয় সমতুল্য ব্যক্তির ভিক্ষার নাম বিদায়। বরযাত্রীর ভিক্ষার নাম গণ, বরের বাপের ভিক্ষার নাম পণ, যে গ্রামে বিবাহ সে গ্রামের ভদ্রলোকদিগের ভিক্ষার নাম ডেলাভাঙ্গানি, আর তাহাদের যুবতীদিগের—অবলাবালাদিগের ভিক্ষার নাম—সেজতোলানি। নাছোড়বন্দ ব্রাহ্মণ ভিখারীর ভিক্ষার নাম বার্ষিক। যাঁহার বাড়ীতে ঠাকুরদেবতা আছেন, তাঁহার ভিক্ষার নাম দর্শনী। রাজরাজড়ার ভিক্ষার নাম নজর; কেবল অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখীর ভিক্ষার নাম ভিক্ষা। না হবেই বা কেন? তাহারা যে পরের ধন চাহিয়া লইবার বাসনা করে, তাহাদের এত বড় যোগ্যতা!

ভিক্ষা আমাদের সংস্কার। সকল জাতির একটা একটা বিশেষ সংস্কার থাকে; আমাদের সংস্কার ভিক্ষা। জন্মগ্রহণ করিয়াই ভিক্ষা পাই, তারে বলি যৌতুক। তা'র পর অন্নপ্রাশন; অন্নপ্রাশনেও যৌতুক। ব্রাহ্মণের তার পর উপনয়ন; উপনয়নে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে না করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। পরে বিবাহ, তখন সোণায় সোহাগা, নববধূর চাঁদমুখ দেখাইয়া ভিক্ষা লই। শেষ মৃত্যু; সে ব্যাপারটায় বড় বাঁধাবাঁধি,—যম ছেড়ে দেয় না, সুতরাং পুত্র গলায় কাচা বাঁধিয়া আমাদের জন্য ভিক্ষায় বাহির হয়।

আমাদের চক্ষে ভিক্ষাবৃত্তির অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি নাই। সেই জন্য আমাদের পূজ্য—দেবতা মধ্যে প্রধান—মহাদেবকে ভিখারী সাজাইয়াছি। আর বিষ্ণু বামন-অবতারে ভিক্ষা করিয়া ত্রিলোক রক্ষা করিলেন। এখনও কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলে ঠাকুরকে পয়সাটি না দিলে দর্শন মঞ্জুর হয় না। যখন বর্ণবিভাগ বদ্ধমূল হইল, তখন ইতর বর্ণ ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিল; যথা,—বৈশ্যে বাণিজ্য, ক্ষত্রিয়ে রাজত্ব, শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের বৃত্তিও শ্রেষ্ঠ হইল,—তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। অতএব ইহা স্থির যে, এ সংসারে ভিক্ষাই সার পদার্থ।

ভিক্ষায় আর এক সুখ আছে,—আদায়ের সুখ। খাতক যদি আমার কর্জ্জ শোধ না দেয়, তবে মহাকষ্ট; তাহার নামে নালিশ করিতে হয়। প্রভু যদি বেতন না দেয়, তবে আরও জঞ্জাল; উপায় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনই সুনীতি যে, ভিক্ষা আদায়ের নানা শাসন আছে। প্রজা যদি জমীদারকে ভিক্ষা না দেয়, জরিমানা কর—মিথ্যা নালিশ কর—চাল কাটিয়া উঠাইয়া দাও। শিষ্যযজমান যদি ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা না দেয়, অভিসম্পাত কর—বেটার সবংশে নির্ব্বংশ দাও; তাহাতেও না দেয়, পইতা ছেঁড়—আর একটা পইতা কিনিয়া পরিও; ইচ্ছা হয় তেরাত্রি কর, পার যদি ত লুকাইয়া লুকাইয়া কিছু কিছু আহার করিও; উনানে

পা পুরিও, কিন্তু দেখো, উনানে যেন আগুন না থাকে। আর যদি ব্রাহ্মণ না হইয়া জাতি-ভিখারী হও, তবে ধন্না দিও, মারে কাটে যার ছেড়ো না। শ্রাদ্ধের সময় ভিক্ষা করিতে গেলে, যার শ্রাদ্ধ তার নরক দেখাইতে ভুলিও না। পশ্চিম দেশে আর একটা প্রথা আছে, সেইটা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল,—তাহারা ঝাঁটা মারিয়া ভিক্ষা করে; পার ত দাতাকে প্রথমে সেইরূপ সমাদর সূচক অভ্যর্থনা করিও।

ব্রাহ্মণ-ভিখারী! তোমাকে আরও দুই একটা পরামর্শ দিবার আছে। তুমি ভিক্ষুক—পূজ্য ব্যক্তি, যাহার দান লইবে, তাহার সহিত একাসনে বসিও না—উচ্চাসনে বসিও; সে ব্যক্তি দাতা বইত নয়, তোমার সমানস্পর্দ্ধী? দাতার যদি সহজে মন না ভিজে, তাহার মাথায় শ্রীচরণখানি তুলিয়া দিও; ইহাতে কোন ক্রমেই সঙ্কোচ করিও না। ভিখারীর পাদপদ্ম কখন কখন কাদা, গোবর ও বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে—তথাপি দাতার মাথায় সোণার কিরীট থাকিলেও তাহার উপর পদ স্থাপন করিতে সঙ্কোচ করিও না। তাহাতে কার্য্যোদ্ধার না হয়, ভ্রূভঙ্গী করিও—ফিরিয়া দাঁড়াইও; আগে বলিও, "দেবে না কেন?" তাহাতেও না দেয়, অভিসম্পাত করিও; পুত্রগুলির অমঙ্গলটা আগে দেখাইও। তবু কিছু না দেয়, বাপ্ চৌদ্দপুরুষকে গালি দিয়া চলিয়া আসিও। কার্য্যোদ্ধারের আর এক উপায় আছে,—ডিপে হাতে বৈদ্য, কি পাঁজি হাতে দৈবজ্ঞ ইত্যাদি লোকের দেখা পাইলে দুই চারিটা উদ্ভট কবিতা শিখিয়া রাখিও; কষ্ট করিয়া অর্থ শিখিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে আসন গ্রহণ করিয়াই দুই একটা কবিতা ছাড়িও; পরে উপস্থিত কথার সহিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন যা' হো'ক একটা অর্থ করিয়া দিও। তসর কাপড়খানা আর ফোঁটার আড়ম্বরটা চাই আর যখন যেমন তখন তেমনি দাঁও ফাঁদিয়া বসিও। সুদের সুদ ছাড়িও না,—শাস্ত্রসম্মত দানটা হইলে দক্ষিণাটা না এড়ায়। যদি শুনিতে পাও যে, অমুক বাবুদের বাড়ী একটা বড় ক্রিয়া, সেই সময় সময় কালে গোহালের গরুগুলা বাহিরে বাঁধিয়া তথায় টোল ফাঁদিয়া বসিও; মামাত পিসিতত ভাইগুলাকে সাধিয়া পাড়িয়া দিন দুই তথায় পুরিও। পরে পত্রখানা জুটিলে সভায় উপস্থিত হইও। দেখ, গ্রামের বার্ষিক সামাজিক গুলিন যেন না ফস্কায়; সেটায় বড় মান। ফলাহারে কামাই দিও না; ফলাহার করিতে বসিয়া পাত হইতে গোটাকতক সন্দেশ চুরি করিয়া রাখিও; বিদ্যাটি ছেলেগুলিকে শিখাইও। দেখো, চিঁড়ে দইয়ের ফলাহারে নুন মাখিতে ভুলে যেও না। কণ্ঠায় কণ্ঠায় ফলাহারের সমাপ্ত করিয়া আচমনের পর খড়িকা খাইতে খাইতে বলিও, "এত কপালে ছিল, পাষণ্ড বেটার বাড়ী আহার করিতে হইল।" এমন কথা দুটা একটা না বলিলে পাছে লোকে বলে তুমি পেটের দায়ে ফলাহার করিতে গিয়াছিলে।

বিদ্যাশিক্ষা

সঙ্গীত

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধূলার বড় একটা অনুরাগী ছিলেন না; বাল্যকাল হইতেই তিনি পাঠানুরাগী ছিলেন। প্রথম বাল্যে রামায়ণ, মহাভারত, বেহুলার উপাখ্যান, মনসার ভাসান প্রভৃতি পড়িতেন। তারপর যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে দুই একখানা সংস্কৃত কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবিতা লিখিবার ঝোঁক চাপিল। ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' নিয়মমত পড়িতেন ও তাহাতে লিখিতেন। ক্রমে যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ও ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন, তত ইংরাজি কাব্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। সেক্ষপীয়র, কীটস্, বাইরণ, শেলি, চসার, মিল্টন সকলই অধীত হইল। পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও জীবন-চরিত পাঠে মনোনিবেশ করেন। ত্রিশ বৎসরের পর মৃণালিনী লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ করেন।

এই সময় সঙ্গীত-শিক্ষার ঝোঁক চাপিয়াছিল। সুযোগও বেশ হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তানুরাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তান-লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

একদিন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃণালিনী অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিজায়া গায়িতেছিল,—

বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে,
বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমা-শালিনী, যা মধু যামিনী,
না মিটিল আশা—রে॥

সুর বঙ্কিমচন্দ্রের মনোমত হইল না। তিনি সাতিশয় বিরক্তিসহকারে রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন। এবং পরদিন তিনি তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে এই গানটির সুরলয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীমতী সরলা দেবীও এই গানটির একটি সুর দিয়াছিলেন, এবং দিব্যেন্দুসুন্দরকে হারমনিয়ম সাহায্যে শিখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলিপুরে চাকরি করিতে করিতে তিনি মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শরীরতত্ত্ব বা Anatomy পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বল্পকাল মধ্যে শরীরতত্ত্ব

শিখিয়া লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নয়। তিনি অস্থি বা শরীরতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে বসিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অনন্যসাহায্যে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। আমি দেখিয়াছি, তাঁহার যখন কোন একটা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাসনা জন্মিত, তখন তিনি সে বিষয়টা আয়ত্ত করিবার জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন। যতদিন সেটা আয়ত্ত না হয়, ততদিন তাঁহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়া, রাশীকৃত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ কিনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার এ বিদ্যার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে বড় একটা পাই নাই—জীবনের শেষ সময়ে কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলাম।

কলিকাতায় অবস্থান-কালে মধ্যবয়সে তিনি একটু জ্যোতিষশাস্ত্রও শিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন তাঁহার শিক্ষাগুরু।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু হস্তাঙ্ক-গণনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল বলিয়া মনে হয় না। একদা তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটী বন্ধুসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সে ক্ষেত্রে মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির গণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন,—"(you) succeeded to an extent which surprised me."

তার কিছুদিন পরে জ্যোতিষী মহাশয় আহূত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। সে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স সাতচল্লিশ বৎসর। জ্যোতিষী মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েকটী অপরিচিত ভদ্রলোক তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই অপরিচিত ভদ্রলোক-দিগের পরিচয় তিনি পরে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা পুরুষ। অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, অভিন্নহৃদয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমীদার বৈবাহিক বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী মহাশয় ললাট দেখিয়া গণনা করেন নাই—হস্তাঙ্ক দৃষ্টে গণনা করিয়াছিলেন। ফলাফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন,—

"—You (Jyotishi) were correct in what you said of me in regard to certain matters which I am certain are not known to any one but myself.

"I state what happened once must not be understood as having yet proved any decided opinion on the subject of palmistry. What I am convinced of is that you are possessed of either a science, or certain powers of mind which I do not yet understand."

জ্যোতিষীর গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চমৎকৃত হইলেন; কিন্তু তবু তাঁহার বিশ্বাস

হইল না যে, হস্ত-রেখা দৃষ্টে ভাগ্য-গণনা সম্ভবপর।

আর একবারের কথা আমার মনে পড়ে। সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের * কথা। তখন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতায় একজন জ্যোতিষী আসিয়াছিলেন। তিনি কোন্ দেশবাসী তাহা ঠিক জানি না, বাঙ্গালী বা বিহারী হইবেন। মাড়ওয়ারীরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া বড় বাজারে একটী বৃহৎ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিল। জ্যোতিষী মহাশয় ললাট বা করাঙ্ক কিছুই দেখিতেন না। মানসিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন। প্রশ্নটী এক টুকরা কাগজে লিখিয়া মুঠার ভিতর রাখিতে হইত। আমি জ্যোতিষী মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁহার ক্ষমতা দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। একদা আমার প্রশ্ন ছিল, "আপনি সাধু, না জুয়াচোর?" জ্যোতিষী একটু হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "যে যেমন আমায় ভাবে।"

সে যাহা হউক, জ্যোতিষী মহাশয়ের কলিকাতায় যথেষ্ট নাম ও যশ হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে পণ্ডিতজী বলিয়া ডাকিত, রাজা মহারাজরা তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহে তিনি যাতায়াত করিতেন। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী কলিকাতায় একটা হুলস্থুল বাধাইয়াছিলেন। দিবারাত্র কাতারে কাতারে ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিত। দেখিয়া শুনিয়া—জানি না কেন—পুলিস তাঁহাকে কলিকাতা হইতে অপসারিত করিয়াছিল।

এত যশ ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়াও পণ্ডিতজীর আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত (স্যর) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ ঘটিয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঘটিয়াছিল। দামোদর বাবু একদিন সন্ধ্যাকালে পণ্ডিতজীকে সঙ্গে লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ভাবে বুঝিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বৈঠকখানায় দুই চারিজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতজীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসাইয়া তীক্ষ্ণ নয়নে ক্ষণেকের জন্য তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। পরে জ্যোতিষ গণনার কথা এককালে উত্থাপন না করিয়া দেশ বিদেশের আচার নীতি লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। মজলিস্ ভাঙ্গিবার কিছু পূর্ব্বে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা উঠিয়াছিল। রাত্রি ৯॥০ টার সময় পণ্ডিতজী গাত্রোত্থান করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন পণ্ডিতজী একটা কি গণনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পরদিন বঙ্কিমচন্দ্র আর হাসেন নাই। তিনি

* ১৮৯০ বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা।

অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এখনই পণ্ডিতজীর নিকট যাও; তাঁহাকে বলগে তাঁহার গণনা সত্য হইয়াছে।"

গণনাটা কি, তাহা না জানিয়াই পণ্ডিতজীর আবাসাভিমুখে ধাবিত হইলাম। এবং তাঁহাকে যথাযথ সংবাদ দিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলে তাঁহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইত না; শুধু আমার নয়—অনেকেরই এরূপ হইত। তিনি গম্ভীর হইলে মনে হইত, তাঁহার মুখ যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—নয়ন যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—ললাটে যেন গর্ব্ব তেজ বিচ্ছুরিত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না পাইয়া পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিতজী কি বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই। তবে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র পড়িয়া গিয়া একটা আঘাত পাইবেন, এই রকম কি একটা বলিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ যথেষ্ট ছিল। শেষ বয়সেও তাঁহার এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম। একদা তিনি বেদ ও উপনিষদ শিখিবার জন্য আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যের নাম অনেকেই সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন। এ দেশের লোক তাঁহাকে যতটা না চিনিত, বিদ্যার লীলাক্ষেত্র ইউরোপ তাঁহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ ছিল না; পরে উভয়ের মধ্যে কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়। * সেই সূত্রে আলাপ পরিচয়ের সূচনা হয়। যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সে দিনের পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব বাবু কেহই আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আসেন নাই। বাড়ীটি ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ—কলিকাতার একটি গলির (ঘোষের লেন) মধ্যে অবস্থিত। দুইজনে দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বিতলের সিঁড়ি পানে চাহিয়া দেখিয়া আচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। সিঁড়িটি কাঠের—একটা মই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিদ্বয় দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া পূজনীয় আচার্য্য মহাশয় সিঁড়ির মাথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং উভয়কে আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহাত্মাদ্বয় বিষণ্ণ বদনে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আচার্য্য তখন নামিয়া আসিয়া উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব বাবুর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভয় সংক্রামক,—ভূদেববাবুর যেটুকু সাহস ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল তিনি সকাতরে বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয়, এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব না।" পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় সিঁড়িতে কিরূপে উঠিতে নামিতে হয়, তাহার একটু মহলা দিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না।

* সামশ্রমী মহাশয়ের ভগিনীপতি পূজ্যপাদ দামোদর মুখোপাধ্যায়, আর দামোদর বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক।

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প—তাঁহার বদনে সাহসও অতুল। বুকের ভিতর কি হইতেছিল জানি না, কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া গলির ভিতর আসিতে না আসিতে তিনি রমেশবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন; বুঝিলাম, সাহসটুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সিঁড়ির নীচে যখন উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হইল। তিনি কেঁচো, কেন্নো, আশুলা প্রভৃতিকে সবিশেষ ভয় করিতেন জানিতাম; কিন্তু যিনি উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে, দস্যু সম্মুখে নির্ভীক-চিত্ত, তিনি যে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। অবশেষে নির্ভীক-হৃদয় বলবান্ রমেশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার তখনকার মুখের কাতর ভাব কয়েকদিন পর্য্যন্ত আমার মনে ছিল। রমেশবাবু কোন গতিকে বঙ্কিমচন্দ্রকে টানিয়া উপরে তুলিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। শেষ আসিয়াছিলেন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেবার শিক্ষার জন্য নয়—আচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী পরিদর্শন জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, তিনি একদিন স্বীয় প্রতিভাবলে জগতে নাম কিনিয়া যাইবেন। তাই—"তিনি তাঁহার সহপাঠী নব-বিধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বলিয়াছিলেন, 'I wish to know how far you have outgone me.' তখন কেশবচন্দ্র অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি প্রভাবে দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' তখন আলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করে নাই।" * কথাটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

সাহিত্য—নানা কথা

পণ্ডিত সুরেশ সমাজপতি নারায়ণে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

বঙ্কিমবাবু 'সৌখীন' ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সাজানো, গোছানো দেখিতাম। অগোছানো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা

* প্রদীপ, দ্বিতীয় ভাগ।

ও পারিপাট্য ছিল। বাড়ীতেও বঙ্কিমবাবুর পিরাণের বুকের বোতামের ছু' একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ কামাইতেন। পরামানিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝক্-ঝক্ চক্-চক্ করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত; কোথাও এক বিন্দু ধুলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড-গুডটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা; মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ মিঠাইয়া, জিরাইয়া ধীরে ধীরে, তামাক টানিবার আয়েস ভোগ করিতেন।—বাড়ীতে ঢুকিলে, ঘরের চারি দিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যে ও বঙ্কিমবাবুর 'সৌখীনতা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্য, রচনায় সৌন্দর্য্য, বাক্যবিন্যাসে সৌন্দর্য্য, শব্দ-চয়নে সৌন্দর্য্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীও সৌখীন, সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির 'রচনা-রীতি' খুব সৌখীন।

সেকালের "সাহিত্যে"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম মূল্য ১০্ দশ টাকা। ইহা 'রাজসংস্করণ'। রাজসংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা রাজসংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনও প্রজাও হন নাই। এক শত ছাপা হইত। একজন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী;—জমীদার টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। ইনি এখন 'রাজা'র ভাই-দাদা বটে।

যাক্। অবশিষ্ট নিরানব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই রাজসংস্করণের "সাহিত্য" লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। "সাহিত্য"খানি হাতে করিয়া লইলেন; বলিলেন, "বাঃ, চমৎকার।" উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন; আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?"

আমি বলিলাম, "এক শত এইরকম ছাপা হয়, সব নয়।"

"তাতেও ত অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?"

"কেহ নয়। আমরা সখ করিয়া ছাপি। এক জন গ্রাহক হইয়াছেন।" প্রমথবাবুর নাম বলিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বহিগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দাম

বাড়াইতে হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশের লোক বেশী দাম দিয়া কিনিতে পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রী কমিয়া যাইবে।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তা হ'তে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব।"

আমি বলিলাম, "দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।"

"তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, এ দেশে এখনও cheap literatureএর সময় হয় নাই। আমার মনে হয়, উপন্যাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।"

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিলাম, "সকলের সুবিধার জন্য আমরা 'সাহিত্যে'র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—'সাহিত্যে'র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে তিন টাকা, দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। 'বঙ্গদর্শনের' সময়েও দেখিয়াছি, 'প্রচারে'ও দেখিয়াছি;—যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।"

"যাহারা খুব গরীব? তাহারা কি পড়িতে পাইবে না?"

"খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, পড়িতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই; তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literatureএর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিস সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনও ক্ষতি নাই। কতকটা পড়া শুনা থাকিলে যে সব জিনিস পড়া চলে, খুব অল্পশিক্ষিতের পক্ষে সে বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literatureএর সম্বন্ধ আছে।

তার পর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "দিব্য 'get up' হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আমরা ত আর কিছু করিতে পারিব না। কাগজে, মলাটে, বাহারে যা হয়।—"

"কেন? তোমাদের কাগজ ত বেশ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি যদি 'বঙ্গদর্শন' ঘুড়ীর কাগজে বটতলার ছাপাখানায় ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব?"

মনে করিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন; বলিবেন, "তা বটে।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমরা না পারিবে কেন? এখন যে সব কাগজ বাহির

হইতেছে, 'বঙ্গদর্শনে'র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙ্গালায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোক কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎসামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত, সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার 'সাহিত্যে'র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মত original research করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তের 'মৃত্যুর পরে'—উঁচু দরের লেখা। 'বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।—তোমরা পারিবে না কেন? 'বঙ্গদর্শনে'র কাজ বঙ্গদর্শন করিয়াছে; তোমাদের কাজ তোমরা কর।"

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "মৃত্যুর পরে"র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর styleএরও তিনি প্রশংসা করিতেন। "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের "বৈদিক প্রবন্ধাবলী"ও "বেদ প্রবেশিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয়, দুই-ই ইন্দুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, "আপনার লেখা? আপনার প্রবন্ধ, আলোচনা, উপন্যাস,—সে রকম আর কে লিখিবে? সে গৌরব ত আর কোনও মাসিকের ভাগ্যে জুটিবে না। আপনি ত আর কোনও কাগজে লিখিবেন না।"

"আর আমরা লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই; আমার সেই প্রথম দিনের হুকুম মনে আছে।"

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ, এত টাকা খরচ করিতেছ; 'বন্ধ করিয়া দাও' বলিতেও ইচ্ছা হয় না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচপত্রটা চলিয়া যায়, এমন কিছু করা যায় না?"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "যায়। সে উপায় আপনার কাছে আমার বলিবার উপায় নাই!"

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।"

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, "একটাই দিন না?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তোমাকে একটা দিলে চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতীদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার 'ভারতী' আছে। রবি আসেন; জান ত 'প্রচারে'র সময় এক পালা হইয়া

গিয়াছে। তাঁহার 'সাধনা' আছে। তুমি আছ, তোমার 'সাহিত্য' আছে তার পর আর এক আছেন,—আমার বেয়াই দামোদর বাবু।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার 'প্রবাহ' ত নাই। তিনি কি আবার—"

"না; তিনি 'নব্য-ভারতে'র জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছি—আমা দ্বারা হইয়া উঠিবে না।—এখন, তিনটি লিখিতে পারিলেও হয়। তা যে কবে পারিয়া উঠিব, তা ত বলিতে পারি না।"

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল,—হারাণবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন, জান?—'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু হারাণবাবুকে আর এক দিন পাঠাইয়াছিলেন। 'জন্মভূমি'র জন্য আমার উপন্যাস চান। পাঁচ শত টাকা দিতে চাহিয়াছেন।"

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু—স্বনামধন্য, এখন রায় সাহেব হইয়াছেন। কোন চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে হয় না। হারাণচন্দ্রের জন্য মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায় সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "বসুন হারাণবাবু।— আমি পারিয়া উঠিব না।"

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহারও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না।" তারপরে হারাণবাবুকে বলিলেন, "সাহিত্যের get-up দেখুন।"

হারাণবাবু বলিলেন, "ক'খানিই বা ছাপা হয়? 'জন্মভূমি' অনেক ছাপিতে হয়; 'জন্মভূমি'র ছাপাও মন্দ নয়।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না।"

হাসিতে হাসিতে হারাণবাবু বলিলেন, "যোগেনবাবুকে কি বলিব?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"বলিবেন—আমি পারিব না।" তারপর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই এক টান তামাক টানিয়া বলিলেন,—"ভক্তি প্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পারিয়া উঠিব কি?"

হারাণবাবু বলিলেন, "আমি আর এক দিন আসিব।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "কিন্তু আমাদ্বারা হইয়া উঠিবে না।"

আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম, তাঁহাকে ত আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই! আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা-নয়নে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!—"

বঙ্কিমচন্দ্রকে সময় অপব্যয় করিতে বড় দেখি নাই। প্রত্যেক মুহূর্তের মূল্য আছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন। বুঝিতেন বলিয়াই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও উপন্যাসাদি লিখিবার অবসরাভাব অনুভব করিতেন না। কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী-

ব্যক্তিও তাহা বুঝিয়াছিলেন। একদা মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ কুৎসা করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈষদ্ধাস্যের সহিত তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন। শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লোকটা সমস্ত দিন গভর্মেন্টের কাজে ব্যস্ত থাকে, আবার রাত্রিও যদি এই রকমে কাটায়, তবে বই লিখ্‌তে সময় পায় কখন? তার কেতাবে যে আমার আলমারির একটা সেল্‌ফ ভরে গেল।"*

তবে সাহিত্যিকদের সহিত আলাপাদি করা সময় অপব্যয় বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার সানুকিভাঙ্গার বাড়ীতে সাহিত্যিকদের একটা মস্ত আড্ডা হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণবিহারী সেন, মুরলীধর সেন, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা অলঙ্কৃত করিতেন। ইহারা সকলে প্রত্যহ আসিতেন না; অবসর মত রবিবারে আসিয়া আড্ডা দিতেন। সময় সময় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাশয়েরাও আসিতেন। এ আড্ডায় সাহিত্যচর্চ্চাই বেশীর ভাগ হইত। এখন আর সেরূপ কোন আড্ডা দেখিতে পাই না। তবে আমরা এখন 'পূর্ণিমামিলন' পাইয়াছি, বৎসরান্তে 'সাহিত্য-সম্মিলন'ও লাভ করিয়াছি। তাহাতে লাভ কতটুকু হইয়াছে, তা' বলিতে পারি না।

স্থানান্তরে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে'র স্থানবিশেষ অনুবাদ করিয়া লেডি ইলিয়টকে উপহার দিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল অনুবাদ করিবার জন্য যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অনুমতি-প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিরাশ হইতে হয় নাই। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সকল পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইতে দেওয়া উচিত, এরূপ তিনি বিবেচনা করিতেন না। দেবীচৌধুরাণী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। কেন ছিল, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কথাটা গোড়া হইতে বলা ভাল।

ইংলণ্ডে একটি ক্লব ছিল—সম্ভবতঃ এখনও আছে। সেই ক্লবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে যাঁহারা সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষার্থী, তাঁহারাই শুধু যোগদান করিতেন। সেই সভায় ভিন্নজাতীয় সভ্যেরা আপন আপন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য বা সাহিত্য, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া অপরাপর সভ্যদের শুনাইতেন। মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত যখন শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি এই ক্লবের অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থনিচয় মুখে মুখে অনুবাদ করিয়া অন্যান্য শ্রোতাদের শুনাইতেন। একদিন দেবীচৌধুরাণীর অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছিলেন। তচ্ছ্রবণে য়ুরোপীয় শ্রোতারা সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া দেবীচৌধুরাণীর অনুবাদ প্রকাশের জন্য মিষ্টার

* বন্ধুবর সুরেশ সমাজপতির প্রমুখাৎ শ্রুত।

জে, এন, গুপ্তকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য গুপ্ত সাহেবকে চেষ্টান্বিত হইতে হইয়াছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমতি-প্রাপ্তির আশায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে বিলাত হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশবাবুর বক্তব্য আদ্যন্ত শুনিয়া তাঁহাকে একখানি বাঁধান পুস্তক দেখাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকৃত "দেবী চৌধুরাণী'র ইংরাজি অনুবাদ। কিন্তু ছাপান হয় নাই। পুস্তকখানি দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি এ অনুবাদ নিজে করিয়াছি, কিন্তু ছাপাই নাই। কেন, তা' জান? আমার মনে হয়, ইংরেজেরা বহুবিবাহ পছন্দ করিবে না—তাহারা হয় ত এ দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিবে।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করেন নাই; তিনি নিজেও কোন অনুবাদ ছাপান নাই।*

সাহিত্যিক মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিল। তাঁহাদের উপদেশ দিতে বা বিপদে সাহায্য করিতে কখন তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না। একবার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। পত্রখানির নাম—"প্রকৃতি"। অনুকূল বাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ গোবিন্দচন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কবিতা পড়িয়াই ত কালীপ্রসন্ন বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকীল মোক্তার ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে নিযুক্ত হইল। খরচ সম্ভবতঃ রাজার। দরিদ্র, সাহিত্যসেবী অনুকূল বাবু মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি ভীত হইয়া ডেপুটী মেজেষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। সেন মহাশয় মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অবশেষে অনুকূল বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় ছিল না। পরিচয়ের প্রয়োজনও দেখি না। যে সাহিত্যিক, সাহিত্যচর্চ্চায় যাহার আনন্দ, সে বঙ্কিমচন্দ্রের পরমাত্মীয়। বিশেষতঃ যে যুবক ক্ষীণ যষ্টি-সাহায্যে সাহিত্য-সৌধের সোপানাবলী অতিক্রম করিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইতেও প্রিয়। অনুকূল বাবুর বিপদের কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্ন বাবুকে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন, "অনুকূল সাহিত্য-সেবা করিতে গিয়া আজ বিপদ্গ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মোকর্দ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এ অনুগ্রহ আমায় প্রতিই করা হইল, জানিবে।"

কালীপ্রসন্ন বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ ঠেলিতে পারিলেন না,—অবিলম্বে

* বন্ধুবর সুরেশচন্দ্রের প্রমুখাৎ শ্রুত।

মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইলেন। অনুকূল বাবু স্বীয় পত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মানুষ জনসমাজে পরিচিত হইবার জন্য কতই না চেষ্টা করে। মিথ্যা কথা, অলীক গল্প রচনা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর অনেকেই চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে কত পরামর্শ গোপনে তাঁহাদের সঙ্গে আঁটিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে আজি পর্য্যন্ত এ চীৎকারের বিরাম নাই। যে সকল ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে দূর হইতে ভিন্ন নিকটে কখন দেখেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির চীৎকারই কিছু বেশী। তা' হউক, এ সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, কেন না, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সুনাম যশঃ অপহরণ করিবার বাসনা করেন নাই।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জনসমাজে প্রচার করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থবিশেষের অংশবিশেষ তাঁহারা রচনা করিয়াছেন, সে সকল ব্যক্তি কোনমতেই মার্জ্জনীয় নহেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষণে জীবিত নাই; তাঁহার প্রিয়বন্ধু চন্দ্রনাথ বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবু, দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি কেহই সাক্ষ্য দিতে বা প্রতিবাদ করিতে ইহসংসারে নাই। এ অবস্থায় যদি কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের রত্ন অপহরণ করিয়া নিজে সেই রত্নে মণ্ডিত হইবার বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিব, বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁহার বন্ধুবর্গেরা জীবিত থাকিতে এ সকল কথা বলিতে সাহস পাও নাই, আজ তাঁহাদের অবর্ত্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের যশঃ অপহরণ করিয়া নিজে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছ। যাহার ক্ষমতা নাই, যাহার ধন নাই, সেই পরের রত্ন নিজের বলিয়া পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকরাজির মধ্যে "কমলাকান্তের দপ্তরের" দুইটী প্রবন্ধ মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত নয়। সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকবিশেষের অংশবিশেষ যদি কেহ লিখিতেন, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে সে কথা বলিতেন—পুস্তকশিরে সানন্দে তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া যাইতেন। যখন তিনি তাহা করেন নাই, তখন আজ বিশ বৎসর পরে কোন ব্যক্তি অংশবিশেষ দাবী করিলে জনসমাজ তাঁহার দাবী অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

আকবর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একবার দুই চারি কথা বলেন। কোথায় বলেন এবং কি বলেন তাহা ঠিক জানিয়া উঠিতে পারি নাই। অবশেষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বোলপুরে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"বহুকাল হইল জেনেরাল এসেম্বিলীর হল ঘরে 'ভারতবাসী ও ইংরাজ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সভায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধে

আকবরের কিছু প্রশংসা ছিল, তদুত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—'আকবরের মত কোন মোগল বাদসাই হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। তিনি বন্ধুত্বের ছলেই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন।' তাঁহার এই উক্তি কোনো ছাপার কাগজে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।"

ইহার কিছুকাল পরে নারায়ণ-পত্রে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত একটী প্রবন্ধ দেখিলাম, প্রবন্ধের অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"মোগলকুলতিলক আক্‌বর সাহকে আমরা সম্রাটশিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আক্‌বরের বিবিধ গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল-রাজ-দরবারকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্বিলীর হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশী অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র সম্মিলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগতপ্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম স্মরণ নাই, তবে তাতে প্রসঙ্গক্রমে মোগল শাসনের উল্লেখ ছিল এবং আক্‌বরের প্রসঙ্গও ছিল।

"সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল, একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুক্কায়িত সত্যকথা প্রকাশ পাইল। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, 'আক্‌বরের নামে দেশের লোক এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দুজাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার উচ্চ উদার রাজনীতিজ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। তিনি সুবিধামত বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারী দিগকে মোগল অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন। এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়, উদারতার লেশমাত্রও ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজকুমারের পরিণয় ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলেও না হয় একদিন মনে করা যাইত যে, তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আকবর স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন মাত্র।'

"উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আপনি কাল আমায় খুব বাঁচাইয়াছেন। এত লোকের জনতা হবে জান্‌লে কি আমি যেতুম। আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়বেন। পরে আমি দু'দশ কথায় আমার মন্তব্য শেষ করিব। একি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়?' এই 'ঐ রকম' কথার

অর্থ এই যে, সে দিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্বিলীর মল্লায়তন হলে লোকে লোকারণ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত। সেই সভায় বহুলোক অতিকষ্টে কেবল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে, শেষে রুক্ষভাবে, পরে অভদ্রোচিত ইতর বচনবিন্যাসে নানা রঙ্গভঙ্গ করিয়া—শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য-দর্শন আর কখন ঘটিয়াছিল কি না জানি না। বঙ্কিমবাবুর ত নিশ্চয়ই ঘটে নাই। সেই গোলটা থামাইবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ছিলাম, ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ী আসিয়াছি।'

ইনষ্টিটিউট-মন্দিরে ১৮৯৩ সালের ১০ই অক্টোবর অপরাহ্নে Society for the higher training of young menএর একটি অধিবেশন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার উক্ত সোসাইটীর একটি সভায় যোগদান করেন। সে সভায় তদানীন্তন ছোট লাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও প্রকাশ্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে ইনষ্টিটিয়ুট-মন্দিরে ইহার পরেও দুইবার আসিয়াছিলেন। প্রথম বার ৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারে—দ্বিতীয়বারে, মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিবার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে। সে দুইবার বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই বাটীতে উঠিয়া আসেন। বাটীটি পটলডাঙ্গায় মেডিকেল কলেজের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে 'বঙ্কিম-আশ্রম' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি প্রস্তরফলক বঙ্কিম-আশ্রমের প্রাচীরে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে,—এই স্থানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। জন্ম—সন ১৮৩৮, মৃত্যু—সন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র একটু স্নেহ করিতেন। উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। দামোদর বাবুর "শান্তি" উপন্যাস প্রকাশিত হইলে তিনি একখানি পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার দিয়াছিলেন। উপহার প্রাপ্তিস্বীকার

করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—

"প্রিয়তমেষু

* * * *

শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম—পরলোকেও ভরসা করি, দামোদর তাহাতে আমায় বঞ্চিত করিবেন না। ইতি তাং ২২ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কবিতাও লিখিতে হইত। সেটা ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়—দায়ে পড়িয়া। একবার কালেজ Re-union মিলন-সভার পাঠোপযোগী একটি কবিতা লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনুরোধ করিয়াছিলেন, জগদীশ বাবু। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মালদহে। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই জানাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি তাঁহার পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধৃত করিবার আরও একটু কারণ আছে; বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে লিখিতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পত্রখানি শেষ করিয়াছেন। উপদেশটুকু মূল্যবান্। পত্রখানি ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছিল। আমি অনুবাদ না করিয়া যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম।

Malda.
The 30th December.

My dear Jagadish,

You write that you would be glad if I sent something for the Re-union. As I would do anything to make you glad, I immediately got down to write a poem for you. I received your note on the evening of the 28th, the post having been accidentally delayed for a few hours. I finished a few stanzas this evening, but sleep came on and I put it off to next morning.

* * *

If I send it by tomorrow post you won't get it in time. So I think I must give up the idea of contributing to your pleasure.

But it strikes me that it may be some compensation to you for this and contretemps of khani * had an opportunity of reading his unfinished novel before the assembled friends at the Re-union. And I therefore post back his manuscript today. Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant

* Babu Khagendranath Raya, son of the late Babu Jagadishnath Raya.

flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetroric and ornament. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at this conviction after much painful experience. He should re-write his book with reference to these remarks.

* * *

Yours affly
Bankim Chandra Chatterji.

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র বড একটা ইংরাজীতে পত্র লিখিতেন না। আমরা কখনও তাঁহার ইংরাজী পত্র পাই নাই। তিনি বলিতেন, "বাঙ্গালা ভাষায় যখন আমরা সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারি, তখন আমরা নিজের ভাষা ছাড়িয়া কেন অপরের ভাষায় পত্র লিখিব ? তা ছাড়া ইংরাজী ভাষাটা insincere বলিয়া মনে হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে
পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, "বিষবৃক্ষ" ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষ ইংরাজিতে হইল, "Poison tree"—মহাপণ্ডিত Edwin Arnold, Poison treeর একটা ভূমিকা লিখিয়া বলিয়াছিলেন,—I soon found that what was begun as a literary task became a real and singular pleasure, by reason of the author's vivid narrative, his skill in delineating character, and, beyond all, the striking and faithful pictures of Indian life with which his tale is filled. * * Five years ago, Sir William Herschel of the Bengal Civil Service, had the intention of translating this Bisha Briksha ; but surrendered the task, with the author's full consent, to Mrs. Knight. * *"

The author of the "Poison Tree" is Babu Bankim Chandra Chatterjee of superior intellectual acquisitions, who ranks unquestionably as the first living writer of fiction in his Presidency. * * It will be confessed, I think, that the reputation of

Bankim Babu is well deserved, and that Bengal has here produced a writer of true genius, whose vivacious invention, dramatic force, and purity of aim, promise well for the new age of Indian vernacular literature.

"Among Bengali authors no one held a higher place in his own line than the late Bankim Chandra Chatterji. He rendered good service in a number of districts; while in charge of the Khulna Sub-division he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals." *

"Like Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji was ridiculed for his new departure from the high ways of prose-writing in Bengal. Critics are readymade, and not a few of them condemned in bitter language his style, his composition, the plot of his story, and the audacity of his conceptions. But Bankim Chandra outlived all cynical criticism, and succeeded in inaugurating a new era of prose literature in Bengal—" **

"Bankim Chandra was beyond question the greatest novelist of India during the 19th century, whether judged by the amount and quality of his writings, or by the influence which they have continued to exercise. His education had brought him into touch with the works of the great European romance writers, notably Sir Walter Scott, and he created in India a school of fiction on the European model. * * * and the *Kapalkundala* and *Mrinalini* which followed it *established* his fame as a writer whose creative imagination and power of delineation had never been surpassed in India.—" ***

"His *Durgeshnandini* was the first, and is unquestionably the best, novel in Bengal. The *Kapalkundala*, though equally good, is not so well spoken of by native readers. The style is essentially Babu Bankim's own; and we meet with the same witticisms,

* Buckland's Bengal under the Lieutenant governors. Page 1078.

** Pillai—Representative Indians—Page 76.

*** Encyclopædia Britannica.

the sly hits, and the same displeasing combination of the grave with the ludicrous. The characters are all what we should expect to see in real life ; and the vivid descriptions of scenery, natural and artificial, always our author's *forte*, are so telling that scarcely any Bengali novelist of the present day except, perhaps, the writer of *Bangadhipparajaya* can hope to match him in the line—" Calcutta Review, Vol. LVII.

"We have now before us an historical prose romance (Durgesh-nandini) by a Bengali author, which rejecting all the mythological times, has fixed its scene in the days of the great Emperor Akbar, and, without a single marvel of magic or metampsychosis, seeks its sole interest in human passion and life's daily struggles with adverse circumstances. The book has already reached its fourth edition, and we may therefore fairly consider it as the successful inaugurator of a new kind of literature in Bengal. He (Bankim Chandra) has since written several novels in Bengali ; but the one which we have taken as our subject is the most successful with his countrymen ; and we think it is well worthy of some notice in England, as the first attempt to transplant into India our own historical novel,"—Professor Cowell—Mackmillan's Magazine, Vol XXV. page 455.

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্র Punch বিষবৃক্ষের অনুবাদ পাঠ করিয়া ১৮৮৫ সালের ৩রা জানুয়ারির কাগজে লিখিয়াছেন :—

"THE POISON TREE"

You ought to read the Poison Tree
'Tis Fisher Unwin's copyright—
By Bankim Chandra Chatterjee !

'Tis taken from the Bengali,
Translated well by Mrs. Knight—
You ought to read the Poison Tree.

'Tis published in one vol.—not three—
A story quaint and apposite ;
By Bankim Chandra Chatterjee,

As Mr. Edwin Arnold he—
A learned preface doth indite ;
You ought to read the Poison Tree.

Tough bored by novels you may be—
Don't miss this tale, by oversight,
By Bankim Chandra Chatterjee,

'Twill whet, this novel—noveltee,
The novel reader's appetite,
You ought to read the Poison Tree
By Bankim Chandra Chatterjee.

শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট, কৃষ্ণকান্তের উইলেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। Oxford Universityর মহাযশস্বী Blumhardt সাহেব, সেই অনুবাদের একটা ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ভূমিকাটুকু সুন্দর। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"Bankim Chandra Chatterjee was unquestionably the greatest novelist that India has ever produced. No other writer has done so much to improve the style, and to raise the tone of Bengali literature. His severe criticisms on the worthless and ephemeral productions of so many of his fellow countrymen, his fearless exposure of the faults and shortcomings of Hindu social life, and of the evils arising from a corrupt and superstitious form of Hindu religion, have brought about a complete revolution in the history of Bengali literature.

"He was himself a vigorous author. His works display a wonderful power of description and delineation of human life and character, which render them so deeply interesting and instructive.

"Towards the close of his life Bankim Chandra appeared as an advocate of a reformed system of Hindu religion, and a teacher of the sublime philosophy of the Bhagavadgita.

"Bankim Chandra was also an able exponent of intellectual and scientific research. He was himself a perfect master of the English language, as well as of Sanskrit."

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার মূল্যবান পুস্তকে (Literature of Bengal) লিখিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is in prose what Madhu Sudan Dutt is in verse,—the founder of a new style—the exponent of a new idea. In creative imaginations, in gorgeous description, in power to conceive, and in skill to describe, Madhu Sudan and Bankim Chandra stand apart from the other writers of the century; are the first, the second is nowhere. And if the poet's eonceptions are more lofty and more sublime, the novelist's conceptions are more varied, have more of human interest, and appeal more touchingly to our softer emotions. The palm must be given to the poet who has bodiecd forth beings of heaven and earth and the lower regions in gorgeous verse which sprang into existence like an echo to his ideas; but the reader, after he has traversed the universe on the wings of the mighty poet, will descend with a sense of pleasure to the homely scense of the novelist, peopled with figures and faces so true and life-like, so sparkling and animated, so rich in their veriety and beauty, that they seem to be a world by themselves, created by the will of the great enchanter!"

R. W. Fraser, L. L. B. তাঁহার Literary history of India পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is the first great creative genius modern India has produced. For the Western reader his novels are a revelation of the inward spirit of Indian life and thought.

"As a creative artist he soars to heights unattained by Tulsi Das, the first true dramatic genius India saw. To claim him solely as product of Western influence would be to neglect the heritage he held ready to his hand from the poetry of his country.

"The English reader must not he surprised if, in the novels of the greatest novelist India has seen, there is much of Eastern form, much of poetic fancy and spiritual mysticism alien to a Western craving for objective realism. Bankim Chandra Chatterji, with all the artistic delicacy of touch so easily attained by the subtle deftness of a high-caste native of India, or a Pierre Loti, weaves a fine-spun drama of life, fashioning his

characters and painting their surroundings with the same gentle touch, as though his fingers worked amid the frail petals of some flower or moved along the lines of fine silk, to frame therewith a texture as unsubstantial as the dreamy fancies with which all life is woven, as warp and woof.

* * * * *

"The novel (Kapalkundala) throughout moves steadily to its purpose. There is no over-elaboration, no undue working after effect ; everywhere there are signs of the work of an aritist whose hand falters not as he chisels out his lines with classic grace. The force that moves the whole with emotion, and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. **Outside the** *"Mar-age de Loti"* **there is nothing comparable to the** *"Kapalkundala"* **in the history of Western fiction,** although the novelist himself, and many of his native admirers, see grounds for comparing the works of Bankim Babu with those of Sir walter Scott, probably because they are outwardly historical.

"In Nagendra's love for Kunda the novelist declares that he wished to depict the fleeting love of passion, as sung by Kalidasa, Byron, and Jaya Deva, and in his love for Surjyamukhi, the deep love which sacrifices one's own happiness for the love of another, as sung by Shakespeare, Valmiki, and Madame de Stael.

"He leaves us in doubt whether he is depicting life as it throbbed around him, or whether he has hemmed in his characters with a surrounding of Eastern mysticism and romantic reserve born of Western conventionality.

উক্ত পুস্তকের আর এক স্থানে Fraser সাহেব বলিয়া গিয়াছেন :—

"Men such as Rammohan Roy, Keshab Chandra Sen, Madhusudan Dutt, Bankim Chandra Chatterji, Kasi Nath Trimbak Telang are no bastard bantlings of a western civilisation ; they were creative geniuses worthy to be reckoned in the history of India with such men of *old* as Kalidas, Chaitanya, Jayadeva,

Tulsi Das and destined in the future to shine clear as the first glowing sparks sent out in the fiery furnace where new and old were fusing."

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হইলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Calcutta University Magazine পত্রে [Dated May 1, 1894] লিখিয়াছিলেন :—

"One of his (Bankim's) ancestors received the title of high nobility in the court of Ballal Sen. His title was confirmed by Ballal's distinguished son, king Lakshman Sen. One of Bankim's ancestors performed the difficult and now unknown sacrifice of *Abasatha*, hence the family was distinguished above all other brahman families in Bengal as *Abasatha*. This family is one of those which never migrated to Vikrampur after the fall of Hindu monarchy in western Bengal. By the middle of the sixteenth century, when a great Chapter of Rarhyah brahman nobility was held under the presidency of Devivara, the great re-organiser, Bankim's ancestors were found so distinguished for their learning, piety and strict adherence to Hindu laws that they were placed in the highest of the thirty-six exogamus groups or *Mels* into which Devivara divided the *Kulin* brahmans of his time.

"Ishvara Gupta was so much charmed with his (Bankim's) poetical & prose compositions that he often paid him a visit at Kantalpara. In after life, Bankim Chandra used to relate to his friends the story of these visits with pride.

"At College Bankim chandra was a voracious reader of history, and he always longed to be a distinguished historian. It is often observed that literary men are averse to mathematics, but this was not the case with our hero. He took to mathematics with as much zest as he took to literature. His English style was terse and vigorous, and was often characterised his superior officers as pungent.

* * *

He was not always social, some people thought he was positively rude, but he was all love, all admiration in the company of his literary friends whatever their age & position in life."

বঙ্কিম-জীবনী

পঞ্চম খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্র—হৃদয়

সংসার ও সমাজ

স্নেহময় হৃদয় লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সংসারে আসিয়াছিলেন। মাতাপিতার চরণপ্রান্তে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নবীন বয়সে যে প্রেমশিক্ষা করিয়াছিলেন, সে প্রেম তাঁহাকে আজীবন উন্মত্ত রাখিয়াছিল। সে প্রেম-কণা তাঁহার উপন্যাসে, সে প্রেম-কণা তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে'। মাতাপিতা, স্ত্রীকন্যাকে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত কয়জন ভালবাসিতে পারিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে মানুষ মনে করিতেন না—জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা মনে করিতেন। স্ত্রীকে স্বধু ভার্য্যা মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না—সহধর্ম্মিণীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। আত্মজাকে লালন পালন করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল, এরূপ মনে করিতেন না; তিনি তাহাকে নিজের উপযুক্ত শিষ্যা করিবার উদ্দেশ্যে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। এইরূপে দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ বা প্রেম কেমন একটু স্বর্গীয়ভাবে, কেমন একটু বিশেষত্বে বিজড়িত। সে ভাব সংসারে সচরাচর দৃষ্ট হয় না; সে ভাব সকল স্থলে শিক্ষা পাওয়া যায় না। যাদবচন্দ্র যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পুষ্পফলে ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। এমনটা হইবে যাদবচন্দ্র বুঝি জ্ঞানবলে পূর্ব্বাহ্নে জানিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন অনাচারী ও ঘোরতর নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন যাদবচন্দ্র একদিনের জন্যও সদুপদেশ দ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করেন নাই, বা সুপথে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটী গল্পের অবতারণা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র—পুত্ররূপে

একবার পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হইয়াছিল। তিনি খট্টাঙ্গোপরি শয্যায় শয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতার নাড়ী পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। যাদবচন্দ্রের একপার্শ্বে গৃহ-প্রাচীর, অপর পার্শ্ব উন্মুক্ত। যাদবচন্দ্র

প্রাচীরের নিকট শয়ান ছিলেন। শয্যার উপর না উঠিলে যাদবচন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বিপদে পড়িলেন ; শয্যার উপর উঠিতে পারেন না, পিতাকেও সরিয়া আসিতে বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এক পাশের বিছানা উঠাইয়া খাটের উপর পা রাখিয়া পিতার হস্তস্পর্শ করিলেন। পিতার শয্যা, পিতার বসন, পিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। পিতার কক্ষে কখন চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া আসিতেন না—পিতার ব্যবহৃত বস্তু কখন ব্যবহার করিতেন না।

আর এক দিনের কথা বলিব। একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিম্নমুখে বঙ্গদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। পদশব্দ শুনিতে পাওয়া দূরে থাক্, নিকটে দাঁড়াইয়া সহজকণ্ঠে কেহ কথা কহিলেও তিনি শুনিতে পাইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার কার্য্যে বাধা দিতে পারেন না—শিক্ষিত ভদ্রসন্তান পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারেন না। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া চলিয়া যাওযাটা তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না ; তাহাতে পিতার প্রতি একটু যেন অবজ্ঞা দেখান হয়—যেন একটু অধৈর্য্য, একটু বিরক্তি প্রদর্শন করা হয়। জানি না কি ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইযাছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী * তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কর্ত্তামশায়, ও কর্ত্তামশায়, সেজবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে।"

কর্ত্তামহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর-অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক একটা শিশিতে ভরিয়া লইয়াছিলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা গঙ্গোদক ; জননী বলিলেন, "করলি কি ! গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি ?"

বঙ্কিমচন্দ্র ছল্‌ছল্ নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড় ?"

মাতৃভক্ত সন্তান চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার কক্ষ-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কক্ষ বাহিরে পাদুকা খুলিয়া, লোকে যেরূপে দেবালয়ে প্রবেশ করে, বঙ্কিমচন্দ্র সেইরূপে ভক্তিপ্লুত চিত্তে পিতার ঘরে প্রবেশ করিলেন্। পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতার চরণধূলি মাথায় গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না,—তিনি

* দাসীর নাম লক্ষ্মী ; চল্লিশ বৎসর যাদবচন্দ্রের সেবা করিয়া সম্প্রতি অশীতি বৎসর বয়সে মারা গিয়াছে।

পিতার চরণ সমীপে বসিয়া রহিলেন। ইচ্ছা, পাদোদক গ্রহণ করেন। কিন্তু বলিতে সাহসে কুলাইল না। একবার চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন; দেখিলেন, অদূরে আমার জননী ও পিতামহী নীরবে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের পিছু পিছু আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কাতর দৃষ্টিতে জননীর পানে চাহিলেন। তিনি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন; এবং ঝটিতি একটা জলপূর্ণ ক্ষুদ্রপাত্র আনিয়া যাদবচন্দ্রের চরণসমীপে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবনতবদনে নীরব রহিলেন। যাদবচন্দ্র পা বাড়াইয়া দিলেন। ভক্ত পুত্র তাহা সযতনে ধৌত করিয়া লইলেন, এবং অন্তরালে গিয়া সেই পাদোদক একটা শিশিতে পূর্ণ করিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বঙ্কিমচন্দ্র পাদোদকপূর্ণ সেই শিশি দুইটি সম্বল করিয়া বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—ভ্রাতৃরূপে

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার তিন সহোদর ভ্রাতা ডিপুটী কলেক্টার ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র (Departmental) পরীক্ষার অকৃতকার্য্য হওয়ায় স্পেশল সব্‌রেজিষ্ট্রার-পদে অবনীত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র সব্‌রেজিষ্ট্রারের পদ হইতে—বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্যে—ডিপুটী কলেক্টারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ আট টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে দুই বৎসরের মধ্যে ডিপুটী কলেক্টার হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতার মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। তবে মধ্য বয়সে সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত ও শেষ বয়সে শ্যামাচরণের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

সঞ্জীবচন্দ্র একজন যশস্বী লেখক ছিলেন। তাঁহার Bengal Ryots, জাল প্রতাপচাঁদ, কণ্ঠমালা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তাঁহার খ্যাতি আজও বিস্তার করিতেছে। পাণ্ডিত্যে তাঁহার খ্যাতি থাকিলেও চাকুরিতে তিনি যশঃ অর্জন করিতে পারেন নাই। তেজ অন্তরায় হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে 'ডিষ্ট্রীক্ট টাউন্স এক্ট' পাস হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন; সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—"রাস্তায় নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায়

দিতে হইবে; সকল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজসাহেব বলিলেন, "আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাঙ্গালা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না Daughter-in-law's Lane বলিতে হইবে।" জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছেন না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, "৭৫ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি, আরও ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।" জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন?" সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। মনে করুন কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উঁহাকে Black footed Friend বলিয়া তর্জ্জমা করিতে হইবে।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজসাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। জজসাহেব টুপী লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ী গিয়া উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।" সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজসাহেব সেক্রেটারী হইয়া গেলেন, সঞ্জীববাবু তিন চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

সর্ব্বকনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—পিতৃরূপে

বঙ্কিমচন্দ্রের তিন কন্যা। পুত্র হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারীর মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা শরৎকুমারী। দ্বিতীয় কন্যা নীলাব্জকুমারীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। এই জ্যেষ্ঠা কন্যা বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা স্নেহ করিতেন, এ সংসারে বুঝি তিনি কাহাকেও এতটা স্নেহ করিতেন না। দুইটি দিনের কথা তুলিয়া তাঁহার অপরিসীম স্নেহ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুই জন পাচক ছিল; কিন্তু তাহারা প্রভুর আহার্য্য থালীতে সাজাইয়া আনিয়া দিত না। সে ভার কন্যা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ-সেবায় তৃপ্তি, পিতার সে সেবা গ্রহণে তৃপ্তি। এক দিন রাত্রিতে কন্যা আহার্য্য আনিয়া

যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতাকে ডাকিলেন, "বাবা, খাবার দিয়েছি—এস।" পিতা উত্তর দিলেন না। তিনি ঘরের ভিতর মুদ্রিতনয়নে চেয়ারে উপবিষ্ট, কন্যা বারাণ্ডায় থালার কাছে দণ্ডায়মান। পিতার উত্তর না পাইয়া কন্যা আবার ডাকিলেন, "বাবা, এস।" পিতা নিরুত্তর, কন্যা পুনরায় ডাকিলেন। অবশেষে খুড়ী-মা উঠিয়া চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমুলে নাকি?" বঙ্কিমচন্দ্র মৃদুকণ্ঠে তখন উত্তর করিলেন, "চুপ্ কর, শরৎ ডাক্‌ছে—আমায় শুনতে দাও।" একখানি উপন্যাস লিখিয়া যাহা বুঝান যায় না, একটি ক্ষুদ্র কথায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ব্যক্ত করিলেন।

আর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র নিশাকালে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার শয়ন-কক্ষে কেন্নো বিচরণ করিতেছে। কেন্নো ও কেঁচোকে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় ভয় করিতেন। কেন্নো দেখিয়া তিনি কিছুতেই আর সে ঘরে শয়ন করিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "আমি নীচে বৈঠকখানায় গিয়া শুইব।" খুড়ীমা কত বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি ঘরে আর প্রবেশ করিলেন না—বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে পূজনীয়া ভগিনী শরৎকুমারী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, ঘরে আর কেন্নো নেই; তুমি এস।" বঙ্কিমচন্দ্র তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া নিঃসঙ্কোচে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—বন্ধুরূপে

আত্মপরিবার ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ভালবাসিবার স্থল ছিল। তাঁহার চারিটী অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। একটীর নাম ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্র বাবু যখন হুগলীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সে সাক্ষাৎ হৃদয়স্পর্শী। উভয়ে কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা।

তাঁহার দ্বিতীয় বন্ধুরও নাম বোধ হয়, অনেকে অবগত নহেন। তিনি ভবানীপুর-নিবাসী জনৈক এটর্ণি—নাম, রাধামাধব বসু। ইঁহার সদ্‌গুণে বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের একাংশ এই রাধামাধব বাবুর সহিত এমনভাবে বিজড়িত যে, তাহার উল্লেখ করিলে কেহ কেহ মনঃপীড়া পাইতে পারেন। রাধামাধব বাবুর সঙ্গে যখন কোন রায়-বাহাদুরের বিবাদ বাধে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র রাধামাধব বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়া একটী প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করেন। এই শত্রু আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধামাধব বাবু নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে

কাঁদাইয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার শোক বঙ্কিমচন্দ্র কোন কালে ভুলিতে পারেন নাই।

তারপর আরও দুইটী বন্ধুর পরিচয় দিব। একটি দীনবন্ধু মিত্র, অপরটি জগদীশনাথ রায়। উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বড় হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সহোদর-তুল্য স্নেহ করিতেন। আজ কাল যে রকম বন্ধু দেখা যায়, সে রকম বন্ধু তাঁহারা ছিলেন না। আমরা স্বার্থ, আত্মাভিমান লইয়া ব্যস্ত। এই দুটীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা বন্ধুকে ভালবাসিতে পারি না। মুখে শতবার বলিব, তোমায় আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি; কিন্তু কাল যদি তোমার চাকরী যায়, তাহা হইলে আমি গম্ভীর বদনে তোমায় কত উপদেশ দিব, তিরস্কার করিব। পরশ্ব যদি খাইতে না পাও, তোমার নিকট হইতে আমি সরিয়া দাঁড়াইব। অথবা, তুমি যদি আমার আত্মাভিমানে আঘাত করিয়া আমায় ভালরূপ অভ্যর্থনা না কর, কিংবা আমায় মিথ্যাবাদী বা অন্য কোন দুর্ব্বাক্য বল, আমি তখনই তোমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার নামে Defamation Case চলিতে পারে কিনা জানিবার জন্য উকীলবাড়ী ছুটিব। আমি মনে মনে জানি, আমি একজন ঘোরতর মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমার বন্ধু কেন সে কথা আমায় বলিবে? তা'র right কি আছে? আমরা এইরূপেই আজ কাল বন্ধুত্ব করি। আমরা জানি না, আমরা বুঝি না—ভালবাসিয়া সংসারে কত সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন। যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিতেন—আপনার বলিয়া কিছু রাখিতেন না। আমি একটী গল্প বাল্যকালে জনৈক পুরাতন ভৃত্যের নিকট শুনিয়াছিলাম। সত্য কি মিথ্যা তা জানি না। কিন্তু ভৃত্যেরা মিথ্যারচনায় দক্ষ নয় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

একদা দীনবন্ধু বাবু আমাদের কাঁটালপাড়ার বাটীতে বেড়াইতে অথবা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আসিতেন। তবে একদিনের ঘটনা আমি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। সে দিন তিনি সন্ধ্যার পর একটু রাত্রি হইলে আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁহার কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। সে সময় জগদীশ বাবু, ঈশ্বর বাবু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দীনবন্ধু বাবুর বন্ধু। 'সধবার-একাদশী'-লেখককে দেখিয়া সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবুর প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না—বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনাও করিলেন না। দীনবন্ধু বাবু সেটা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটু অপরাধ হইয়াছে। তিনি কেন বিলম্বে আসিলেন? বঙ্কিম যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র! এরূপ অভ্যর্থনায় অপরাধ লওয়া দূরে থাকুক, মহাপ্রাণ দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্রে আরও অনুরক্ত হইলেন। কিন্তু সেটা—সে ভাবটা বাহিরে প্রকাশ করিলেন না।

অনন্তর দীনবন্ধু বাবু তথা হইতে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন ; এবং ভৃত্যের নিকট কিছু আহার্য্য চাহিয়া লইয়া জলযোগ করিলেন। তৎপরে আবার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেখানে বসিয়া দীনবন্ধু বাবু এমনি হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, গৃহপ্রাচীর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। দীনবন্ধু বাবুর স্বরূপ সকলে অবগত নহেন ; বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত মহাত্মার জীবনী লিখিবার সময় কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যখন সভাস্থলে বসিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিলেন, তখন কে না হাসিয়া থাকিতে পারে ? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না—অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রহিলেন। দীনবন্ধু বাবু যখন দেখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উদর ও পঞ্জর হাস্য-তরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছে, কিন্তু ওষ্ঠে হাস্যরেখা নাই, তখন তিনি উঠিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং কতকগুলা পাতা লতা ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া, বৈঠকখানাসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এইটি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিবার ঘর। এই ঘরে বসিয়া তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন ; এবং পাতা লতার রাশি কাটিয়া একটা বড কাগজে আটা দিয়া বসাইতে লাগিলেন। ক্রমে একটা মনুষ্যাবয়ব সৃষ্ট হইল। মূর্ত্তির উদরটা কিছু বড় রকমের এবং ঠোঁট দু'খানা কিছু কুঞ্চিত। দীনবন্ধু বাবু, কাগজখানি ও আটার শিশি লইয়া বৈঠকখানা ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, ও প্রাচীর গাত্রে সেই বিচিত্র চিত্রখানা আঁটিয়া দিলেন। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ;—দীনবন্ধু বাবু ছবির নীচে দুই ছত্র কি লিখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কবিতা। ছবি দেখিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হাসিলেন না ; তিনি বুঝিলেন, এখানি তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি। তিনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার কবিতা দুই ছত্র পড়িয়া লইলেন। পরে চুপি চুপি উঠিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন ; এবং ক্ষিপ্রহস্তে একখণ্ড কাগজে দুই ছত্র কি লিখিলেন। তখন সকলে দীনবন্ধু বাবুর দুই ছত্র কবিতা পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবসরে তাঁহার লিখিত কাগজখানি আটা সাহায্যে দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে আটিয়া দিলেন। তখন সকলে ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া দীনবন্ধু বাবুর পৃষ্ঠদেশে সমবেত হইলেন, এবং হাস্য-রোলের মধ্যে কাগজখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু বাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া পিছন ফিরিয়া সকলকে কাগজখানি পড়াইতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, "আমায় বলে দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ, তাই তা'র পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বসছে সে দেখ্‌তে পায় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌তে পায় না বলিয়াই ত আমরা তাকে হস্তিমূর্খ বলি।"

দীনবন্ধু বাবু তখন আসরে বসিলেন, এবং বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া বিপক্ষকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষও বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন। উভয়ের মধ্যে সে রজনীতে যে শেল শূল ভল্ল বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা কেহ লিখিয়া রাখিতে পারিলে আজ এক

অমূল্য রত্ন পাইতাম। কিন্তু ভৃত্য আর কিছু বলিতে পারিল না। হায়, সে কেন পণ্ডিত হইল না '—সে কেন সেই অমূল্য দুই চারি ছত্র কবিতা লিখিয়া রাখিল না।

আমি দীনবন্ধু বাবুকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আমার শৈশবে তিনি লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশ বাবুকে দেখিয়াছি, তবে তাঁহার মুখাবয়ব আমি এক্ষণে কিছুমাত্র স্মরণ করিয়া উঠিতে পারি না। জগদীশ বাবুর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ হয় তমলুকে। সে কথা গোড়া হইতে বলিতেছি।

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় নাগোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট্। এখন আর নাগোয়া মহকুমা নাই—কাঁথিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নাগোয়ার হাকিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তখন তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে বিশ ক্রোশ ব্যবধান। পাল্কীতে বা পদব্রজে এ পথ পনর ঘন্টায় সচরাচর লোকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদা অতি প্রত্যুষে শিবিকারোহণে তমলুক-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তমলুকে আসিতে হইলে একটা নদী পার হইতে হয়। নদীর নাম হল্‌দি। ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি, ইহাকে ক্ষুদ্র নদী বলিতে সাহস হয় না,—বিশেষ আজিকার এই প্লাবনের দিনে। তবে ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি, কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার চেয়ে হল্‌দি অনেক ছোট। যে ঘাটে খেয়া নৌকায় হল্‌দি পার হইতে হয়, সে ঘাটের নাম নরঘাট, অথবা নরের ঘাট। গ্রামের নামও তাই। কেন এমন নাম হইল, তাহার কোনও ইতিহাস দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নরঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। তীরে খেয়া নৌকাখানি বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত রাগিয়া অস্থির। মাঝির অনুসন্ধানে চাপরাশী ছুটিল। ঘাটের উপরে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল, তাহাতেই মাঝি ঝড় বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইত। সে ঘরে মাঝি নাই। তখন মাঝির বাড়ী কোথায়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পাল্কী দেখিয়া গ্রামের দুই চারি জন নিষ্কর্ম্মা লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অনেক পীড়াপীড়ির পর মাঝির বাড়ী দেখাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। চাপরাশী মহাবেগে তাহার সহিত ধাবিত হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; মাঝপথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ। মাঝির পরিচয় পাইয়াই চাপরাশী তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং যাহাতে শিক্ষাটা সহজে অঙ্গ হইতে মুছিয়া না যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিল। মাঝি কাঁপিতে কাঁপিতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। হাকিম দুই চারি ধমক দেওয়াতে মাঝি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বস্তিতে জবাব দিয়েছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত। তাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি মাঝিকে

সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই একজন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুই একটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা এতটা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল কেন, ঠিক বলিতে পারি না। ইংরাজিতে যাহাকে revulsion of feelings বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা প্রায়ই হইত। তবে ক্রোধের মাত্রা যদি ধৈবত নিখাদে উঠিত, সেটা সহসা নামিয়া সহজ স্বর বা রেখাবে মুহূর্ত্তকালমধ্যে নামিত না। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অনুতাপ হইয়া থাকিবে। অনুতাপের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে এক এক জন এমন কোমল হৃদয় আছেন যে, তাঁহারা অপরাধ না করিয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে একটা গর্ব্ব, একটা ক্রোধের আবরণ ছিল; কিন্তু ভিতরটা বড় প্রেমময়। যে তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, সে তাঁহাকে ক্রোধী, গর্ব্বিত মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে পঁহুছিলেন, তখন অপরাহ্ন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও দুই চারি জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অপরিচিত। তন্মধ্যে একজনকে দেখাইয়া পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটি কে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ভদ্রলোকটির পানে একবার একটু তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তারপর উত্তর করিলেন, "বাবু জগদীশনাথ রায়।"

সত্যই ইনি জগদীশনাথ রায়। ইনি তখন তমলুকে সণ্ট বা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। জগদীশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে একটু চমৎকৃত হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন, এবং আজীবন তাহা হস্তমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র—কর্ম্মচারীরূপে

বঙ্কিমচন্দ্র গভর্মেণ্টের চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে অসাধারণ তেজস্বিতা, স্বাধীন-চিত্ততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অনেক দেওয়া হইয়াছে। এই তেজ গর্ব্ব থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কখন উপরিতন কর্ম্মচারীর অবাধ্য হয়েন নাই।

সরকার বাহাদুর যেখানে যখন তাঁহাকে বদলী করিয়াছেন, সেখানে তখন তিনি অম্লানবদনে গিয়াছেন ; কখন অনুযোগ করেন নাই—তোষামোদ করিয়া বদলী রহিত করিতেও কখন চেষ্টা পান নাই। উপরিতন সাহেব যখন যে আদেশ করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সহস্র অসুবিধা সত্বেও তখনই সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। পৃথিবীর সাম্রাজ্য ধরিয়া দিলেও বোধ হয় তাঁহাকে কেহ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। দুইবার বিপুল প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তকের জন্যও টলেন নাই। একবার যখন তিনি খুলনায়, দ্বিতীয়বার যখন তিনি আলিপুরে। সে সব কথা তুলিবার এক্ষণে প্রযোজন নাই। একটী ছোট গল্প বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম রাখালচন্দ্র। রাখাল কাকা জিরেট বলাগড়ে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তথায় একব্যক্তি তাঁহার কুটুম্ব ছিলেন। কুটুম্বের নাম—দ্বারিকাদাস চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাঁটাল-পাড়ায় আসিতেন। সেই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীতে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি নৌকা করিয়া হুগলীতে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। দ্বারিকাদাস একদা আসিয়া বলিলেন, "বঙ্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় আমি হুগলী যাইব।" বঙ্কিমচন্দ্র সাহ্লাদে বলিলেন, "বেশ।" উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। তাঁহারা দুই জন ছাড়া নৌকায় আর কোনও ভদ্র আরোহী নাই। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন দ্বারিকাদাস একটি মোকর্দ্দমার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। মোকর্দ্দমাটি—ফৌজদারী ; ঘটনাস্থল—জিরেট , তাঁহার কোনও বন্ধু বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় লিপ্ত। গল্পটি শেষ করিয়া দ্বারিকাদাস বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, আপনার হাতে মোকর্দ্দমা—আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়াও।" নিকটে চর ছিল, মাঝিরা অবিলম্বে নৌকা লাগাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "লোকটাকে নৌকা হতে ফেলে দে।" দ্বারিকাদাস নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কিরূপে তিনি গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। কাঁটালপাড়ায় তিনি আর দর্শন দেন নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

আর একবারের একটী গল্প শুনিয়াছি। সেটা বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র তখন আলিপুরে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার কোর্টে একটা মোকর্দ্দমা চলিতেছে। একটা সাক্ষীর জাতি সম্বন্ধে বিপক্ষ পক্ষ তর্ক তুলিয়াছেন। সাক্ষী বলিতেছে, সে ব্রাহ্মণ। এখন ব্রাহ্মণ না বলিলে মোকর্দ্দমা টিকে না। বিপক্ষ পক্ষ বলিতেছেন, সাক্ষী কোন মতেই ব্রাহ্মণ নয়। কিন্তু কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পৈতা মাজিতে জান?"

সাক্ষী। জানি।

হাকিম। কেমন ক'রে মাজিতে হয় দেখাও দেখি।

সাক্ষী জোর গায়ত্রীটা পর্য্যন্ত শিখিয়া আসিয়াছিল, পৈতা মাজিতে কিরূপে হয়, তাহা কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। সুতরাং তাহার জাতিনির্ণয় সহজেই হইয়া গেল।

ক্রীড়ক বঙ্কিমচন্দ্র

আমার বাল্যকালে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রমারা খেলায় নিরত থাকিতে দেখিয়াছি। চারি ভাই একত্র বসিয়া খেলিতেন। বাহিরের লোক বড় একটা সে খেলায় যোগ দিত না। বিশেষ যে দিন টাকা পয়সা লইয়া খেলিতেন, সে দিন মাথা কুটিলেও বাহিরের লোক খেলিবার 'কাত্' পাইত না। হারিলে টাকা ভাইয়ের থাকিবে। সুতরাং হারিলে বিশেষ কোন দুঃখ নাই। তাঁহারা বাহিরের লোককে টাকা লুঠিয়া লইয়া যাইতে দিতেন না—বাহিরের লোকের টাকা লুঠিতে ইচ্ছাও করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের খেলার একটু বিশেষত্ব দেখিয়াছিলাম। তিনি প্রমারায় গিয়া তাস না সরিলে লম্বা ডাক ছাড়িতেন, আবার তেরেশ কাতুর বড় বড় দান হাতে করিয়া নীরব থাকিতেন। বুড়া বয়সে তাঁহাকে পাশা খেলিতে দেখিয়াছি; কিন্তু 'চৌষট' নয়—'রং'। একদিনের কথা উল্লেখ করিব। জামাতা শ্রীযুক্ত কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত একদিন তিনি 'রং' খেলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘুঁটি মরিয়া গিয়াছে, পোয়া না পড়িলে সে ঘুঁটি আর বসিবে না, অন্যান্য ঘুঁটির চালও বন্ধ থাকিবে। এ পোয়া কিছুতেই পড়িতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। এ সংসারে যে জিনিষটার জন্য আমরা যত ব্যগ্র হই, অধীর হই, সে জিনিষটা তত দূরে সরিয়া যায়। ক্রমে অধীরতার মাত্রা অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাশা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া খেলা ভঙ্গ করিলেন। এ অধীরতা তাঁহার যৌবনে প্রমারা খেলিবার সময় দেখি নাই।

ক্রোধী বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় ক্রোধী ছিলেন। একবার তিনি বায়ুপরিবর্ত্তন-উদ্দেশে কিছুদিনের জন্য চন্দননগরে বাস করেন। বাড়ীটি অতি সুন্দর—দ্বিতল—গঙ্গার উপর। তিনি কিছুদিন তথায় একাকী থাকিয়া আমায় পত্র লিখেন, "তোমার

খুড়ীকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে।" আমি খুড়িমা ও দিব্যেন্দু ও পুরেন্দুকে লইয়া একদিন প্রাতঃকালে চন্দননগরে আসিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র প্রীত হইলেন; তাঁহার মন প্রফুল্ল—নয়ন স্নেহোৎফুল্ল, ওষ্ঠ হাস্যবিকম্পিত। আমায় বলিলেন, "তোমার খুড়িকে বাগান দেখাইয়া লইয়া এস—আমি স্নান করিয়া লই।"

স্নানাগার দ্বিতলে।

আমি খুড়িমাকে লইয়া বাগানে বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। বিস্তৃত উদ্যান। আমরা যখন ফিরিয়া বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তখন সহসা এক চীৎকারশব্দ আমরা শুনিতে পাইলাম। চীৎকারের উপর চীৎকার; আমি ভীত, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। খুড়িমাও দাঁড়াইলেন। আমরা উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চিনিলাম; উভয়েই বুঝিলাম, তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে। আমি বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলাম। কাঁপিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থাতেও মানুষ বা কোন জীবকে প্রহার করিতেন না—নিরপরাধকে ভৎর্সনা করিতেন না। তবু আমি তাঁহাকে অত্যধিক ভয় করিতাম। শুধু আমি নই, বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। সেই পুরুষসিংহের সম্মুখে দাঁড়াইতে সকলেরই পা কাঁপিত। আমায় কখনও তিনি রূঢ় বাক্য বলেন নাই, অথচ আমি তাঁহাকে যতটা ভয় করিতাম, পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ততটা ভয় করিতাম না। তাঁহার ললাটে যখন মেঘ দেখা দিত, তখন তাঁহার বন্ধুরাও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিন্তু শারদীয় মেঘ, দুই চারিবার গর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছে জানিয়া আমরা আর উপরে গেলাম না। খুড়িমা সিঁড়িতে গিয়া দাঁড়াইলেন ও ক্রমে উপরে উঠিলেন। ভৃত্যমহলে চুপি চুপি কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাগের কারণ কেহ আমাকে বলিতে পারিল না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ভৃত্য উপর হইতে নামিয়া আসিল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ঝড়ের বেগটা তা'র উপর দিয়া গিয়াছে। তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

ক্ষণপরে একজন দাসী আসিয়া উপরে অন্নাদি লইয়া যাইবার আদেশ জ্ঞাপন করিল। অন্নাদি উপরে গেল—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও গেলাম। দেখিলাম, ঝড় বৃষ্টি কাটিয়া গিয়াছে—দিগ্‌দিগন্ত প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। খুড়িমার মুখে হাসি—কাকার মুখে হাসি; আমি তখন পায়ে বল করিয়া দাঁড়াইলাম।

আহারান্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধের কারণ অবগত হইলাম। ভৃত্য স্নান করাইতেছিল; জলের কলসী কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। যে কলসীতে অত্যধিক উষ্ণ জল ছিল, সেই কলসীর জলটা ভৃত্য অনবধান প্রযুক্ত প্রভুর মাথায় ঢালিয়াছিল। উষ্ণ জল শিরোদেশে পড়িবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এবং পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘটী কলসী

আছড়াইয়া ফেলিলেন। ভৃত্য প্রহৃত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রহৃত হইলে সে বোধ হয় অধিকতর দুঃখিত হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্রোধ ক্ষণেকের জন্য। ক্ষণেকের জন্য মহাগর্জ্জন সহকারে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া বিজলীবৎ স্থাবর জঙ্গম ঝলসিয়া দিয়া তখনই আবার নিবিয়া যাইত। কিন্তু প্রথম মুহূর্ত্ত ভয়ানক; তখন তাঁহার শিক্ষা, আত্মসংযম সব ভাসিয়া যাইত,—তিনি জ্ঞানশূন্য হইতেন।

শুনিযাছি, প্রথম জীবনে নাকি ক্রোধটা এত প্রবল ছিল না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মালদহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোন এক অনৈসর্গিক কারণে তাঁহার মাথা গরম হইয়া যায়। সেই অবধি ক্রোধটা নাকি বড প্রবল হইয়া উঠে।

সামাজিক বঙ্কিমচন্দ্র

কাঁটালপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী গরিফা-নিবাসী কোন ভদ্র-সন্তান বিদ্যাভ্যাস করিতে সমুদ্রপারে গমন করিযাছিলেন। তিনি ফিরিযা আসিয়া দেখিলেন, সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বার রুদ্ধ করিযাছে। তৎকালে আমার পিতা ও খুল্লতাত সঞ্জীবচন্দ্র সমাজের নেতা। ভদ্রসন্তান আমার পিতার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। আশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হইযা পিতা বলিলেন, "আমি যদৃচ্ছা সমাজের উপর অত্যাচার করিতে পারি না; তুমি তোমার জাতির কাছে যাও। যদি তোমার স্বজাতি তোমায় গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু জাতি বা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাগত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা উপায় স্থির করিলেন। ভদ্রসন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একটা রবিবারে আমায় নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া খাইয়া আসিব।"

ভদ্রসন্তান কৃতার্থ হইলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ-মত কার্য্য করিতে তৎপর হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রবিবার দিবস বেলা নয়টার সময় শিয়ালদহে ট্রেনে উঠিলেন এবং দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈহাটীতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কাঁটালপাড়ার কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, অথবা তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিল না।

কথিত ভদ্রলোকের গৃহে অন্নাহার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অপরাহ্ণে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটা কথার পর

সহাস্যে বলিলেন, "দাদা, একটা কাজ করেছি।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের স্বর আরও চড়াইয়া বলিলেন, "রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

পিতা স্তম্ভিত হইলেন। রায় মহাশয় অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সময় বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন পিতা আর কি বলিবেন? ভদ্রসন্তান অচিরে সমাজে স্থান পাইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দল কিছু না লইয়া ছাড়েন নাই। কবেই বা ছাড়েন? অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে—আগমন বা নির্গমনে তাঁহাদের সমান আনন্দ। তবে শ্রাদ্ধে কিছু বেশী, কেন না তখন বিদায় দিয়া 'বিদায়' গ্রহণ করেন।

ভদ্রসন্তান সমাজে স্থান পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন। এবং বিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে সংসারে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি সাপ্তাহিক, * তাঁহার তারকেশ্বর রেলপথ আজও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

বিবিধ

কর্ত্তব্যজ্ঞান

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন কোন পত্রিকা-সম্পাদক ভিক্ষার্থে কলিকাতা হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদা কি জন্য, তাহা আমি জানি না। সম্পাদক মহাশয় চাঁদা সংগ্রহে বড় একটা কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী তদ্দণ্ডে চারি শত টাকা প্রদান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় চারি শত টাকা লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ধারণা জন্মিল যে, এই টাকা উচিত কার্য্যে ব্যয়িত হয় নাই। তিনি বড় ক্ষুব্ধ হইলেন; কেন না, তাঁহারই চেষ্টায় এ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি এই চারি শত টাকা দাতাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক উদ্গীরণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন উভয়ের মধ্যে কড়া কড়া কথা চলিতে লাগিল। অবশেষে উভয়ের মধ্যে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। **

সম্পাদক মহাশয় তখন বেশ এক হাত লইলেন। তাঁহার হাতে কাগজ ছিল।

* কাগজের নাম Hope.

** বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে সঙ্কলিত।

তিনি সেই পত্রিকা-স্তম্ভে খুব জোর কলমে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। কাগজখানি সে সময় বাঙ্গালায় লিখিত হইত। বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গালি খাইলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। শুধু 'রজনী'তে হীরালালকে আনিয়া সম্পাদক-চরিত্র অঙ্কিত করিলেন।

বক্তৃতা-শক্তি

বঙ্কিমচন্দ্র সুবক্তা ছিলেন না। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা তাঁহার এককালে ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার এ অভাব—এ শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই বড় একটা সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন না। তিনি সময়ে সময়ে আমাদের সহিত অসংলগ্ন ভাবে বাক্যালাপ করিতেন। আমাদের মনে হইত, তিনি যেন একটা কথা কহিতেছেন, আর একটা কথা ভাবিতেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার ভাবার্থ সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনেকেরই সম্ভবতঃ স্মরণ আছে যে, বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে গভর্মেণ্ট একবার মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গবাসী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। জানি না কি কারণে, গভর্মেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করা হয়। সাক্ষ্য দিতে হইবে শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন, এবং টিটাগড়ে গিয়া জজ নরিস্‌কে ধরিলেন। নরিস্ সাহেব দুর্দ্দান্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। বুঝি এতটা তিনি অন্য কোন বাঙ্গালীকে করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শুনিয়া নরিস্ সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাক্ষ্য দিতে তুমি ভয় পাইতেছ কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আমি হাইকোর্টে কখন সাক্ষ্য দিই নাই—জেরা আমার সহ্য হয় না—আমার ক্রোধ সহজে উদ্দীপ্ত হয়—আমায় নিষ্কৃতি দান করুন।"

নরিস্ সাহেব বলিলেন, "বঙ্কিম বাবু, তুমি স্থির জানিবে, আমি তোমায নিষ্কৃতি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

সাহেব নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদ তখনও অবগত ছিলেন না। সংবাদটা আনিবার জন্য আমায় সবিশেষ উপদেশ দেন। উপদেশ দিবার সময় তিনি কিরূপ অসংলগ্ন ভাবে আমার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একবার বলিলেন, "যোগীন বোসকে বল, নরিস্ সাহেবকে ডেকে দিতে।" পরক্ষণে হয়ত বুঝিলেন, কথাটা আমায় গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। সংশোধন করিয়া বলিলেন, "নরিস্ সাহেবকে বলগে যোগীন বোসকে

ছেড়ে দিতে।" তিনবার এইরূপ অসংলগ্ন ভাবে বলিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আমায় কথাটা গুছাইয়া বলিলেন। এইরূপ অনেক বার তাঁহাকে অসম্বন্ধ ভাবে কথা কহিতে দেখিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বড একটা তাঁহার প্রতিভার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যখন তর্কের আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাঁহার ভিন্ন রূপ। তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইত—হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সময় সময় ঈষৎ কম্পিত হইত—একটা প্রতিভার ছটা সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইত। তখন আর নয়নের চাঞ্চল্য নাই—বাক্যাবলীর অসম্বদ্ধতা নাই—মনের অস্থিরতা নাই। তখন মনে হইত, একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সহসা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বর্গীয় দামোদর বাবুর সহিত এরূপ তর্ক-যুদ্ধে রত হইতে তিন চারি দিন দেখিয়াছি। একদিনকাব কথা আমার বেশ স্মরণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সানকিভাঙ্গাব বাটীতে। রাত্রি নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া যায়। সমাপ্ত হইয়াছিল কি না জানি না; আমি তখন তাঁহাদের পদতলে নিদ্রিত। য়ুরোপের সাহিত্যরাশি মন্থন করিয়া সে দিন যে তর্ক-যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? হুগো, ব্যালজ্যাক্, গেতে, দন্তে, চসার প্রভৃতির নাম হইলে আজও আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও থিয়েটার

থিয়েটারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন অনুরাগ ছিল। তাঁহার প্রথম বয়সে কলিকাতায় ও নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থিয়েটার ছিল না। ইংরাজদের একটা থিয়েটার ছিল, তাহার নাম Sans-Soci—সে আজ প্রায় নব্বই বৎসরের কথা। বড় বড় ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট, অধ্যাপক, সম্পাদক প্রভৃতি সেই থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন একজন বিচক্ষণ অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি ছাত্র সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নাটকাভিনয়ের বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুধু ছাত্রদের হৃদয়ে কেন, বাঙ্গালার তাবৎ শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ে নাটক অভিনয় করিবার বাসনা জাগিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে সময় অভিনয়োপযোগী একখানি নাটকও বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। কলিকাতা বাগ্‌বাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু বিপুল অর্থব্যয়ে তাঁহার গৃহে একবার নাটকাভিনয় করাইলেন। কিন্তু নাটকখানি বিদ্যাসুন্দর; অতএব তাহার আর পুনরভিনয় হইল না। অবশেষে নাটকের অভাবে বাঙ্গালীদের ইংরাজি নাটক অভিনয় করিতে হইল।

এতই আমাদের দুর্ভাগ্য যে, উইল্‌সন্‌ সাহেব উত্তররামচরিত ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিলেন, তবে আমরা তাহা অভিনয় করিলাম। ভেজাল টিকিল না,—শিক্ষিত সমাজ দেশীয় নাটকের অভিনয়-আশা বিসর্জ্জন দিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে এক ইংরাজি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেক্ষপিয়রের নাটকাদি তথায় অভিনীত হইতে লাগিল। যাঁহারা দেশের জন্য চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে একতম মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকখানি উক্ত থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় করাইলেন। কিন্তু সে উদ্যম সফল হয় নাই। একদিকে সেক্ষপিয়রের মার্চেণ্ট অফ ভিনিস্‌, অপর দিকে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব। সুতরাং বঙ্গসমাজ দেশীয় নাটক ছাড়িয়া ইংরাজি নাটকের দিকে ঝুঁকিলেন। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে জুলিয়স্‌ সিজর্‌, হ্যামলেট্‌ অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু বিদেশী জিনিষ বেশী দিন বাঙ্গালীর ভাল লাগিল না। আশুতোষ দেবের বাটীতে 'শকুন্তলা' অভিনীত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে 'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্ব্বশী' অভিনীত হইল। কিন্তু তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হইল না; কেন না সেগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ মাত্র। অবশেষে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ উদ্‌যোগী হইয়া একখানি নাটক প্রণয়ন করাইলেন। প্রণয়ন করিলেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন। শ্রীহর্ষ দেবের 'রত্নাবলী' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। বিপুল অর্থব্যয়ে বেলগাছিয়ার উদ্যানবাটীতে নাটকখানি অভিনীত হইল। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে ইংরাজী রীতির অনুকরণে একতান বাদন সম্প্রদায় গঠিত হইল। লাট, বেলাট, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, রাজা, মহারাজ প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেকেই থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনুষ্ঠান, এরূপ বিপুল আয়োজন, নাটকাভিনয়ের জন্য বাঙ্গালা দেশে কখন হয় নাই।

এই অভিনয়ানুরাগ সুধু কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজ মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ার মণ্ডলবাবুদের গৃহে একবার অভিনয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যোগদান করেন নাই, সুধু দর্শক ছিলেন। তারপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বেলগাছিয়ার উদ্যান-বাটীতে যখন অভিনয় হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র দর্শক মাত্র ছিলেন। অভিনয় হয় জুলাই মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন আগষ্ট মাসে।

নাটকাভিনয়ে যোগদান না করিলেও অভিনয়ানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন ছিল। চুঁচুড়ায় একবার "লীলাবতী" অভিনীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় বহরমপুরে। ইচ্ছা সত্বেও অভিনয়ের দিন চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুদূর বহরমপুরে বসিয়া তিনি ও অক্ষয় বাবু নাটকখানি কাটিয়া ছাটিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায় কয়েকবার কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে অভিনয়

করিয়াছিলেন। থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ চিরদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান করিতেন, কখন অর্থের দাবী করিতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র অর্থ প্রদান করিলেও গ্রহণ করিতেন না।

বেঙ্গল থিয়েটার সম্প্রদায়ের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এতাদৃশ আধিপত্য দেখিয়া একবার তাঁহার একটী প্রিয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে একটী অন্যায় অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বন্ধুটী আজও জীবিত আছেন, এবং নাম, যশঃ ও উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা যে, থিয়েটার সম্প্রদায় পয়সা না লইয়া তাঁহার গৃহে কোন ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে অভিনয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুরোধ করিলে সম্প্রদায় অর্থ গ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরেন, কিন্তু তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে পারেন নাই; প্রস্তাবটি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আর বাক্যালাপ করেন নাই।

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র একবার একটী অপেরা সম্প্রদায় সংগঠন করেন। তাহাতে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বড় একটা অপর কাহাকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রদায় গঠিত হইতে না হইতেই জলবুদ্বুদের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে মিলাইয়া গিয়াছিল।

প্রৌঢ় ও শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে 'বেঙ্গল' প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কিন্তু অভিনয়ের সামান্য ত্রুটি হইলেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। একবার 'মৃণালিনী' অভিনয়-কালে একটা গানের সুর তাঁহার মনোমত হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিয়াছিলেন। একদা আনন্দমঠের অভিনয় হইতেছিল; শান্তির অভিনয় তাঁহার ভাল লাগে নাই, তিনি বিরক্তিসহকারে রঙ্গ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর একবার 'দেবী চৌধুরাণী'র অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার পুস্তকখানা মাটী করিয়াছে।' ইদানীং থিয়েটারের উপর তিনি বড়ই চটিয়াছিলেন। একদা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট থিয়েটারের নানারূপ অখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, "থিয়েটারগুলা অধঃপাতে গিয়াছে।"

যাত্রা দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন না; কিন্তু যাত্রার গান শুনিতে তাঁহার বড় আগ্রহ ছিল। শিশুপালকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে আসরের মধ্যে বসিয়া কলিকা টানিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অথবা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হইতেছে, এমন সময় দ্রৌপদী যে বেহালার সঙ্গে সুর মিলাইয়া তড়াক্ তড়াক্ করিয়া নাচিতে থাকিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি আসরে বড় একটা বসিতেন না—দূরে বৈঠকখানায় বসিয়া গান শুনিতেন। একবার রথযাত্রার সময় তাঁহার একটী পশ্চিমপ্রদেশবাসী বন্ধু আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। সে দিন গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়। আসর সাজান হইতেছে দেখিয়া বন্ধুটি বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গলা দেশে আর কি গান শুনিব? এদেশের লোক গাহিতে জানে না।" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কীর্ত্তন শুনিয়াছেন কি?" তিনি

বলিলেন, "না, তবে ভজন শুনিয়াছি।" বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "তবে একটু অপেক্ষা করুন।"

তারপর যখন গোবিন্দ অধিকারী প্রেমার্দ্র কণ্ঠে গলদশ্রু-লোচনে শ্রীরাধার মান-ভঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গান ধরিলেন, 'প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং', তখন বন্ধুবর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "এমন সঙ্গীত আমি কখন শুনি নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। এ অনুরাগ তাঁহার পিতারও ছিল। রথযাত্রা-উপলক্ষে আট দিন যাত্রা হইত। আট দিনের মধ্যে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা চারি দিন, মতি রায়ের দুই দিন ও অপরাপরের জন্য বাকী দুই দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

তামাক ও চা

বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটী জিনিষেরই সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চা অত্যধিক উষ্ণ না হইলে পান করিতেন না। আবার চায়ের পরিমাণও বড় কম ছিল না,—প্রত্যেক বারে বড় বড় দুই বাটী! তামাকের ত কথাই নাই—মুহুর্ম্মুহু তাওয়া চলিত। তবে কাছারীতে যে কয় ঘন্টা থাকিতেন, সে কয় ঘন্টা এক কালে তামাক খাইতেন না। লিখিতে বসিলে—তা' প্রাতে হউক বা রাত্রে হউক,—তামাক অবিরাম চলিত।

বিষয়টি ক্ষুদ্র, আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র চা বা তামাক খাইতেন কি না, তাহা জানিবার জন্য লোকে ব্যাকুল নহে—জানিয়াও লোকের কোন উপকার নাই। উপকার না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বুঝিয়া দেখিবার বিষয়, কেন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকেরা একটা না একটা নেশায় আসক্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী কবিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া কয়েক জন বিদেশী কবির কথা বলিব।

মহাযশস্বী ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac সাতিশয় কফি-প্রিয় ছিলেন। কফি না খাইয়া তিনি লিখিতে পারিতেন না। নাট্যকার Donizatti বড় বেশী মাত্রায় কফি পান করিতেন। De Quincey আফিম ও চায়ের অনুরাগী ছিলেন; তিনি দিবারাত্র ঘন ঘন চা পান করিতেন। Maeterlink তামাকের ও De Maupasant ইথরের অনুরাগী ছিলেন। Carlyle ও Tennyson তামাক ও মদ উভয়ই খাইতেন, তবে মদের চেয়ে তামাকটা বেশী। Shakespeare ও Burns উভয়েই মদ খাইতেন। Coleridge আফিম-ভক্ত ছিলেন। Earnest Dowson মদ ছাড়া অন্যান্য অনেক নেশা করিতেন। Byron ঘোরতর মদ্যপ ছিলেন। Hall Baine, Mark Twain তামাকের বেশী উঠেন নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, Ruskin কোনরূপ নেশা করিতেন না; আরও কয়েক জন রস্কিনের মত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা

বড় কম। বাঙ্গালা দেশে কার্লাইল, টেনিসনের সংখ্যাই বেশী—রাস্কিনের সংখ্যা কম। বুঝিতে পারা যায় না, কেন মহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিযা দেহকে অনর্থক নিপীড়িত করেন। মাদক দ্রব্য কি লেখনীর সাহায্যকরী? কয়েকজন যশস্বী বাঙ্গালী লেখকের নাম অনায়াসে বলিতে পারা যায় যাঁহারা লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে মাদক দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এমনও দুই এক জন ছিলেন, যাঁহারা মাদকদ্রব্য সেবন না করিয়া লিখিতে পারিতেন না। কেন পারিতেন না, তাহা জানি না। বোধ হয় মাদকদ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয় না—একাগ্রতা, তন্ময়ত্ব আসে না। যাহা হউক্, এটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমার ভ্রাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্রের নিম্নলিখিত দুইটী গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনে একদিন তাঁহার কোন প্রিয় বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে পটলডাঙ্গার বাটীতে আসিয়াছিলেন। সাক্ষাৎটা বোধ হয় দীর্ঘকাল পরে ঘটিয়াছিল। বন্ধুবর আসিয়া "Good morning" করিলেন এবং shakehand করিবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে উদ্যত হস্ত গ্রহণ করিলেন না; বলিলেন, "ভাই, সে দিন আর নাই।" মিত্র মহাশয় বলিলেন, "No। it seems times have changed"—বঙ্কিমচন্দ্র ঈষদ্ধাস্যের সহিত কহিলেন, "তুমি কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ; তুমি প্রণাম করিবে, আমি আশীর্ব্বাদ করিব—আর shakehand কেন?"

দ্বিতীয় গল্পটী যৌবনের। জ্যোতিশ বাবু তখন পঠদ্দশায়। এক দিন শিক্ষক তাঁহাকে জ্যামিতি পড়াইতেছিলেন। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিক্ষকের গোল বাধিয়া গেল। সে পড়াইবে কি, নিজেই আত্মবিস্মৃত হইল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র চটিজুতা খুলিয়া শয্যার উপর বসিলেন, এবং পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য শেষ করিয়া অচিরে উঠিলেন। জুতা পরিতে গিয়া দেখেন, নিকটে একটা বোল্‌তা মাটির উপর বসিয়া রহিয়াছে। তিনি দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া ক্ষুদ্র বোল্‌তাটীকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। একবার আঘাত করেন, পর মুহূর্ত্তে পা উঠাইয়া দেখেন। যখন দেখিলেন, তাহার প্রাণ ত দূরের কথা—মেদমজ্জার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি তাহার মুখের বর্ণের উল্লেখ করিয়া কত কি বলিতে থাকেন। সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিতে আমার ইচ্ছা নাই—সাহসও নাই।

সমুদ্র-যাত্রা

সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কয়েকটী প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তদুত্তরে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব
আশীর্ব্বাদ ভাজনেষু।

আপনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

"প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ-সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালি-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত সত্য। সত্য বটে যে, লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

"উপরি-উক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু সকল বিষয়ই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটা বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গলার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি-ভাজা ব্রাহ্মণের পদসেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি-সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে এবং নীতিসম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।

"আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার

পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র-যাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না ; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যত দিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র-যাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্র-যাত্রার পক্ষে বাঙ্গালি-সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপে যাইতেছেন। সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালি-সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্ রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজ-সম্মত ব্যবহার করিলে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

"পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্র-যাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে ;—

ধারণাধর্ম্ম নিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

"ধর্ম্মলোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

"যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্র-যাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

"আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে ;—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির

হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র-যাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র-যাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।

কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৮৯২ — আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

সম্প্রতি কালীঘাটে ব্রাহ্মণ-সমাজের এক মহা বৈঠক বসিয়াছিল। এই সভায় সমুদ্র-যাত্রা লইয়া অনেক বাক্ বিতণ্ডা হইয়াছিল। সভার মত, সমুদ্র যাত্রা হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত নহে। সভা ইচ্ছামত মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু কয়জন তাহা মানিযা চলিবে? শিক্ষিত সমাজ সমুদ্র-যাত্রার পক্ষপাতী। ব্রাহ্মণ-সমাজ এই স্রোতের বিরুদ্ধে বুক দিয়া দাঁড়াইলে নিজেই ভাসিয়া যাইবেন, স্রোতের গতি ফিরাইতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উপরি-উক্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ সমাজের অভিপ্রায়াদি লইয়া চারিদিকে এত আন্দোলন চলিযাছে যে, এতদ্‌বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

অবরোধ-প্রথা

অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে কিছু বলিয়া গিয়াছেন। আমি তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম :—

"স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশ বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

"এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার

কারণ অমর্য্যাদার ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া আমি লজ্জায় মরি।

"জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদি মধ্যে গণ্য হইবার জন্য দেহ ধারণ করিযাছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?" * * *

যে জাতির পুরুষেরা আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, সে জাতি সত্যই কি স্ত্রী-কন্যার হাত ধরিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইতে পারে? বাঙ্গালা যখন স্বাধীন ছিল, তখন বাঙ্গালায় অবরোধ-প্রথা ছিল না। যে দিন মুসলমান বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল, সে দিন বাধ্য হইয়া হিন্দুললনারা গৃহমধ্যে লুকাইল। সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে কারণ বর্ত্তমান ছিল, আজ কি সে কারণ অন্তর্হিত হইযাছে? কারণ অন্তর্হিত হউক্ বা না হউক্, হিন্দুললনা পর্দার অন্তরালে লুকাইয়া থাকিতে আর চায় না।

সাম্য

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে 'সাম্য' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি তা'র পর একবার মাত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া যে অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আমার মনে হয় না। প্রবন্ধের ভাষা, ভাব, লিপিচাতুর্য্য অতি সুন্দর। আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ প্রবন্ধে সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। আমি কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সংসার বৈষম্যে পরিপূর্ণ। রাম এ দেশে না জন্মিয়া ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া জাদীর গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু, বা আমার শক্তি অধিক, বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ।

"রাম বড় লোক, যদু ছোটলোক কিসে? যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া, ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাঁহার প্রপিতামহ চৌর্য্য-বঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন; মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয়

করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্প বৃষ্টি কর।

"বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতে সকল পদার্থেই বৈষম্য। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ, শূদ্র-বধে লঘু পাপ, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য, শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্ত্তে যাহার দিবার শক্তি আছে সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

"সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই এক জন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে রোগগ্রস্ত হইতেছে।

"আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সে দিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক ইষ্ট সাধন করিতে হইল, এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্যসংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস্ বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

"কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপদায়িনী। খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বাক্যে প্রচারিত হয়—ইস্‌লামের ধর্ম্ম, শস্ত্র-সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খৃষ্টানই অধিক।

"পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, মনুষ্য সকলেই সমান। এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর।' তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।

"প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিক ধর্ম্ম সঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীড়িত, তখন ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণ-বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করুক, তুমি ব্রাহ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের

চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কর—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য, শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। **

"এই গুরুতর বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণ-বৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে, একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। * *

"লোক বিষণ্ণ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতর বর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্ম্মশাস্ত্র-পীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ব্বসুখ নিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্ত-প্রধাবিত রবে বলিলেন, 'আমি এ উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবেই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা, যাগ-যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্য ধর্ম্ম পালন কর।' * *

"দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখৃষ্ট। * * তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়।" * *

তার পর যে স্বার্থত্যাগী নিষ্কাম মহাবীরের গুরুতর আঘাতে ফরাসী রাজা ও রাজ্যশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাপুরুষ রুসোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুসোর সাম্যনীতির আমি আর কোনও উল্লেখ করিলাম না। যাঁহার Le Contract Social গ্রন্থ পড়িয়া ফরাসীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া রাজাকে মারিতে খড়্গ উঠাইয়াছিল, তাঁহার গ্রন্থোল্লিখিত সাম্য-নীতির কোনও পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না।

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা সকল বিষয়ে কি সাম্যনীতি অবলম্বিত হইতে পারে? ঈশ্বরেরও কি তাহাই অভিপ্রেত? আমার বিবেচনায় নয়। বিপর্য্যয় না ঘটিলে অবতার হইতে পারে না—দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকিতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্রও বোধ হয় শেষ জীবনে তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া থাকিবেন। তাই তিনি

শ্রীশ বাবুকে বলিয়াছিলেন, "সাম্যটা সব ভুল। খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" *

বহুবিবাহ

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত বলিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা সমালোচনা-কালে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :— **

"বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতি-বিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।' * * *

"এই বাঙ্গালায় এক কোটী আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে এক জনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।

"কিন্তু এই বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃতসর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান ও পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

"যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের

* বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা।

** সাধনা—১৩১০।

কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনেব আবশ্যকতা আছে ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা দেখিতেছি, বহুবিবাহ স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিয়াছে, কচিৎ কখন শুনিতে পাই, কোনও কুলীন ব্রাহ্মণ পাঁচ সাতটি বিবাহ করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ সখ করিয়া পুত্রার্থে অথবা রিপুচরিতার্থে দুইটা বিবাহ করেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত বিরল। আইন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইল না—অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইল না, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হইল। কিন্তু বহুদূর যায় নাই—যাইতে যাইতেও এক একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছে।

স্ত্রী-শিক্ষা

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন * নিম্নে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটিকে কথামালা সমাপ্ত করাইয়া চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম, এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেকমাত্রও মনে স্থান দেন না।

"বাস্তবিক বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখা-পড়া শিখাইবার উপায় নাই। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

"সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্ বিদ্যালয়—দ্বিতীয় পুরুষ-বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

* বঙ্গদর্শন—চতুর্থ খণ্ড।

"দ্বিতীয়টির নাম মাত্রে বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহে মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলা ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

* * *

"স্ত্রী-শিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন—'বিধেয় বটে।'

"তার পর জিজ্ঞাসা—কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরীর জন্য। বোধ হয়, এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোক উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।"

আমি যদি এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে যাই, তাহা হইলে অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে দেশের মেয়ের বিবাহকাল আট হইতে বার বৎসর, সে দেশের মেয়ে কখন্ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সে কি স্বামীর সঙ্গে বই বগলে করিয়া বিদ্যালয়ে যাইবে?—না, ছেলে কোলে করিযা, অথবা বৃদ্ধা শাশুড়ীর ঘাড়ে, ছেলে ও সংসার ফেলিয়া কালেজে যাইবে?

আর এক কথা; দেশের বালিকার এগার বৎসর বয়সে যে সব স্ত্রীলক্ষণ প্রকাশ পায়, শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের আঠার বৎসর বয়সেও তা' প্রকাশ পায় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মেয়েরা আঠাব বৎসর পর্য্যন্ত কালেজে যাইতে পারেন; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা তা' পারে না। আগে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হউক্—বাল্য-বিবাহ রহিত হউক্—তার পর আমরা মেয়েদের কালেজে পাঠাব। যত দিন না তা' হয, ততদিন আমাদের মেয়েরা যেমন শাশুড়ী ও স্বামীর নিকট রামায়ণ, মহাভারত, অথবা নাটক নভেল পড়িয়া আসিতেছে, তেমনই পড়িতে থাকুক—এম, এ পাশে কাজ নাই।

বিধবা-বিবাহ

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়

"বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহের অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির

মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা হিন্দুই হউন্, অথবা যে জাতীয়া হউন্, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 'যদি' পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয় তবেই স্ত্রী অধিকারিণী; কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী-বিয়োগান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ উচিত? উচিত অনুচিত স্বতন্ত্র কথা, ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নী-বিযুক্ত পতি এবং পতি-বিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

"অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে, কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থ বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়। তবেই এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়, বিধানের কর্ত্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না; তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজ লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

"আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন, যে চিরবৈধব্য বন্ধনে হিন্দু-মহিলাদিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দুস্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, তাঁহার এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী, এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে মৃতভার্য্যা পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান করা হয় না কেন? তুমি মরিলে তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না। যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হও; এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্যসুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

"তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার স্থতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।"

বৈষম্য ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আর কোনও যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। সমাজের ভয়ের কথা ইঙ্গিতে একটু বলিয়া গিয়াছেন। আমরাও বলি, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও, সমাজ যতদিন না তাহার অনুমোদন করে ততদিন বিধবা-বিবাহ বাঙ্গালায় হিন্দুসমাজে চলিবে না।

বঙ্কিম-জীবনী

ষষ্ঠ খণ্ড

ধর্ম্ম

শুনিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে 'রূপকথা' শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধাদের নিকটে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একাগ্রমনে তাঁহাদের 'বিহঙ্গম বিহঙ্গমী'র গল্প শুনিতেন। বোধ হয় 'দেবী চৌধুরাণী' লিখিবার কালে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে বাল্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি ব্রহ্মঠাকুরাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহার মুখে আবার সেই পুরাতন গল্প শুনিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখিতে পড়িতে শিখিলেন, তখন রূপকথা ছাড়িয়া রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তবে সে সাধ কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাস বিরচিত গ্রন্থ হইতে মিটাইতে হইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি পড়িয়া পুরমহিলাদিগকে শুনাইতেন এবং দুরূহ অংশ সাধ্যমত বুঝাইয়া দিতেন।

মেদিনীপুর ছাড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন ডিরোজিয়োর * শিক্ষাপ্রভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। ডিরোজিয়ো একজন প্রতিভাসম্পন্ন মহা শক্তিশালী শিক্ষক ছিলেন। তিনি যে সকল ছাত্র এবং শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালায় অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার ছাত্র। কেহ শিক্ষকতায় Arnold of the East, কেহ বাগ্মীতায় Edmund Burke, কেহ ভাষাজ্ঞানে Friedrick weber। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি বিকশিত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই শিক্ষার ফলে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মৌলিকতা ও স্বাধীন চিন্তা-শক্তি প্রভাবে দেশে নাম ও যশঃ কিনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ডিরোজিয়ো দেশের সর্ব্বনাশও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা প্রভাবে হিন্দুছাত্রেরা আত্মসংযম বিস্মৃত হইল— হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইল। তাঁহার শিক্ষায় হিন্দুযুবকেরা অনাচারী ও নাস্তিক হইল।

* হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মোক্ষমুলর ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "Derozio though branded by the clergy as an infidel and a devil of the Thomas Paine school, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness."

কেহ যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেন * কেহবা, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলেন **। ডিরোজিয়ো হিন্দুকলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া 'পার্থিনন' নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলেন ; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইল। এই মহা শক্তিশালী ফিরিঙ্গি যুবক সংস্কারকরূপে দণ্ডায়মান হইযা হিন্দুধর্ম্মেব বিরুদ্ধে তাঁহার একাডেমির অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশময় নাস্তিকতার কৃষ্ণাবরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। হিন্দুযুবকেরা দূরদেশ হইতে সমাগত হইয়া ডিরোজিয়োর একাডেমিতে যোগদান করিল, অভিভাবকদের আদেশ উপেক্ষা করিয়া ডিরোজিয়োর নিকট শিক্ষা গ্রহণ কবিতে লাগিল। ডিরোজিয়োর সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতে মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর ন্যায় দলে দলে যুবকেরা ছুটিল। দেশে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইল। অবশেষে কর্তৃপক্ষেরা একমত হইয়া ডিবোজিয়োর কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন। ডিরোজিয়োও তার কিছুকাল পরে দেহত্যাগ কবিলেন।

ডিরোজিয়ো লোকান্তরিত হইলেও তাঁহার শিক্ষাপ্রভাব দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে অধ্যযনে প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে অনাচার ও নাস্তিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে এই অনাচার ও নাস্তিকতার বীজ উপ্ত হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে কিছুই করিতে পারিলেন না। গৃহে দেবোপম পিতা, দেবী-প্রতিমা মাতা, জাগ্রত দেবতা রাধাবল্লভ। ভট্টপল্লীর দেশ-প্রসিদ্ধ অধ্যাপকেরা নিয়ত আসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন ; প্রসিদ্ধ কথকেরা মধ্যে মধ্যে ভাগবত পাঠ করিতেন। পূজার দালানে হোম, চণ্ডী-পাঠ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ; উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা ; দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বার মাসে তের পার্ব্বণ ; ক্ষুদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, মন্দিরে মন্দিরে স্তোত্রপাঠ। বঙ্কিমচন্দ্র এতদ্‌সমূহের মধ্যে পড়িয়া হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ত্যাগ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে মাতা-পিতাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিতেন। তদ্ভিন্ন তিনি অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। বাল্যে মহাভারত, রামায়ণ পাঠ করিতেন, যৌবনে তদ্‌সমূহ স্পর্শ করিতেন না। বাল্যের মনসার ভাসান, বেহুলার উপাখ্যান, যৌবনকালে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণযাত্রায়, যৌবন সমাগমে আর শ্রদ্ধা ছিল না, তখন থিয়েটার ভাল লাগিত। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তখন ঘোরতর নাস্তিক ছিলাম।' কিন্তু যতদিন তিনি কলেজে পড়িতেন, ততদিন তিনি অনাচারী ছিলেন না। কলেজ ত্যাগ করিয়া যখন মাতাপিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি ইচ্ছামত আহার বিহার আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেইশ বৎসর বয়সে অনাচারী ; ত্রিশ

* রামতনু লাহিড়ী।

** কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৎসর বয়সে যখন কপালকুণ্ডলা লেখেন, তখন নাস্তিক। কিন্তু যখন গৃহে মাতাপিতার নিকট আসিতেন, তখন তাঁহার চরিত্রে বা আচার-ব্যবহারে কিছুই দূষণীয় লক্ষিত হইত না।

তারপর চল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সূচনা হয়। সূচনার দুই তিন বৎসর পরে সহসা কোনও অনৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রথম তরঙ্গ, 'আনন্দ-মঠ'; দ্বিতীয় 'দেবী চৌধুরাণী'। বঙ্কিমচন্দ্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইতে যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আর নশ্বর প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—ভগবৎ-প্রেম তখন লক্ষ্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা, তখন তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখিলেন। উপন্যাস না লিখিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাই 'জয়ন্তীর' সৃষ্টি করিলেন। 'জয়ন্তী'কে বুঝাইবার জন্য 'সীতারামে'র প্রয়োজন হইয়াছিল। যে শিক্ষা জয়ন্তী দিযাছিল, সে শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিয়া তিনি কৌষিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, নামাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু আহার করিতেন না। কয়েকমাস এই ভাবে কাটাইয়া যখন দেখিলেন, হবিষ্যান্ন কোন মতেই তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না, তখন তিনি আবার পূর্ব্ববৎ আহার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মন তখন শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত, হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ। ভগবৎ-চরণে সমস্ত হৃদয়টুকু লুটাইযা দিয়া তিনি নিয়ত বলিতেন,—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।'

ধর্ম্মমত

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত সাতিশয় উদার ছিল। খাদ্যবিশেষে বা বিলাত-গমনে যে ধর্ম্ম যায়, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। সে জন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন পশ্চাদ্পদ হন নাই। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহা প্রচার করিতে কখনও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন নির্ভীক হৃদয়ে লিখিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধার্ম্মিক, তাহাকে ছাড়িয়া বরং কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাত্মাকে ভক্তি করিবে, তখন সমগ্র হিন্দুসমাজ বিচলিত হইল। আবার যখন 'প্রচারে' লিখিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র এবং শশধর তর্কচূড়ামণি যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে না"—তখন হিন্দুসমাজ স্তম্ভিত হইল। তাঁহার সাহস অনন্ত, শক্তিও অনন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে

কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, "সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মানুমোদিত।" ধর্ম্ম লইয়া তাঁহাকে অনেকের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু কোনস্থলেও তিনি পরাস্ত হয়েন নাই। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী যথার্থ ই লিখিয়াছেন, "বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের সহিতই হউক, বাবু রবীন্দ্রনাথের সহিতই হউক্ বা মিঃ হেষ্টি সাহেবের সহিতই হউক্, তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) প্রতিভার নিকটে তর্কে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তিনি অজেয়, তিনি অমর।"

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, স্বধু হিন্দু নন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের নেতা ছিলেন। যখন তাঁহার ক্ষুদ্র তর্জ্জনী তাড়নে বাঙ্গালার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পরিচালিত হইত, তখনও তিনি হিন্দুসমাজের বক্ষে দাঁড়াইয়া নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়া গিয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্মে খাদ্যাদির নিষেধ নাই—হিন্দুধর্ম্মের মত সঙ্কীর্ণ নহে, অতি উদার। তবে তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, শারীরিক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে আহার বিহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত কেহ কেহ যে বিদ্রূপ করিতেন না, এমত নহে, তবে অধিকাংশ বাঙ্গালী তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। দেবী বাবু লিখিয়াছেন, "সে দেশে, কত শত রাম শ্যাম, জটা রাখিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, ভস্ম লেপিয়া অবতার বলিয়া আজকাল প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, কেহ কেহ বা সফলকামও হইতেছেন, সে দেশে, মহা প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিলে একজন মহা অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। শিষ্য জুটাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য সংগ্রহ হইত। কিন্তু তিনি মহা শক্তিশালী হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দল বাঁধেন নাই, অথচ তাঁহার অনুগত দল বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিয়াছে, তিনি নেতৃত্ব করেন নাই, অথচ সমগ্র সমাজ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেছে। মহা মহা পণ্ডিতেরা আজ তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছে। কালে যখন এ প্রভাব আরো বদ্ধমূল এবং বিস্তৃত হইবে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যপ্রভায় এ দেশ আলোকিত হইবে, তাঁহার জন্মভূমি মহাতীর্থে পরিণত হইবে। তখন দলে দলে লোক গগন কাঁপাইয়া "বন্দে মাতরং" মহাসঙ্গীত গাইবে, এবং মাতৃপূজার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের অমর ও অক্ষয় প্রতিভার পূজা প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বদেশপ্রেম, নিষ্কামধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করিবে, তখন ঘোরান্ধকারের মধ্যে 'প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র' উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিবেন। কতদিন পরে, কেহ তাহা জানে না। কিন্তু সে দিন নিশ্চয় আসিবে।" *

বহু বৎসর পূর্ব্বে দেবী বাবু যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু দেবী বাবুর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনিতে সকলে পারেন নাই। তাঁহার

* নব্যভারত, ১৩০১, বৈশাখ।

গ্রামের লোক তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন বাঙ্গালাব্যাপী ক্রন্দনরোল উঠিল, তখন কাঁটালপাড়া-নিবাসী অনেকেই বলিয়াছিলেন, "আমরা এতকাল জানিতাম না, বঙ্কিম বাবু এত বড়লোক।" তা' না জানিবারই কথা, দীপের নীচে চিরদিনই অন্ধকার। তা' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কাঁটালপাড়ায় বড একটা আসিতেন না। যখন তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত, যখন তাঁহার হৃদয়ে অটুট কৃষ্ণ-ভক্তি, তখনও তিনি কাঁটালপাড়ায় বড় একটা আসিতেন না। দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে বিগ্রহ কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের উপাস্য দেবতা, যে বিগ্রহকে স্বপ্নে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনাচার ও নাস্তিকতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে বিগ্রহ—সে রাধাবল্লভ-মূর্ত্তিকে দেখিতেও বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় আসিতেন না। রথের সময়ে দুই চারি দিনের জন্য আসিতেন, দুর্গোৎসবের সময়ও তাই। অন্য উৎসবের সময় আসি তন না। রাধাবল্লভকে সম্মুখে দেখিযা বঙ্কিমচন্দ্র নিস্তব্ধ, নীরব হইয়া দাঁড়াইতেন—সকল সময়ে প্রণাম করিতেন না। শুধু অনিমেষ নয়নে বিগ্রহ-পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিতেন। বিগ্রহ দেখিবার আকাঙ্ক্ষী তিনি ছিলেন না,—কেন না তাঁহার মানসপটে নিয়ত সে মূর্ত্তি জাগরিত। বিগ্রহ-চরণে প্রণাম করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইতেন না,—কেন না, যাঁহার চরণে নিরন্তর তাঁহার মনঃ প্রাণ লুটাইতেছে, তাঁহাকে আবার লোক দেখাইয়া প্রণাম করিবার প্রয়োজন কি? আমি একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম; তথায় দামোদর বাবু উপস্থিত ছিলেন। উভয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে উভয়ের মধ্যে একজন বলিলেন, 'যাঁহাকে অন্তরে অন্তরে নিয়ত প্রণাম করিতেছ, লোক দেখাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার প্রয়োজন কি?" অপর ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রণামটা ব্যবহারিক—অভ্যাস রাখা প্রয়োজন।" কে কোন্ কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই।

দুর্গোৎসবের সময় দেবী-প্রতিমার পদতলে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু সে প্রণামে বৈচিত্র্য বা বিশেষ ভক্তি দেখি নাই। সাধারণ লোকে যেমন মাথা ঠুকিত, তিনিও সেইরূপ ঠুকিতেন। একবার সন্ধিপূজার সময় তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, সে রূপ মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই। দালানের এক কোণে—প্রতিমা হইতে দূরে, প্রাচীর অবলম্বন করিয়া একা নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ নহে, দৃষ্টিও ঠিক প্রতিমা পানে নহে। দৃষ্টি যে কোন্ দিকে, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তাঁহাকে তদবস্থায় যে দেখিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি অন্তরে—বাহিরে প্রকাশ পাইত না। লোকে যেমন উঠিতে বসিতে হাই তুলিতে 'হরি বল' 'হরি বল' করে, তিনি কখন সেরূপ করিতেন না। হরি নাম তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন; তবে উচ্চ-কণ্ঠে গীতা পাঠ করিতেন। ভিক্ষুক করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে আসিলে বঙ্কিমচন্দ্র

উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। কখন ললাট কুঞ্চিত হইত, কখন বা চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত হইযা আসিত।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও অসত্য বলিতেন না—পরের অনিষ্টও করিতেন না। ইহাই তাঁহার মূল ধর্ম্মনীতি ছিল। তা' ছাড়া, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। পরের উপকার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল না হইলেও তিনি যেখানে বুঝিতেন উপকার করা কর্ত্তব্য, সেখানে তিনি মুক্তহস্তে অগ্রসর হইতেন। এরূপে তিনি আত্মীয়স্বজন ও দুঃস্থ প্রতিবাসীদিগের অনেককেই সাহায্য করিয়াছেন। গৃহে ভিক্ষুক আসিলে ফিরাইতেন না বটে, কিন্তু একমুষ্টি তণ্ডুল দিয়াই তাঁহাব কর্ত্তব্য সমাধা হইল, এরূপ বিবেচনা করিতেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা দিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। একটী ছোট কথায় তাহা বুঝাইব। আমাদের বংশে কেহ বাহিরের লোকের কাছে মন্ত্রগ্রহণ করেন না, বংশের মধ্যে কোনও বযোজ্যেষ্ঠ উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে মন্ত্রগ্রহণ করিযা থাকেন। এ প্রথা বহুকাল হইতে আমাদের বংশে চলিযা আসিতেছে। তদনুসারে আমার কোনও খুল্লতাত-ভ্রাতা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্র প্রদান করিযা, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নবদীক্ষিত শিষ্যকে একটী মাত্র উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি নিয়ত স্মরণ রাখিবে, তুমি ব্রাহ্মণ।"

কথাটি বড় ছোট নয। এত অল্প কথায এত বড উপদেশ হইতে পারে, আমি পূর্ব্বে তা' জানিতাম না।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মভাব কতদূর উন্নত হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একটা ঘটনার অবতারণা করিব। মৃত্যুর তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হয়। এই রোগের বৈচিত্র্য এই যে, জ্বর বা অন্য কোন উপসর্গ বর্ত্তমান ছিল না—দাঁত দিয়া শুধু রক্ত ছুটিত। একটু আধটু নয়, তিন ছটাক রক্তও কোন কোন দিন পড়িত। খুড়িমা বড় চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কোঙার আসিয়া ব্যবস্থা করিলেন। বিশেষ কোন ফল হইল না। খুড়িমা ব্যস্ত হইয়া পডিলেন,—ডাক্তার চন্দ্রাকে ডাকিয়া আনিতে আমাকে বলিলেন। কাকাকে জিজ্ঞাসা না করিযা যাইতে সাহস হইল না। তাঁহার আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়াইলাম। তিনি খুড়িমার বিরস বদন প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন; পরে আমাকে বলিলেন, "ডাকিয়া আন।" আমি ছুটিয়া মেডিকেল কলেজে গেলাম। তখন বেলা ৮৷৯ টা হইবে। সাহেব পড়াইতেছিলেন। একটু অপেক্ষা করিলাম। সত্বর সাক্ষাৎ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আসিলেন। উভয়ের মধ্যে একটু সখ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই; তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, চন্দ্রা সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়িমা পাশের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইয়া রোগের পরিচয় দিতেছিলাম। চন্দ্রা সাহেব শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যহ দীর্ঘকাল ধরিয়া গীতা পাঠ

করেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব আদেশ করিলেন, "গীতা পাঠ বন্ধ রাখিতে হইবে—কথাবার্ত্তাও কমাইতে হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটু হাসিলেন। তেমন হাসি তাঁহার ওষ্ঠে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এ প্রতিভার হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, অহঙ্কারের হাসি নয়,—এ নির্ম্মল আনন্দের হাসি—স্থির বিশ্বাসের বিদ্যুৎস্ফুরণ।

এ দিকে চন্দ্রা সাহেব ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দ্বারবান যথাসময়ে ঔষধ লইয়া আসিল। ঔষধের শিশি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে সংরক্ষিত হইল। তিনি শিশির ছিপি খুলিয়া সমস্ত ঔষধটুকু পিক্‌দানিতে ঢালিয়া ফেলিলেন, এবং সহাস্য মুখে উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ আরম্ভ করিলেন। খুড়িমার ধীর স্থির গম্ভীর হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তখন কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরব রহিলেন। পরে অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল—অনেকে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও গীতা-পাঠ বন্ধ করেন নাই। অবশেষে তিনি শয্যাগত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সাতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। দন্তমূল হইতে রক্ত অবিরাম নির্গত হইতে লাগিল। একদিন স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক বুঝাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তর্ক না করিয়া স্বধু হাসিয়াছিলেন। অধরে আবার সেই হাসি। সুহৃদ্বর ছাড়িলেন না, বলিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিতেছ?"

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে?"

ডাক্তার সরকার। যে ঔষধ না খায়, সে আত্মঘাতক।

বঙ্কিম। কে বলিল আমি ঔষধ খাই না?

ডাক্তার। খাও? কই তোমার ঔষধ?

বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি হেলাইয়া গীতা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সরকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।"

বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রোগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল—জীবনের আশাও কম হইয়া আসিল। অবশেষে শয্যায় শুইয়া গীতা পাঠ করিবার শক্তিও লোপ পাইল। একদিন নিশীথে—আমার বেশ স্মরণ আছে—মহাপুরুষের জীবন লইয়া যখন টানাটানি, শয্যার এক পার্শ্বে খুড়িমা, অপর পার্শ্বে আমি উপবিষ্ট থাকিয়া রোগীর মুখ প্রতি ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া আছি, তখন সহসা শুনিলাম, ভক্তিময় পুরুষ ঘুমঘোরে গীতা আবৃত্তি করিতেছেন। গীতার একটু আধটু অংশ নয়—প্রায় একটা সর্গ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। তারপর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরদিন হইতে তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং অচিরে আরোগ্য লাভ করিলেন।

মসী-যুদ্ধ

যে কয়েকবার বঙ্কিমচন্দ্র মসী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রায় সে কয়েক বারেই তিনি হিন্দুধর্ম্মের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। আগে লোকে ধর্ম্মের জন্য তরবারি ধরিত—ক্রুসেড ঘোষণা করিত, এখন আর সে দিন নাই—লেখনী ধরিয়াই ক্ষান্ত হয়। ধর্ম্মের উপর আঘাত মানুষ কোন কালেই সহ্য করিতে পারে না। পণ্ডিতপ্রবর হেষ্টি সাহেব যখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া অযথা গালিগালাজ করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র যেন একটু অধৈর্য্য হৃদয়ে রুদ্রমূর্ত্তিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মহারথিগণ যখন আবার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তির্য্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মহাশক্তিশালী লেখনী উঠাইয়া লইয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল বাদ প্রতিবাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে,—সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত থাকিব।

'নবজীবন' ও 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়মক্রমে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। নবজীবন কাগজ খানির একটু পরিচয় না দিলে সে যুগের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। নবজীবন ও প্রচার পনর দিনের আড়াআড়িতে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম খানির জন্মদাতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার—দ্বিতীয় খানির, বঙ্কিমচন্দ্র। নবজীবনের সূচনায় অক্ষয় বাবু বঙ্গদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা করিলেন। তবে প্রশংসাটা বঙ্গদর্শনেরই কিছু বেশী হইল। এতদুপলক্ষে এক বিরোধের সৃষ্টি হইল। আমি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাহার পরিচয় দিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

"নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়া চাড়া করিয়াছিলেন।

"তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—'ব'। লোকে কাজেই বলিল, পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু 'ইতর' শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পালটাইয়া বলিলেন।" *

রবীন্দ্র বাবু এ পত্রের দায়িত্ব অস্বীকার না করিয়া বলিতেছেন, "নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল, সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" **

বঙ্কিম বাবু যে এ ব্যাপারটি অকারণ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান হয় না। নবজীবন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইতে না হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইলেন। দুইজন যশস্বী লেখক সঞ্জীবনীর সাহায্যে ও একজন "মীমাংসাপ্রার্থী" নব্যভারতে 'হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান' প্রবন্ধদ্বারা আক্রমণ করিলেন; আর দুইজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তত্ত্ববোধিনীতে লিখিলেন। এই পাঁচ জন লেখকই আদি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। শুধু সমাজ-ভুক্ত বলিলেই চলিবে না, তাঁহারা উক্ত সমাজের মাথা। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মস্তকস্বরূপ এই লেখকপঞ্চক সহসা একই সময়ে নবজীবনকে আক্রমণ করিলেন কেন? হিন্দু-সমাজ-ভুক্ত কোন পণ্ডিত কিছু বলিলেন না কেন? কারণ অন্বেষণ করিতে দূরে যাইতে হইবে না। নবজীবনের উদ্দেশ্য, নবযুগ-প্রতিষ্ঠা; এ নবযুগ হিন্দুধর্ম্মের। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, "এই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অভিমত নহে।" তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতির আক্রমণ অক্ষয় বাবু বা চন্দ্রনাথ বাবুর উপর নহে—এ আক্রমণ হিন্দুধর্ম্মের উপর। বঙ্কিমচন্দ্র তাই আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। চন্দ্রনাথ বাবু বা হিন্দুসমাজ-ভুক্ত অপর কেহ যদি ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বা তত্ত্ববোধিনীর কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আক্রমণ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে সেই সমাজভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তদুত্তর দিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ স্বীয় ধর্ম্মের জন্য, বা সেই ধর্ম্মভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের জন্য দুই চারি কথা বলিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। নবজীবন-সম্পাদক এই সকল বাদানুবাদের মধ্যে স্থির থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিলেন। তিনি কোনও আক্রমণের উত্তর দেন নাই বা কোনও আক্রমণ বিশেষভাবে আহ্বান করেন নাই, এ কথা বলিতে পারি না; তিনি পত্র-সূচনায় তত্ত্ববোধিনীর প্রতি তীব্র তির্য্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "এক্ষণে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার কার্য্য ফুরাইয়াছে। তত্ত্ববোধিনীতে যে সকল প্রাণীতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব

* প্রচার, ১২৯১ সাল, ১৭০ পৃষ্ঠা।

** ভারতী, ১২৯১ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন।" অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধনিচয় যাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় তাহা পাঠের অযোগ্য। এইরূপে অক্ষয় বাবু নবজীবনের সূচনায় ঝড়ের সূচনা করিলেন। অবশেষে চারিদিকের ঝড় থামিয়া গেল। কিন্তু থামিল চারি পাঁচ মাস পরে। থামাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়ম ক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত লেখকগণ দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি।"*

বঙ্কিমচন্দ্র সকল সমালোচনাকেই আক্রমণ বলিযা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং নির্দ্দেশ করিবার হেতুও দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথম সমালোচনাটি আক্রমণ বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা হউক, যথাযথ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

১
বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ

প্রথম আক্রমণ, 'তত্ত্ববোধিনী'তে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ** শীর্ষক একটি প্রবন্ধ 'নবজীবনে' লিখিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নব্য হিন্দুসম্প্রদায়' নাম দিয়া উক্ত পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' সমালোচিত হয়। প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্র বাবু লিখিলেন,—"নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় এক প্রকার নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় নহে,—আবার তাহা ধর্ম্মের মর্ম্মে আঘাত করিতে উদ্যত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র; তবে যে আমরা তাঁহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি—সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে।

"বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, শারীরিক, মানসিক ও আন্তরিক (?) বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ—এবং সেই সুখের যে উপায় তাহারই

---

* প্রচার, ১২৯১ সাল, ১৭১ পৃষ্ঠা।

** এই প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম না।

নাম ধর্ম্ম—এবং তিনি ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সেই 'সুখই ধর্ম্ম।' ওরূপ সুখ প্রথমতঃ পূর্ণ যৌবন-কালের ধর্ম্ম—কেন না প্রাচীন বয়সে বৃত্তি-সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি একেবারেই অসম্ভব ; দ্বিতীয়তঃ উহা খুব একজন সাবধানী প্রবীণ লোকের ধর্ম্ম।

"বঙ্কিম বাবু বলেন, 'যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।' এ কথা আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ভগবদ্গীতার আদিতে পরকালের অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে—পরকালকে, আত্মাকে এবং পরমাত্মাকে ছাড়িয়া দিয়াও যে, ধর্ম্মসাধন হইতে পারে, এ কথা ভগবদ্গীতার কথা নহে।

* * * *

"বঙ্কিম বাবু বলেন যে, ঈশ্বর এবং পরকালের সহিত ধর্ম্মের কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই, সুতরাং আত্ম-প্রসাদ—যাহা আত্মা এবং পরমাত্মার পরস্পর-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ —তাহা বঙ্কিমবাবুর সুখ-রাজ্যের সীমাভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না।" *

বঙ্কিমচন্দ্র এই সমালোচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি (দ্বিজেন্দ্র বাবু) সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না।" **

২

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসু

দ্বিতীয় আক্রমণও 'তত্ত্ববোধিনী'তে। আক্রমক প্রবন্ধের নাম—'নূতন ধর্ম্মমত'। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধদ্বয়ের নাম, 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'হিন্দুধর্ম্ম'। এই প্রবন্ধ দুইটিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র সমালোচনা 'নূতন ধর্ম্মমত' লেখকের উদ্দেশ্য। লেখক কে, তাহা প্রকাশ নাই, তবে লোকে বলে, শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু উক্ত প্রবন্ধের লেখক। রাজনারায়ণ বাবু আরম্ভে বলিয়াছেন,—"কোন মহাকবি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরকে জানা বিদ্যার উদ্দেশ্য। ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা কোথায় ঈশ্বরনিষ্ঠ ও

* তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৬ শক, ভাদ্র।

** প্রচার, ১২৯১ সাল, ১৭১ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মপরায়ণ হইবেন, তাহা না হইয়া, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, জড়বাদ, অথবা কোমত্‌বাদ অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে, কোমতের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। 'নবজীবন' নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। নবজীবনের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'-শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে, চিত্ত-চমৎকৃতি এবং সুখই ধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্র সকল এই মত প্রতিপালন করিতেছে। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। * * *

"নবজীবন-সম্পাদক বলিয়াছেন, 'নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্ম্মে উপেক্ষা করিলে আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতি হইবে না। ঘৃণিত কোমত্‌বাদের প্রবর্ত্তন যদি নবজীবন সঞ্চারের কারণ হয়, তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকদিগকে এরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হইতে আমরা পরামর্শ দিই না। যথার্থ বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগের মৃতবৎ হিন্দু-সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে।

* * * *

"নবজীবনের সহযোগী প্রচার পত্রিকার কোন লেখক বলেন, 'যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতির তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সার গঠিত। এরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মে তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেইটুকু সার ভাগ। সেইটুকু হিন্দুধর্ম্ম। সে টুকু-ছাড়া যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে, অথবা বেদেতে থাকে, তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।' এই কথাতে আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত সায় দিই, কিন্তু প্রচারের উক্ত প্রস্তাবের লেখক আবার নবজীবনের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'-শিরস্ক প্রস্তাবের লেখক। 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা'-শিরস্ক প্রস্তাবে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি কোম্‌তের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ মনে করেন। যদি কোমতের মত হিন্দুধর্ম্মের সার ভাগ হয়, তাহা হইলে এমন হিন্দুধর্ম্ম আমরা চাহি না।

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন, 'যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।'—হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয়ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির

সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"*

বঙ্কিমচন্দ্র এতদ্‌সমূহ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।" **

৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ

"তৃতীয় আক্রমণ," বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন, "তত্ত্ব-বোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে।" বিচার্য্য বিষয় অতি সামান্য। তাহা লইয়া কলহ, গালাগালি চলে না। কিন্তু কৈলাস বাবু অবাধে চালাইয়াছেন। ব্যাপারটা গোড়া হইতেই বলি।

'বাঙ্গালার কলঙ্ক' নামক একটী প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে প্রথম সংখ্যায় লিখিলেন। তাহাতে রাগ করিবার কাহারও কিছু নাই। উক্ত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

"মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলম বন্দ করেন নাই। ভিন্ন দেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এরূপ বিশ্বাস। * * কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক্, তাহার কথা মিথ্যা।

"এ নিন্দার কোনও মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? * * *

"বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। * * *

"পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা

* তত্ত্ববোধিনী, ১৮০৬ শক, ভাদ্র।

** প্রচার, ১২৯১ সাল, অগ্রহায়ণ।

অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।" ইত্যাদি।

এইরূপে অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, মিত্র মহাশয়ের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের যাথার্থ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল কথায় আমাদের এক্ষণে কোন প্রয়োজন নাই। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক 'নব্যভারতে' উহার প্রতিবাদ করেন। তাহাতে তিনি লেখেন—

"বঙ্গদর্শন" অনন্তধামে গমন করিয়াছে। 'নবজীবন' ও 'প্রচার' তাহার স্থান অধিকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। 'নবজীবন' সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। কিন্তু ক্ষুদ্রকায় প্রচার নীরবে আপন প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছে। প্রথম সংখ্যা প্রচারে 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের 'ভারতকলঙ্ক' এই প্রবন্ধের আদর্শস্থল, ইহা তাহারই পরিশিষ্ট।

"আমরা বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট 'দাতাকর্ণ,' 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। সে সকল সে সময় নিতান্ত উপাদেয় বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা আর তাহার পক্ষপাতী নহি। এক সময়ে আমরা বঙ্গদর্শনের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের পক্ষপাতী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, তাহার অধিকাংশই অনুবাদ, অনুকরণ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধটি কেবল বালকের নিকট কেন, ঐতিহাসিক তত্ত্বানভিজ্ঞ অনেকের নিকটেই ভাল লাগিবে। কিন্তু আমরা তাহার কতকগুলি কথার প্রতিবাদ না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।"

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কৈলাস বাবু পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত যে অখণ্ডনীয় নহে, তাহা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজেন্দ্রবাবু "সেনরাজ" ও "পাল ও সেন" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া কৈলাসবাবু, মিত্র মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে কৈলাস বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন,—"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, আবিষ্কৃত মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর, কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইল্‌সন্, বেবার, মেক্‌স্‌মূলর, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিয়োর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হণ্টার প্রভৃতির কুসুমকাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার, গুরুগিরি করিও না।"

কৈলাস বাবুর এই প্রবন্ধের বৈচিত্র্য এই যে, এই প্রবন্ধের আরম্ভে ও শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রচুর পরিমাণে গালিবর্ষণ করা হইয়াছে। মধ্যভাগে শুধু রাজেন্দ্র বাবুর ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। মধ্যভাগের সহিত অপর দুই অংশের বড় একটা সম্বন্ধ দেখা যায় না। সম্বন্ধ রক্ষায় প্রয়োজন নাই—গালি দেওয়াই প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ, কেন তিনি রাজেন্দ্র বাবুর মত অখণ্ডনীয় বিবেচনা

করিয়াছিলেন? অপরাধ আরও একটু আছে; কৈলাসবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারক ও প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্র, কৈলাস বাবুর পরিচয়ে বলিতেছেন, "শুনিয়াছি ইনি যোড়াসাঁকোর ঠাকুরমহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নাএব কি, কি আমি ঠিক জানি না।" ভাষা সম্বন্ধে বলিতেছেন, কৈলাস বাবুর অন্যান্য প্রবন্ধে "কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, এ আক্রমণ কৈলাস বাবুর নহে—এ আক্রমণ আদি ব্রাহ্মসমাজের। তাই তিনি ইহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় আক্রমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

৪
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

প্রথম সংখ্যা 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম্ম' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে দুইটী হিন্দুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ব্যক্তি জমিদার। তিনি প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপন করিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত একাগ্রমনে পূজাহ্নিকে অতিবাহিত করেন। তার পর নিরামিষ শাকান্ন ভোজনান্তে কাছারিতে বসিয়া কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কিরূপে জাল দলীল প্রস্তুত করিয়া কোন্ বিধবার সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহাতে নিবিষ্টচিত্ত থাকেন।

দ্বিতীয় হিন্দুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এ ব্যক্তির অভক্ষ্য কিছুই নাই। সুরাপান বা ম্লেচ্ছের সঙ্গে পান ভোজনাদিতে তাহার কিছু মাত্র সঙ্কোচ বা বিরাগ নাই। সান্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু তিনি অন্তরে ঈশ্বরে ভক্তিমান্—মিথ্যা কথা কদাচ কহেন না। যদি কখনও মিথ্যা কথা কহেন, তবে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। তিনি নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন; এবং যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়সংযমও করিয়া থাকেন।

এই দুই ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম?

এই 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধ শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইল। তাহার চারি মাস পরে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধকে আক্রমণ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রবাবু বক্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরব নিস্তব্ধভাবে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকার ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য * লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন? অথচ কাহারও তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না।"

আর একস্থানে বলিয়াছেন, "লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' কোন খানেই মিথ্যা সত্য হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

রবীন্দ্র বাবু বলিয়া যাইতেছেন, "অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক, কি লোকহিতের জন্যই হউক, অসত্য বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এত সঙ্কুচিত যে, অসত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গ সমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে, অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।"

উপসংহারে রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—

"অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন, তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন বা শ্রীকৃষ্ণেরই দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনই

* কথাটি নাকি বক্তৃতাকালে মূর্খ বলিয়া শুনা গিয়াছিল।

ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়া আসিব।"

বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়া "ভারতী"তে প্রকাশিত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পঠনান্তর 'প্রচারে' 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রচারে'ই এই প্রবন্ধ বাহির হইল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র বাবুর আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন,—"ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রযোজন হয় নাই। এবার একটু উত্তর করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

"কিন্তু সে প্রযোজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তর ইহাব বেশী প্রযোজন নাই। * * * *

"তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পিছনে একটা বড ছাযা দেখিতেছি।"

'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ'কে লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলিযাছেন। রবি বাবু এই সমাজেব তখন সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বিশ্বাস ছিল, এ আক্রমণ রবি বাবুর স্বেচ্ছাকৃত নহে। তিনি রবি বাবুকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন—রবি বাবুও বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "রবি বাবু আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।" রবি বাবু মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আসিযা সাহিত্যালোচনা করিতেন। উভয়কে সে সময় একত্র দেখিয়া মনে হইত কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট, অথবা শিষ্য গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় রবি বাবু বঙ্কিমচন্দ্রকে গালিগালাজ করিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—"চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেক বার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। * * * তারপর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন।"

এইরূপে আদি ব্রাহ্ম-সমাজকে মসী-যুদ্ধে জডাইবার হেতু প্রদর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অবস্থায় "মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়," সে অবস্থার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির কর্ণের যুদ্ধে পরাস্ত

হইয়া শিবিরে পলায়নপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষ্ণার্জ্জুন রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিয়া সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। যখন শুনিলেন যে, কর্ণ বধ হয় নাই, তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, যে ব্যক্তি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি সংহার করিবেন। "কাজেই 'সত্য' রক্ষার জন্য অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে তিনি 'সত্য'-চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।"

উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে 'সত্য' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজিতে যাহাকে Truth বলে, 'সত্য' শব্দ ঠিক তাহা নহে। সত্য Truth বটে, কিন্তু Truth ছাড়া আরও কিছু। Truth, Honour, Faith এই সকল শব্দের সমষ্টি অর্থে যাহা বুঝায়, এক 'সত্য' শব্দের অর্থে তাহাই বুঝায়।

অতএব প্রতিজ্ঞাপালনও সত্য-ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপালনে কাতর, সে সত্য-ধর্ম্মচ্যুত। অর্জ্জুন যখন তাঁহার সত্যরক্ষার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম।" রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থে নিরপরাধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল ? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে আজ দিবা অবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত ? যদি তাঁহাদের সে মত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এ দেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্য-চ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।"

উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্র বাবুকে বলিতেছেন, "সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। * * * তাঁহার (রবীন্দ্র বাবুর) কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্পবয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।"

এইখানেই যবনিকা পড়িল না। রবীন্দ্র বাবু আবার উত্তর দিলেন। উত্তরটার নাম দিলেন—"কৈফিয়ৎ।" ভারতীর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"বঙ্কিম বাবু বলিযাছেন, ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি; কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজনতুল্য, তিনি আমার চেযে কিসে না বড়? আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে? তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে, তাঁহাকে অমান্য করিযাছি—কেবল মাত্র অমান্য নহে—তাঁহাকে গালি দিয়াছি, তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ হৃদযে অনেক কথা বলিযাছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি।

* * *

"গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে, সন্দেহ নাই; এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিমবাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইযাছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই।

* * *

বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়ার আবশ্যক বিবেচনা কবিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখি উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাডাইয়াছেন। তবে, বঙ্কিম বাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতব বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, ভরসাও হয় না।"

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু তিনটি যুক্তি খাড়া করিয়াছেন। প্রথম, "সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।" দ্বিতীয়, "সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায় না—সত্য পালন বা সত্যরক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝায়—কেবল মাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।" তৃতীয়, বঙ্কিম বাবু 'সত্য' শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি 'মিথ্যা' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।"

আরও প্রমাণাদি দর্শাইয়া রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "বঙ্কিম বাবু এইরূপে বলেন

যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি, তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্ব্বজনখ্যাত দ্রোণপর্ব্বস্থ কৃষ্ণের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। * * * 'হত ইতি গজে'র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোকে জানে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র একটী গুরুতর অভিযোগ করিয়াছিলেন; রবীন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"বঙ্কিম বাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা কথা কহিয়াছি। * * * আমি বলিয়াছিলাম, 'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিযাছেন' ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, প্রথম **কল্পনা** শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছু নাই যে তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক, ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, **কল্পনা** নহে। আমার নিকট পরিচিত দুইজন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্র বাবু সরল ভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, প্রচারের লেখা হইতেই তিনি এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। যদি অনুমানে ভ্রম হইয়া থাকে, তবে সে ভ্রম তরুণ বয়সসুলভ। রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন,—"আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে (বঙ্কিমচন্দ্র) বলিয়াছেন—'তার পর আদর্শ কথাটি সত্য নহে। আদর্শ শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না।"

"প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম, 'তিনি একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা' উভয় অর্থের কত প্রভেদ হয়, পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"

উপসংহারে রবীন্দ্র বাবু অতি উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, "বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি, তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধের আর কোনও উত্তর দেন নাই। দিবেন না, তাহা পূর্ব্বেই 'প্রচারে' বলিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে এ মনোমালিন্য অচিরে দূরীভূত হইয়াছিল। ১২৯১ সালের পৌষ-সংখ্যার 'ভারতী'তে রবীন্দ্র বাবুর 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের 'প্রচারে' রবীন্দ্র বাবু একটি কবিতা দিয়াছিলেন। কবিতার

নাম—'মথুরায়' এতৎপূর্ব্বে রবীন্দ্র বাবুর কোন রচনা 'প্রচারে' প্রকাশিত হয় নাই।

৫
বঙ্কিমচন্দ্র ও অধ্যাপক হেষ্টি

১৮৮২ সালে হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোরতর মসী-যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজেই চলিয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ, উপলক্ষ হইয়াছিল। মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ খুব জঁাকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বৃহৎ সভামণ্ডপে বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় ৪০০০ অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাক্ষেত্রে গৃহবিগ্রহ গোপীনাথজীকে রৌপ্য সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছিল। এই গোপীনাথজীকে সভামধ্যে দেখিয়া হেষ্টি সাহেবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধ সংবরণে অক্ষম হইয়া তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মের উপর তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেষ্টি সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, যে সভায় এই বিগ্রহকে স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিরূপে অবস্থান করিলেন? ক্রমে তাঁহার স্বর চড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—

"No delicate mind can look into a *Shiva* temple without a shudder. The horrid and bloody *Kali*, with her protruding tongue, her necklace of skulls, and her girdle of giant hands, is fitted only to excite terror and despair. The elephant-headed, huge paunched Ganapati may excite the ridicule even of children, but can never draw forth their love. And to take the special example in point of the Krishna cult, what is at the best, with all its merry music and mincing movements, but the apotheosis of sensual desire and the idolatry of merely finite life."

হেষ্টি সাহেব এইরূপ গালি দিয়া হিন্দু ধর্ম্মটা যে তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি লিখিলেন,—

"But the fundamental position of the defender of idolatry is, that it is an *Intellectual necessity* for the practical devotion

of less cultivated minds. The essential nature of deity is held to be so abstract and transcendent, that the ordinary worshipper can not apprehend it intellectually, and hence he must have put before him some visible representation of the Divine. This is the sheet anchor of the Hindu apologist to which he binds the whole system."

এইরূপে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া হেষ্টি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি কল্পনাকুশল আর্য্যসন্তান বাঙ্গালী, বুদ্ধি-শক্তিতে কোল, ভীল, সাঁওতাল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর?" এ কথাব উত্তর তিনি নিজেই কিছু চিন্তার পর দিলেন; বলিলেন, "না, বাঙ্গালীরা কখন এত নীচ, এত স্থূলবুদ্ধি হইতে পারে না যে, তাহাদের হাতে গড়া মাটির পুতুলের সাহায্য ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করিতে অক্ষম।"

স্তোকটুকু দিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরিলেন, বলিলেন,—

"What is Krishna, after all, but an imagninary embodiment of the sensuous feeling of the East ?—"

শ্রীকৃষ্ণকে বেশ এক হাত লইয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন, বলিলেন,—

"And this debasing idolatry produced, according to the painful testimony of native writers themselves, a mass of shrinking cowards, of unscrupulous deceivers, of bestial idlers, of filthy songsters, of degraded women, and of lustful men. * * It has encouraged and consecrated every conceivable form of licentiousness, falsehood, injustice, cruelty, robbery and murder. It has taught the millions every possible iniquity by the example of their gods. * * The Hindu alone still disgraces the nobility of the Aryan race by a Syrian worship of idols inflaming him with lust under every green tree."

এতদপেক্ষা গুরুতর গালাগালি আর কেহ কখন কোন জাতির ধর্ম্মকে দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। গালি দিয়া, ভারতবর্ষের অবনতি দর্শন করিয়া, হেষ্টি সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসেরও সঙ্গে সঙ্গে হলাহল। সাহেব লিখিলেন,—

"O Varat Barsa, the once fair daughter of the morning, how hast thou fallen from thy throne of pride and become the mother of harlots and of the abominations of the earth!"

এ গালাগালি বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একখানি পত্র লিখিলেন। সে পত্রখানির নকল নিম্নে দিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র পত্রনিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন না—একটা কাল্পনিক নাম দিলেন ; নামটী,—'রামচন্দ্র'। শেষ পত্র ছাড়া তিনি অন্যান্য সকল পত্রে 'রামচন্দ্র' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

No. 1. (Ram Chandra's)

"Will you allow me to suggest to Mr. Hastie who is so ambitious of earning distinction as a sort of Indian St. Paul, that it is fit that he should render himself better acquainted with the doctrines of the Hindu religion before he seeks to demolish them. As matters stands with him, his arguments are simply contemptible ; and I think the columns of the STATESMAN might have been more usefully occupied by advertisements about Doorga Puja Holiday goods than by trash which render the Champion of Christianity contemptible in the eyes of idolaters. This may be harsh language, but the writer who mistakes Vedantism for Hindooism, and goes to Mr. Monier Williams for an exposition of that doctrine, hardly deserves better treatment. Mr. Hastie's attempt to storm the 'inner citadel' of the Hindoo religion forcibly reminds us of another equally heroic achievement—that of the redoubted knight of La Mancha before the windmill.

"Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of the Sanskrit Scriptures in the *original.* Let him study them critically all the systems of Hindu Philosophy—the *Bhagabat Gita*, the *Bhakti Sutra* of Sandilya, and such other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot teach what they don't understand ; the blind cannot lead the blind. Let him study them with a Hindoo, with one who *believes* in them. And then, if he should still entertain his present inclination, to enter on an apostolic career, let him hold forth at his pleasure,

and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him. At present, arguments would be thrown away on him. There can be no controversy on a subject when one of the controversialists is in utter ignorance on the subject-matter of the controversy ; and if under such circumstances the 'Olympians only yawn', and do not assert, Mr. Hastie has only to thank his own precipitate ignorance."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টি সাহেব বুঝিলেন, তাঁহাকে এবার একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুঝিতে হইবে। তিনি এতদিন যে সকল হিন্দুদের সঙ্গে মসী-যুদ্ধে ব্রত ছিলেন, তাহাদের তাচ্ছল্য করিয়া লিখিলেন,--

"I do not intend to ask space for a reply to any of the *special* criticisms of your numerous correspondents upon my letters, untill they say something relevant and worthy of being dealt with. But I hope you will allow me to return greatful thanks to the valiant hero of the modern Brahmans, *Ram Chandra, Redivious,* for the kind advice so bountifully tendered to me in your columns to-day, which I sincerely promise to put into practice, as soon as he shows that I have need of it. Your readers, who may be better acquainted with Sanskrit literature than he seems to be, will have already judged whether I confounded Vedantism with Hinduism."

হেষ্টি সাহেব ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং রামচন্দ্রকে "supercilious and self-confident" বলিয়া আখ্যাত করিলেন। তারপর রামচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে লিখিলেন—

"I publicly challenge him to substantiate his allegation of the 'contemptible' inferiority of 'blind' European learning, by giving, without its aid, an intelligible explanation of the simple *Vedic* verse—'Chatustrinsadvajino devabandhorvankrirasvaya svadhitih sameti.' * I give him the whole of the Durga Puja holidays even to discover the difficulty involved in the expression, and if he does find out so much, I will give him, and the other 4000 *Adhyapaks* to boot, who were present at the great *Shradh*, as many months as they like, to search through all the Sanskrit literature known to them for an explanation."

* চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বংক্রীরশ্বস্য স্বধিতিঃ সমেতি।

সাত দিন যাইতে না যাইতে হেষ্টি আর একখানা পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

"I am waiting patiently for a reply to my last letter from the learned *Ram Chandra* and the 4000 *Adhyapaks* of the *Shradh* It is really a challenge to all the Pandits of Bengal to show that they understand their own sacred literature, and are able to defend it at the bar of modern science. If none of them—not even the modern *Ram Chandra* himself—can come forward and bend this bow of a Western Janaka, let the champions of Hindu idolatry henceforth 'hide their diminished heads' before the more powerful scholars of Europe, and let the last adominations of that idolatry, even in these Durga Puja days, sink into utter darkness and shame."

এ পত্র ষ্টেট্‌সম্যানে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইল। তাঁহার পত্রের কিছু কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

No. II. (Ram Chandra's)

"The courage and dash with which Mr. Hastie throws down the gauntlet I admire and acknowledge with a low *salaam* merely, suggesting, in all humility, the necessity of further improvement in transliterating and transcribing Sanskrit texts

* * *

"In plain language, as some irreverent heathen may be supposed to say, *Mr. Hastie loses temper*. That is an important point gained in favour of Hinduism. Mr. Hastie attacks, without provocation, the proceedings in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the nation. And all this without the slightest provo-

cation, and from no other motive than a somewhat overflowing zeal in the cause of truth and of religion. And then, when an humble individual of the nation, whose religion he tramples upon, ventures upon a single retort, Mr. Hastie's temper is on fire and it explodes. The combatant who loses his temper in fight, is scarcely believed to be on the winning side. That is the point I score in favour of Hinduism. If this is the attitude which the Christian Missionary of the present day thinks it proper to assume towards Hinduism, Hinduism has nothing to fear from his labours.

"I suggested to Mr. Hastie that before putting himself forward as the assailant of the Hindu religion he should study the Hindu scriptures in the original, and under the guidance of those native scholars who believe in them. That Mr. Hastie does not choose to accept my advice does no harm to me or to my cause. It is no loss to the Hindu religion that its assailants do not choose to be better armed than they are. But beneath Mr. Hastie's scornful rejection of my advice lurk some errors which are not confined to him, but are shared by a large class of Europeans.

"* * * A brief consideration will convince Mr. Hastie and others who think with him, that no translation from the Sanskrit into a European language can truly or even aproximately represent the original. Let the translator be the profoundest scholar in the world—let the translation be the most accurate that language can make it, still the translation will be, for practical purposes, very wide. The reason is obvious. You can translate a word by a word, but behind the word there is an idea, the thing which the word denotes, and this idea you can not translate, if it does not exist among the people in whose language you are translating.

* * *

"And who is best qualified to expound the ideas and conceptions which can not be translated—the foreigner who has nothing corresponding to them in the whole range of his thoughts and

experiences, or the native who was nurtured in them from his infancy? If obviously the latter, what is the meaning of this towering indignation at my suggestion that Mr. Hastie should resort to the latter for instruction? I added that he should take his lessons not merely from a Brahmin but from a Brahmin who *believes* in them. * * * If Mr. Hastie thinks that he can comprehend the vast complicated labyrinth of Hindu religious belief without studying it in the original sources of knowledge, and in a spirit of patient, earnest, and reverential search after truth, he will meet with bitter disappointment. He will fail in arriving at a correct comprehension of Hinduism, as—I say it most emphatically—*as every other European who has made the attempt has failed.* And if he thinks that his eloquence alone will enable him to demolish the oldest and the most enduring of all religious systems without a correct knowledge of its doctrines—why, I can only wish for an Indian Cervantes to record his achievments.

Mr. Hastie has unnecessarily complicated the question by his protest on behalf of European Sanskritists. No one questions their *scholarship*. I can assure him that men like Max Muller and Goldstucker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr. Hastie. I yield to none in my profound respect for their learing, their abilitys, and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen recoil in fear and despair. When, however, Mr. Hastie goes on to say that "both the Sanskrit language and Sanskrit literature are much better understood in Europe or America than they are in India," I decline to follow. It is, I believe, one of the most monstrous assertions ever made; but what gives it importance is that not a few Europeans, and possibly some anglicised natives—Hindus I can not call them—who do not mix with their own race, believe it to be true.

* * *

"The fundamental doctrines of the Hindu religion and its vast

details are what no European Scholar is competent to teach. This I did mean to say, and this I again positively assert. I will add, that there are many other things in Indian literature and Indian philosophy—other things than the religious doctrine—which no European scholar understands, and no European scholar is competent to teach."

এ পত্রে এই পর্য্যন্ত লিখিয়া রামচন্দ্র লিখিলেন, "যদি হেষ্টি সাহেব নিতান্তই জেদ করেন তাহা হইলে আমার প্রকৃত নাম শেষপত্রে সন্নিবিষ্ট করিব। আপাততঃ হেষ্টি সাহেবের অবগতির জন্য আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন নগণ্য ব্যক্তি; ইহা দেখিয়া হয় ত তিনি হতাশ হইবেন; কিন্তু সে প্রতিদ্বন্দ্বী যে একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

এই পত্র পড়িয়াই হেষ্টি সাহেব লিখিলেন,

"It was not without a certain "stern joy" that I discovered the valiant Ram Chandra marching out this morning with a long column, to the defence of this ancient windmill; although I must confess, I am deeply dissapointed to find that he is the learned Shevaite priest and protagonist of local Hinduism, that I took him to be, when I singled him out as the strongest of all my assailants for a reply. * *

"But when the mighty Ram Chandra, like a *Deus ex machina* all in the imposing pomp of a new *Avatar,* appeared on the scene, claiming all the wisdom of India for himself, and treating me with such contempt as would have been intolerable to a 'block beetle', I deemed it quite in order to reply to him in somewhat of his own style."

এইরূপ লিখিয়া সাহেব বিশেষভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার কোনরূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। উপরিউক্ত পত্র লিখিবার সময় তাঁহার মনের ভাব এত প্রফুল্ল ছিল যে, সে রকম প্রফুল্লতা কদাচিৎ তিনি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়াই আবার লিখিলেন,—

"In my own confidential circle, his lucubrations are giving immense amusement, and riddle or conundrum; the more he writes on the subject of my challange, the more he will amuse us."

এইবার রামচন্দ্র একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। পত্রখানি গভীর গবেষণাপূর্ণ। প্রয়োজনীয় কোন অংশ আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে যে অংশ নিতান্ত

নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলাম, তাহাই পরিত্যাগ করিলাম

No. III. (Ram Chandra's)

"I am sorry to have again kept Mr. Hastie and his "confidential circle" waiting for the promised amusement, but a Brahman's proper occupation during Pujas is feasting, not controversy. Advised by Mr. Hastie that religious discussions contribute so abundantly to clerical mirth, I now hasten to treat him to a rather large measure of that commodity.

"Your readers may consider it somewhat superfluous that anybody should undertake to prove that those who profess a religion understand its doctrines better than those who do not profess it. I must do Mr. Hastie the justice to say that he has nowhere distinctly denied this. It is, however, really the absurd position Mr. Hastie has taken up. It is the logical outcome of that monstrous claim to omniscience, which certain European—an extremely limited number happily—put forward for themselves. No knowledge is to them true knowledge unless it has passed through the seive of European criticism. All coins is false coin unless it bears the stamp of Western mint. Existence is possible to nothing which is hid from their searching vision. Truth is not truth, but noisome error and rank falsehood, if it presumes to exist outside the pale of European cognizance."

ইহা বলিয়া রামচন্দ্র একটি গল্পের অবতারণা করিলেন। গল্পটি দেশপ্রসিদ্ধ; একজন জাহাজী গোরা পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া জনৈক ভারতবাসীর নিকট কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিল। দেশবাসী তাহাকে একটি নারিকেল দিয়া কি রূপে তাহা খাইতে হয় উপদেশ দিল। ক্ষুধার্ত্ত নাবিক পূর্ব্বে কখন নারিকেল দেখে নাই; সে দাঁত দিয়া ছোবড়া ছাড়াইয়া চিবাইতে লাগিল। ছোবড়ার স্বাদ সে পছন্দ করিল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া নারিকেল ছুঁড়িয়া দাতার মাথায় মারিল।

এই গল্পের অবতারণা করিয়া রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন যে,—

"The sailor carried away with him an opinion of Indian fruits parallel to that of Mr. Hastie and others, who merely bite at the husk of Sanskrit learning, but do not know their way to kernel within."

* * * *

"Let us lay aside all general reasoning, and come to a circumstance peculiar to India, which alone is of sufficient weight to decide the case in my favour. I refer to the existence, unheeeded by or unknown to, the European, of a vast mass of *traditionary and unwritten knowledge in India,* used to supplement, illustrate, or explain the written literature. It is generally understood now that even before the art of writing was known in India, there was already a bulky literature which had to be handed down from teacher to pupil by word of mouth. * Knowledge in India thus come to be in part recorded in a written literature, and in part handed down as unwritten and traditional. All who studied under the older generation of *Bhattacharjyas* of the *Tols* know, as I have the good fortune to know, that of the wealth of learning which flowed from their lips much had no record except in the memory of the professors. This was specially the case with artistic and scientific knowledge, where another motive—professional jealousy—came into play. Each discoverer, anxious to confine to himself and his own circle the discovery at which he had arrived, never trusted it to writing and satisfied himself with communicating it to his pupil in confidence. To this jealousy we owe that India has now utterly lost so many of her ancient sciences. Medical science is a conspicuous instance; and the native physician, trained in European schools, still fails to wrest from the jealously of the *Kabiraj* treasures of knowledge which both regard as invaluable. Now all this unwritten traditional knowledge, which is flesh and blood to the dry bones of the written literature, is wholly unavailable to the European scholar. The dry bone rattle in his hand and as he knows how to rattle them well, they make a thundering noise in the ears of the

civilised world. But the breathing form of old learning and the old civilisation is visible to native eyes only.

"I have no hesitation in admitting the decided superiority of the European enquirer in the fields of Vedic literature. To the Indian student Vedas are dead ; he pays to them the same veneration which he pays to his dead ancestors, but he does not think that he has any further concern with them. They do not represent living religion of India, and the only interest that can be felt in them by any human being is merely the historical interest. That is all in all to the accomplished European scholar, but of little moment to the native student who has never displayed any gifts for history. This accounts not only for the superior Vedic learning of the European, but also for the far superior value of his contributions to Indian and Aryan history. In all other departments of learning there can be no comparison between the profound but unostentatious learning of the Pundit of the *Tols* with the shallow but showy acquisitions of the Eurepean professors. The rich and varied field of Indian Philosophy the latter has trod but with a light step. Into the subtle and profound Nyaya philosophy of the Bengal school, into that which formed the field on which Raghunath, Gadadhara, Jagadisa won their great and lasting triumphs of intellect, the pride and glory of the Bengali race, he has not obtained a glimpse. Of the great Vaishnava philosophy first formulated in that book of books—the Bhagavata Purana—and developed by a succession of brilliant thinkers,—from Ramanuja to Jiva Goswami, he has no adequate conception. Nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of Tantra literature the European knows next to nothing. The secular poetry of Ancient India he has studied, translated and commented upon, but has failed to comprehend. A single hour of study of the Sakuntala by a Bengali writer, Babu Chandra Nath Bose, is worth all that Europe had to say on Kalidasa, not excepting even Goethe's well known eulogy. Hindu law, the *Smriti*, is still the almost exclusive

study of the Hindus themselves. The legends of the Hindu faith, which are to the European inexpressibly silly, he has hitherto honoured only with his laughter; to the loving study of the author of *Pushpanjali* (also a Bengali writer, Babu Bhudev Mukherji) they have yielded results not surpassed in loftiness and splendour by anything in Furopean literature. And I might go on with this enumeration for columns together, but this ought to be enough.

"I have been somewhat taken by surprise to find in Mr. Hastie's letter that the he expects to find in this letter of mine such "explanation and defence" of Hinduism as I may be able to offer. He forgets that that the issues between us exclude the larger question of the merits of Hinduism, and that in my very first letter I told him that no controversy was possible with him at present, because he did not possess the necessary qualifications.

"Hinduism does not consider itself placed on its defence. In the language of lawyers, there is not yet a properly framed charge against it. And at the bar of Christianity, which itself has to maintain a hard struggle for existence in its own home. Hinduism also pleads want of jurisdiction. But I admit Mr. Hastie's right to demand an exposition of their view from those who do not accept his own. * * *

"Hinduism, like every other fully developed religious system, consists of, *Firstly*, a doctrinal basis or the creed; *Secondly*, a worship or rites; and *Lastly*, of a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis. This is the whole field of study; but let it be well surveyed. The doctrinal basis will be found to consest in (*1*) *dogmas* formulated, explained and illustrated in a mass of philosophical literature; and *(2)* legends, which from the legitimate subject of the Puranas, though these encyclopædic productions contain many things other than the legends. The value of the legends is inferior to that of the philosophy in the depths of which are laid broad and solid, the foundations of modern Hinduism. The whole of Hindoo religious

philosophy is probably post Vedic, and serves to mark the era of separation between the ancient and modern religions of India. Each modern Hindu sect has now its own system of philosophy, but the more general conclusion of philosophy are common to all ; and among all the dogmas, there is one in particular which has had more influence in shaping the destinies of India than any other. Kapila had the glory of first announcing it to the world, and the philosophy of Europe and Asia has not up to this day alighted upon a discovery grander or more fundamental than the profound distinction first made by him between matter and soul—between *purusha* and *Prakriti.* In the hand of the eclectis, who are the real fathers of modern Hinduism, this great conception has taken its place is the backbone of their fabric. It runs through the whole world of Hindoo thought, shaping the legends, prescribing the rites, and running through even the secular literature. So long as the student of Hinduism keeps this great idea before him, he will find Hinduism a living organism which has *grown*, and not a collection of formulæ lumped together by finest craft.

Prakriti, property translated is Nature. Modern science has shown what the Hindus always knew that the phenomena of nature are simply the manifestation of *Force.* They worship, therefore, Nature as *Force. Shakti* literally and ordinarily means force or energy. As destructive energy, force is *Kali*, hideous and terrible, because destruction is hideous and terrible. As constructive energy, force is the bright and resplendent *Durga.* The universal soul is also worshipped, but in three distinct aspects, corresponding to the three qualities ascribed to it by Hindu philosophy. These are known in English translations as Goodness, Passion, and Darkness. I translate them as Love, Power and Justice. Love creates, Power preserves, Justice dooms. This is the Hindu idea of Brahma, Vishnu and Siva. I cannot stop to discuss the relation of these gods to their Vedic predecessor of the same names. The new religion grew out of the old,

those timehonoured names were retained, but were grouped under new ideas. The citadel had been stormed and battered down by the Buddhists and the philosophers themselves ; and had to be reconstructed out of the old materials, but on new and more solid foundations. Pantheism and Polytheism, philosophy and mysticism all lent a hand ; and out of this bold electicism rose the beautiful religion which I do not believe to be of Divine origin but which I accept as the perfection of human wisdom.

The great Duality—Nature and Soul—presides over all. Let us now see how the same great conception shapes the Legends. It will be enough to take for the purpose the legends of Krishna, because they are the most important, but I have time only for the briefest explanation. Krishna is Soul, Radha is Nature. The Sankhya philosophy—the school to which the great conception of Nature and Soul originally belongs but which in spite of its wealth of thougnt, is a gloomy pessimism had laid down that supreme human bliss consisted in the dissociation of Soul from nature. It had pronounced their connexion illegitimate ; and the legend of Radha and Krishna retains the illegitimate connexion. Nevertheless, the Hindu worship this illicit union. He worships them because with a truer insight than is given to a morose philosopher, he has perceived that in this Union of the Soul with Nature lies the source of all beauty, all truth, and love. And this magnificent legend, the basis of the Hindu religion, of *love for all that exists*, is treated by its European critics as the grossest and most revolting story of crime ever invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe.

"I will next add an illustration to show how the same great conception runs through even the secular literature of ancient India. The Kumara Sambhava, the noblest philosophical poem to be found in any language, but, I regret to say, one of the least understood both in India and Europe, celebrates the Marriage of Nature with Soul, typified in Uma and Siva. In the hands of the great poet, the union is a legitimate one—a holy marriage. The

poet could soar above both Philosopher and Puranist. I regret I have not space to explain or to do justice to Kalidasa's magnificent conception; the yearning of the physical and human for the moral and the divine, and the accomplishment of their union after purification through the sacrifice of earthly desires and the discipline of the heart. In that sacrifice, and in that discipline is to be found the poet's refutation of the philosopher. The sacrifice, the destruction of Kama, is narrated in a wellknown passage, which still remains the loftiest in all Indian literature, and is unrivalled by any I have come across in the poetry of any other nations.

"I now pass on to the worship. Much of the Hindu ritual is mummery, admitted to be so by even the priests, and rejected with deserved contempt by educated Hindus. Mr. Hastie finds out, I hope, that the Hindu Idolatry, which is generally treated by the Christian Missionary as covering the whole field of Hinduism, is really a small fraction of it and comes under consideration as a subordinate part of this second division of our subject. Mr. Hastie will probably be startled to hear that idolatry, though a part of Hinduism, is not an essential part even of the popular worship. Idol worship is permitted, is even belauded in the Hindu scriptures but it is not enjoined as *compulsory*. The daily worship of the Hindu—his Sandhya—his Ahnika—is not idolatrous The orthodax Brahman is bound to worship Vishnu and Shiva every day, but he is not bound to worship their images. He may worship images if he choose, but if he does not so choose, the worship of the Invisible is accepted as sufficient. The majority of Brahmans, I believe, do not in the daily rites go beyond this worship of the Invisible and the Unrepresented. A man may never have entered a temple and yet be an orthodox Hindu.

"And I must ask the student of Hinduism when he comes to study Hindu Idolatry to forget the nonsense about dolls given to children. I decline to subscribe to what is simply childish,

even though the authority produced is titled authority with a venerable look. The true explanation consists in the ever true relations of the Subjective Ideal to its Objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in Beauty, in Power, and in Purity, must find an expression on the world of Real. Hence proceed all poetry, and all art. Exactly in the same way the Ideal of the Divine in Man receives a form from him, and the form an Image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of the story Prometheus. The *Religious* worship of idols is as justifiable as the *Intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is Admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is Worship.

"Nor must the student fall into the error of thinking that the image is ever taken to be the God. The God is always believed, by every worshipper, to exist apart from the image. The image is simply the visible and accessible medium through which I choose to send my homage to the throne of the Invisible and Inaccessible. Images of gods have in themselves no sanctity. They are daily sold in the bazaars as toys The very images worshipped are made by impure workmen, sold in the bazaars, and are treated on exactly the same footing as other shopkeeper's wares. They do not acquire any sanctity till the *Prana Prathistha*, i.e. till I consent to worship it. The image is holy, not because the worshipper believes it to be his god—he believes in no such thing—but because he has made a compact with his own heart *for the sake of culture and discipline* to treat it as God's image. Like other contracts, this one, with the worshipper's own heart, he may terminate at his pleasure. When he terminates it, he ceases to worship the image and throws it away, as we have just thrown away by thousands, the images of Durga. He could not do this if for a moment he believed it to be his God.

"Our idols are hideous, say they. True, we wait for our

sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay, because India has produced no sculptors. The images we worship in Bengal are, as works of art, a disgrace to the nation. Wealthy Hindus should get their Krishna and Radha made in Europe.

"We come last of all to the ethics of the Hindu religion. Like all other complete codes of morality, the Hindu ethical system seeks to regulate the conduct of individuals, as well as the conduct of society. It is a System of Ethics as well as a Polity. The code of personal morality is as beautiful, if not more so, as any other in the world, not excepting the Christian ; a degree of excellence which the Christian accounts for by supposing, like Mr. Hastie, that it must have been derived from Christian sources, very much after the logic of a little fellow I know, who insists that every man who drives in a carriage is his grandsire, on the ground that his grandsire drives in a carriage. The Social Polity is even more wonderful. It is the only system which has even succeeded in substituting the government of moral Power in the place of that of physical Power. It is the only system which has abolished War and the military Power.

"If the profoundest European thinker of the nineteenth century had any acquaintance with India he might have known that his dream of a Positive Polity and an Intellectual Hierarchy had, thousands of years ago, been thought out and realised with a success transcending all his anticipations.

"Here, too, however, the student must distinguish between the Essentials of Hinduism and its Non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure Ethics, and not Religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. There have been and there still are many Hindu sects who discard caste distinctions. The Chaitanyaite Vaishnavas furnish an instance in point.

"Mr. Hastie may turn round upon me here and say, 'You strip

Hinduism of its rites, its idolatry, its caste; what do you hent leave it?'—I leave *the kernel without the husk*.

"I have done. I hope Mr. Hastie now understands how I dispose of his challenge. The modern Ram Chandra turns away from the Western Janaka's bow without touching it even with the tip of his little finger. For, alas! the new Janaka has no Janaki to offer as the prize. Truth, the Janaki he seeks to win, must be wooed in another fashion. Methods of disputation which find favour among pugnacious schoolboys gathered at a wedding feast are as unworthy of Mr. Hastie as they are of me. But if confession from me of inferiority to Western Scholars in Vedic learning will bring any comfort to Mr. Hastie, he will see that I have already made such confession on behalf of my countryman, and I even more readily make it on my own behalf. I make no pretension to scholarship of any kind.

"I have to thank Mr. Hastie for his very kind offer to procure for my lucubrations the recognition of the great Sanskritists of Europe. I assure Mr. Hastie that he has mistaken his man. Happy that such recognition is already the fortunate lot of certain *distinguished* countrymen of mine, whom I somewhat reluctantly spare the humiliation of being mentioned by name in this connection. I hasten to assert Mr. Hastie that I am not ambitious of honours which I do not deserve and may not prize. As my card is already at Mr. Hastie's disposal, I may presume to tell him that the approbation of a whole people has consoled me during a quarter of a century, and may console me still, for the absence of laurels which more fitly grace the heads that wear them now. If Mr. Hastie knows anything of Hinduism, he knows that the Hindu places the wreath round the full, not round the empty vessel. I am sorry to have to say this, but Mr. Hastie's pointless jest carries an insinuation which can be met only in this way.

"In conclusion I have to thank you for allowing me the very unreasonable extent of space which I have taken up. I have also to express my deep commiseration for Mr. Hastie's bitter disapp-

ointment in finding that Ram Chandra was not the very great man from whose encounter he had expected to add fresh lustre to his rusty arms. There is, however, nothing like hope. Let him cheer up. A louder and shriller blast at the castle-gate of Hinduism may yet procure him the honour of an encounter with even—aye, even with the windmills."

পত্রখানা পড়িয়া হেষ্টি সাহেব যেন কিছু অধীর হইযা পড়িলেন। তিনি লিখিলেন ;—

"If this shallow verbosity, this inconsistent farrago of phrase, this total irrelevance of reasoning, utter ignorance of even the rudiments of Hindu mythology and philosophy, is to be taken as the highest exposition of religion of the educated Hindu, then tell it not in Europe, publish it not in America, but let more earnest men try to give it the 'happy dispatch' as soon as possible. It will surprise me if the more learned representatives of Hinduism —for there are such—do not publicly repudiate Ram Chandra as an unbidden intruder into this controversy, and as no chosen champion of theirs. They will say that, if he is any thing, he is a romancer, and not a reasoner ; an Anglicist and not a Sanskritist ; an apostate and not an apologist , a poetaster and not a critic. Had the abler men whom he name—Dr. Rajendra Lala Mitra or Babu Bhudeb Mookherjee—come to the rescue, they would not have written better English ; but they would have been more cautious, more correct and less vulnerable in their utterances and theories."

এইরূপ অনেক কথা লিখিয়া হেষ্টি সাহেব পত্রখানা শেষ করিলেন।

পরদিন হেষ্টি সাহেব আবার একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। সে পত্রখানায় বেদ ও তন্ত্র লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। দুই দিন যাইতে না যাইতে আবার একখানি পত্র লিখিলেন, এই তৃতীয় পত্র ইংরাজি সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। এই পত্রে তিনি সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল—পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

"রামচন্দ্র" কপিলকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া বলিয়াছিলেন, "জগতের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন।" হেষ্টি সাহেব সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আরিস্টটল্ ভারতে দর্শনশাস্ত্র আনিবার অনেক পরে কপিল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" অবশ্য কপিল কোন্ সময়ে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কেহ আজও স্থির করিতে পারেন নাই।

একস্থানে হেষ্টি সাহেব বলিলেন,—

"Hinduism *has only a rotten husk and not kernel.* It is *full of Nothingness* says Kapila, and all the rest of them except Ram Chandra. It is vain to try to put life or light or love into its 'eyeless socket' again, or to attempt to cover its 'rattling bones' with the semblance of new 'flesh and blood.' Not a breath of real spiritual life stirs in the bare shaking skeleton, and we can now look it through and through."

এইরূপে হেষ্টি সাহেব তাঁহার শেষ পত্র সমাপ্ত করিলেন। "রামচন্দ্র" এ পত্রেরও কোন উত্তর দিলেন না। নয় দিন পরে রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জি—হেষ্টি সাহেবের অনুরোধে হউক্ বা যে কোন কারণেই হউক্—আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"You can easily understand that having spent a whole life on the consideration of the mutual bearing of Christianity and Hinduism on the question of the regeneration of India, I could not have read, without deep interest, the last controversy between Mr. Hastie and our distinguished and accomplished countryman, who appeared under the assumed name of 'Ram Chandra.'

* * * *

"Ram Chandra has called the idolatrous rites and ceremonies of Hinduism its *husks,* not its *kernel.* If Ram Chandra's view of Hinduism be right, then, on his own theory Mr. Hastie could not be wrong in condemning and denouncing those persons who were inflicting serious injury, from a moral point of view, on their hosts and neighbours by encouraging *husk-chewing.*

"As to the view of Hunduism which Ram Chandra has propounded, I am obliged to confess to a sad feeling of disappointment. Whatever the pen of the author of 'Kapalakundala' offers to the public, is entitled to our patient attention. But what can be more startling ; what more gailing to our national pride ; what more opposed to our early intuitions, and our unwritten traditions of past ages, than the unequivocal denial of the Vedas ('which are dead !') as the authoritative basis of Hinduism.

This denial flatly contradicts Manu and all the authors of our sacred literature; nay, pours contempt on the whole civilised world.

"It is difficult to say what your correspondent's idea of Hindu *philosophy* is. He has certainly extolled the Sankhya and the Nyaya. But Kapila could not allow the creative agency of *Purusha*, and the *Nyaya* could never be so disloyal to its Atoms as to allow any place for *Prakriti*.

"Ram Chandra tells us that 'nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the *Tantras* and of *Tantra* literature the European knows next to nothing.' If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten* traditions, is the general basis of the Hindu religion, and, consistently enough, he maintains that the Hindu worships the 'illicit union' between Purusha and Prakriti, retained in the 'illegitimate connection of Krishna and Radha As a reader of Kapalkundala, I am amazed at such statements.

"I believe there are many Hindus who, inclining to the Vedanta, and looking for the *Mukti* which it promises, have nothing to say to Prakriti, of which even those who do speak of Purusha and Prakriti, the vast majority is innocent of the worship of any 'illicit union.' If there be worshippers and imitators of 'illicit union', they must chiefly be in circles of Mohunts and recluse hermits, whether of the Vaishnava or Sakteya sects. Householders, men of repute in society, the better classes of the Hindu community, cannot and could not be included in such secret circles. It would be a cruel defamation to Hindu families to attribute to them belief in the system elaborated by Ram Chandra from Tantric sources. The followers of Nyaya, Vedanta and Sankhya philosophies would repudiate such an abuse of the ideas of Purusha and Prakriti, and the best-practical *expose* of the illicit union is contained in that great Bengali romance, the Kapalakundala. The great Tantric hero of that inimitable novel is Kapalica, a representative worshipper of Bhavani and Bhairavi, as

personations of Sakti or Prakriti.

* * * *

"What, then, it may be asked, is the general religion of the Hindus? I can only answer the question by the help of our past written literature, including the "*dead Vedas.*" No Hinduism can be found anywhere that will correspond to every age and epoch in the history of the Hindus. I think it has passed through four stages from the commencement, and without further preface I will at once say a few words on its passages through those stages.

"I. The first or primitive stage of Hinduism is marked by the celebration of sacrificial rites, as figures or images of Prajapati, the Lord of Creation, who 'had offered himself a sacrifice for emancipated souls' *(Satapatha Brahmana)*. The same Prajapati is elsewhere described as the Purusha, 'begotten from the beginning', whom 'the Gods sacrificed on the sacred grass.'

"II. The second stage was characterized by a change from the monotheistic to the dualistic in doctrine but the practice of sacrifices continued as before. A declension in doctrine rapidly followed. The self-offering of Prajapati was forgotten, and the significance of sacrifice as a figure of Prajapati was lost

"III. At this stage it was that philosophy began to influence the creeds of India. The Nyaya while it contended for Brahminical supremacy, generally adopted the grounds on which Buddhism had based its doctrine of Renunciation and Nirvans. The Nyaya did not follow the principles of Shakya Singha in his description of world as a *Maya* or *Mirage* but it proclaimed the doctrine of *Mukti* as the final consummation of Hinduism. The Sankhya, with greater Buddhistic tendency denied the existence of an intelligent Creator, and pointed to a final consumption not unlike that of Buddhism. The Vedanta, though decidely an advocate for the Veda and the dignity of the Bramhinhood, yet inculcated the idea of a final absorption in Brahma, waich is also called Nirvana.

"IV. In this stage Krishna was invested with supreme divinity, at the head of the Pantheon, not however, without occesional

conflicts with Shiva, who aspired ofter the same dignity.

"The Brahmin is still bound to daily repetitions of the Gayatri and Sandhya, the former being a Vedic verse, the latter a collection of Vedic passages, but neither are in any way connected with the Tantras. He is also bound to the worship of Vishnu and Shiva, without any reference to Purusha or Prakriti."

এই পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু সকল কথার উত্তর দিলেন না; মাত্র তন্ত্রের কথা তুলিয়া যা' কিছু বলিলেন। পত্র খানা আগাগোড়া তুলিয়া দিলাম।

No. IV. (Ram Chandra's)

"I have no wish to re-open the controversy I have closed, but allow me to remove a misconception—a most painful one, as your readers will see.

"Dr. K. M. Banerjee writes :—"Ram Chandra tells us that 'nothing has so largely influenced the face of some of the Indian peoples as the *Tantras*, and of *Tantra* literature the European knows next to nothing.' If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten traditions*, is the general basis of Hinduism."

"That certainly is *not* the meaning, and I have not understood how such an interpretation has been arrived at. There may be opinions which influence the destinies of nations, without being the base of national religion. The paganism of Greece has largely moulded, in some of its aspects at least, the civilisation of modern Europe; but the paganism of ancient Greece is not the general basis of Christianity. Islamism has very greatly influenced the destinies of India, without being the general basis of Hinduism. Christianity at this day largely influences the destinies of India, yet Christianity is not the general basis of Hinduism.

"What the influence of Tantrikism has been on the people of Bengal, of Assam, and of Orissa, I do not propose to discuss here. I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in *Kapal Kundala* in regard to the morality of that form of Hinduism. True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness, and I say with as much sincerity as he does, that let it never be assumed that Tantrikism is the general religion of the Hindus; no one, I believe, has ever thought of making such an assumption.

"Let Tantrikism perish—but let it not perish unstudied. The study of the darkest errors of humanity yields lesson as valuable as that of truth itself. And what is history, if it is not the history of human errors.

"When Mr. Hastie talked of the 'Tantric Bible' and such other nonsense, I did not consider it necessary to make a reply; he had shown himself not to be entitled to any. It is different when Dr. Banerjee misconceives my meaning. I respect him too highly to remain silent.

"As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my own.

November 18, 1882. Bankim Chandra Chatterjee."

এইখানেই এই প্রসিদ্ধ মসীযুদ্ধের অবসান হইল।

লেখকত্রয়ের কেহই বাঙ্গালা দেশে অপরিচিত নহেন। তাঁহাদের গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম তাঁহারা কি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন? মনুষ্যলোকে কয়জন তাহা পারিয়াছেন জানি না। তবে এ তর্ক কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা আমাদের তেমন মনঃপূত হয় নাই। হেষ্টি সাহেব বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের ঠাকুর গুলার মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; বিলোলরসনা নৃমুণ্ডমালিনী কালীর প্রতিমা, বা হস্তিতুণ্ড গণেশমূর্ত্তি দেখিলে উপাসকের মনে কখনও ভক্তির উদয় হইতে পারে না। হেষ্টি সাহেবের মতে এ সব মূর্ত্তি অতি বীভৎসদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র কথাটার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সত্য বটে, আমাদের প্রতিমানিচয় বীভৎসদর্শন, কিন্তু সে দোষ হিন্দুধর্ম্মের নয়—দোষ হিন্দু-কারিগরের। বাঙ্গালায় যে

সকল প্রতিমা নির্ম্মিত হয়, তাহা বাঙ্গালাকারিগরের কলঙ্কস্বরূপ। ধনবান্ হিন্দুদের উচিত, কৃষ্ণ ও রাধার মূর্ত্তি ইউরোপ হইতে প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করা।"

উত্তরটা আমাদের মনে তেমন লাগিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যদি বুঝাইয়া বলিতেন, কালীমূর্ত্তির এরূপ ভীষণতা, গণেশের হস্তিতুণ্ড প্রভৃতির অস্বাভাবিকত্ব কল্পনা করিবার হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, তাহা হইলে আমাদের কোন আক্ষেপ থাকিত না। আমরা যদি ক্রুসকাষ্ঠকে বীভৎসদর্শন বলি, তাহা হইলে কোনও পাদরী বোধ হয় উত্তর দিবেন না, ক্রুসকাষ্ঠ ভাল কারিগরের হাতে পড়িলে তার ভীষণতা আর থাকিবে না; তিনি আমাকে ক্রুসকাষ্ঠ কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবেন। যতক্ষণ না তাহা বুঝাইয়া দেন, ততক্ষণ আমি ক্রুসকে অর্থহীন কাষ্ঠখণ্ড বই আর কিছু মনে করিব না। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র যদি গণেশ ও কালীমূর্ত্তির গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব হেষ্টি সাহেবকে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে কাহারও কোন দুঃখ থাকিত না। যাহা হউক এ সকল বড় কথা আলোচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই—শক্তিও নাই।

হেষ্টি সাহেব বা ব্যানার্জ্জি সাহেবের পত্র সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। একজন খৃষ্টান, অপরব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মত্যাগী।

বৈদিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটী প্রবন্ধ ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউট মন্দিরে পাঠ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। তাহার নাম দিয়াছিলেন, "Vedic Literature." বর্ত্তমান প্রবন্ধ উক্ত Vedic Literatureর সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ।—

সরকারি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি টোল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম যে, বিস্তীর্ণ কলিকাতা নগরী মধ্যে একটী মাত্র চতুষ্পাঠী আছে, (*) আর সেই চতুষ্পাঠীতে নয়টি মাত্র ছাত্র ** বেদশিক্ষা করিতেছে। বৈদিক সাহিত্য অনুশীলন পথে

* বেদাচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের চতুষ্পাঠী।

** (ক) শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর গুরুদাসের পুত্র)।
(খ) শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য্য (সামশ্রমীর ভ্রাতা)।
(গ) শ্রীহিতব্রত (পরে সামকণ্ঠ, সামশ্রমীর পুত্র)।
(ঘ) শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর গুরুদাসের পুরোহিত-পুত্র)।
(ঙ) ৺উপেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা চড়কডাঙ্গার জমীদার)।
(চ) শ্রীশিবধন ভট্টাচার্য্য (এক্ষণে বিদ্যার্ণব)।
(ছ) শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যারত্ন)।
(জ) শ্রীদুর্গাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের পুত্র)।
(ঝ) শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, (বিদ্যাবাচস্পতি, বিল্বপুষ্করিণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত)।

অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। সে সকল প্রতিবন্ধক ইউরোপভূমে নাই; সুতরাং সেখানে আমাদের দেশ অপেক্ষা বৈদিক সাহিত্যচর্চ্চা অধিক পরিমাণে হইতেছে।

বেদ আমাদের ধর্ম্মের, আমাদের সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। বৃক্ষমূলের সহিত বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের সেই সম্বন্ধ। বেদ একদিনে বা এক সময়ে সৃষ্ট হয় নাই,—শত শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসরে সৃষ্ট হইয়াছিল।

বেদ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গুরু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন; ছাত্র আবার গুরু হইয়া তাঁহার ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে লোকমুখে বেদশিক্ষা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, লোকে এই কারণে তখন বেদকে শ্রুতি বলিত। কতকাল ধরিয়া লোকমুখে বেদশিক্ষা চলিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। তার পর—তার কতকাল পরে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব * বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই চারিভাগের নাম,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। এক ভাগের সহিত অপর ভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে কোনও বেদোক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করিতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই সামবেদের অনুবর্ত্তী। আবার যাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

চারিটি বেদের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অথর্ব্ব বেদের কথা পূর্ব্বাপর সাহিত্যে উল্লিখিত হয় নাই। অন্যান্য বেদের পর অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিম্বদন্তী আছে যে, আঙ্গির বংশীয় অথর্ব্ব ঋষির দ্বারা এই বেদ সঙ্কলিত হয়। ঋচ অর্থাৎ ঋক্ অর্থে পদ্য, যজুঃ অর্থে গদ্য, আর সাম অর্থে গান। যজুর্ব্বেদের সহিত অন্য দুই বেদের আরও কিছু পার্থক্য আছে। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ যজুর্ব্বেদের মতানুসারেই পরিচালিত হয়। এই টুকুই যজুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

আজিকার দিনে কোনও ক্রিয়া-কলাপ করিতে হইলে আমরা সচরাচর একজন পুরোহিত বা দুইজন পুরোহিতের দ্বারা কার্য্য সমাধা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কোনও বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে ষোলজন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত। এই ষোলজনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া হোত্রী, অধ্বর্য্যু, উদ্গাত্রী ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত করা হইত। অধ্বর্য্যুরা যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রানুসারে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন, উদ্গাত্রীরা সাম গান করিতেন, আর ব্রহ্মারা সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ও ত্রুটি হইলে সংশোধন করিয়া লইতেন।

অথর্ব্ব বেদের সহিত অন্য কোন বেদের সম্বন্ধ নাই **। কোনও যাগ যজ্ঞ করিতে

* বেদের বিভাগকার্য্য অথর্ব্বাঋষির দ্বারা হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাঁহাকে বেদব্যাস বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তিনি দ্বৈপায়ন নহেন।—শ

** মূলে একটু সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে বেদ এক ছিল। বেদব্যাস অথর্ব্বা ঋষি বেদের ঋক, যজুঃ ও সাম অংশ পৃথক্ করিয়া লইবার পরও কিয়দংশ অবশিষ্ট ছিল। সেই অবশিষ্টাংশ অথর্ব্ব বেদ নামে পরিচিত। সবই এক গাছের ফল; বাছাই ঝাড়াই হইয়া যাহা থাকিল, তাহাই অথর্ব্ব বেদ।—শ

হইলে অন্য কোন বেদের সাহায্য না লইয়া এক অথর্ব্ব বেদানুসারে যজ্ঞ সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্দর্ভ আছে। অংশ বিশেষে মন্ত্রাদি আছে—কোন অংশকে ব্রাহ্মণা, কোন অংশকে উপনিষদ, আবার কোন অংশকে আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়।

যে অংশে মন্ত্র আছে, সে অংশ সংহিতা নামে আখ্যাত হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, সংহিতা-অংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু এ মতের পোষকার্থ বিশেষ কোনও প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন নাই।

মন্ত্রগুলি সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সূক্ত এক একটী স্তোত্র। য়ুরোপীয়গণ বর্ত্তমান কালে এই সকল সূক্তের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন যে, এই স্তোত্র, প্রকৃতির উদ্দেশে অনেকেশ্বরবাদী জাতি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। হিন্দুরা যাস্কর সময় হইতে বলিয়া আসিতেছেন, সূক্তে বহু ঈশ্বর উপাসনার কোনও উল্লেখ নাই; তাহাতে শুধু ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পিতার যশোগান আছে। ঋগ্বেদ হইতেও শত শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, সূক্তের উদ্দেশ্য একেশ্বরবাদ।

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সূক্তের বহু-সংখ্যক শ্লোক একেশ্বরবাদের সমর্থন করিতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এই সকল শ্লোক পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়াছে। ইহা অনুমান করা হয় যে, আদিম জাতিরা অনেকেশ্বরবাদী ছিল; আর পরবর্ত্তী সভ্য জাতি সম্বন্ধে বলিযাছেন, তাহারা একেশ্বরবাদী থাকাই সম্ভব। তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হ'ন যে, জুডিয়াবাসী ইহুদীরা পুরাকালে যখন অসভ্য ও বর্ব্বর ছিল, তখনও তাহারা একেশ্বরবাদী ছিল; অপরপক্ষে মহাসভ্য গ্রীকেরা অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন।

সূক্তের কতকগুলি শ্লোক স্তোত্রই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা স্বামী স্ত্রী—পুরুরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন মাত্র। দশম মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত, জুয়ারীর পাশার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা স্তোত্র নয়—জুয়ারীর আক্ষেপ মাত্র। ১০৭ ও ১১৭ সূক্ত স্তোত্র নয়—পরপ্রীতি ও স্বাধীনতার গুণকীর্ত্তন মাত্র। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, অনেক সূক্ত আদৌ স্তোত্র নয়—তাহারা কবিতা, গাথা বা কীর্ত্তন মাত্র।

কিন্তু এই সকল সূক্তের—গাথা ও স্তোত্রের—কে প্রণয়ন-কর্ত্তা তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। হিন্দুরা বলেন, সূক্তগুলি অপৌরুষেয়, অর্থাৎ তাহাদের লেখক—দেবতা বা মানুষ—কোনরূপ লেখক নাই। শাস্ত্র বলেন, স্বয়ং ভগবান্ সূক্তের লেখক। এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে, এই সকল সূক্ত অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান; ঋষি কর্ত্তৃক পরে দৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিরা লেখেন নাই—দেখিয়াছেন মাত্র। আবার স্থূল চক্ষে দেখেন নাই—জ্ঞান চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঋষিরা অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছিলেন। সূক্তের স্থানে স্থানেও ঋষিরা

বলিয়া গিয়াছেন যে, সূক্তগুলি ঋষিগণ কর্ত্তৃক রচিত। ডাক্তার মুইর এতদ্‌সম্বন্ধে অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব নৈষ্ঠিক হিন্দুরা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন যে, বেদের সূক্তগুলি মানুষের রচিত।

প্রত্যেক সূক্তের প্রারম্ভে দেবতা, ঋষি ও বিনিয়োগের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিনিয়োগের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। ঋষি হইতেছেন সূক্তের রচয়িতা। যাস্ক বলিয়া গিয়াছেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।"

দেবতা অর্থে অন্যত্র ঈশ্বর হইতে পারে; কিন্তু সূক্তের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পূর্ব্বে জুয়ারীর পাশার উল্লেখ করিয়াছি; এই পাশা অর্থাৎ অক্ষ উক্ত সূক্তের দেবতা। একটি স্তোত্র দুইটি ঘোড়ার উদ্দেশে বলা হইয়াছে; এই ঘোড়া এস্থলে দেবতা। এইরূপে সূক্তের উল্লিখিত বিষয়ই যাস্কের মতে দেবতা; তা সে মানুষই হউক্ বা ভগবান্‌ই হউক্, বা কোন প্রাণহীন অচেতন পদার্থই হউক্।

আমার প্রথম জীবনে একদা প্রাতঃকালে আমি কুতবমিনরের পদতলে দাঁড়াইয়া তাহার দীর্ঘ ছায়া দেখিতেছিলাম। মাঠের উপর বহু দূর-বিস্তৃত ছায়া দেখিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে এই ত্রিশ বৎসর পরে, "I find myself lost in wonder and awe of the all-enveloping shadow that the lofty heights to which the old vedic Rishis ascended, now cast upon our vaunted modern culture." *

হিন্দুর পূজোৎসবের উৎপত্তি-কথা

[গত ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায় এই সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন; বেথুন সোসাইটীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা উহা বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য,

* দ্বিতীয় প্রবন্ধ আর এ স্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম না। যাঁহারা তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত প্রবন্ধ University Magazineএ দেখিতে পাইবেন।

এই প্রবন্ধ পঠিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর তিনমাস পূর্ব্বে ইন্‌ষ্টিটিউট-মন্দিরে একটি সভা হয়। ছোটলাট ইলিয়ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যর গুরুদাস, জষ্টিস আমির আলি প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। বেদীর (Dias) উপর তিন খানি মাত্র আসন ছিল। মধ্যস্থলে ছোটলাট, তাঁহার দক্ষিণে কটন সাহেব, বামে বঙ্কিমচন্দ্র। সভায়—ঠিক স্মরণ নাই—ফাদার লাফোঁর বক্তৃতা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গীত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সন্দর্ভ লিখেন, তখন তিনি যুবক ছিলেন। এই বিষয় লইয়া প্রৌঢ়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, এই হেতু তিনি পরে এই সন্দর্ভের কোন উল্লেখ করেন নাই।]

হিন্দুদিগের পূজা ও উৎসবাদি লইয়া পূর্ব্বে একটু আলোচনা হইয়াছিল বোধ হইতেছে। এই সভার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের বিবরণী-পুস্তকে পাওয়া যায় যে, একবার হিন্দুদিগের উৎসব সকলের পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি লিখিত হইয়াছিল। আমি উহাদের উৎপত্তি বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব।

আমার মনে হয়, হিন্দুদিগের উৎসব সকল এখন যে আকারে প্রচলিত, উহাদেব উৎপত্তি বা প্রথম প্রচলনকালে, সে আকারের ছিল না। আমরা যদি উৎসব সকলের প্রচলন-সূচনা আবিষ্কার করিতে পারি, সমাজের কোন্ অবস্থায় উহাদের কেমন আকার ছিল, তাহার ইতিহাস কথা জানিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের সমাজ কেমন বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, সে তত্ত্বও আমবা অবগত হইতে পারিব। তবে ইহাও ঠিক যে, সকল পূজা-উৎসবাদির এক উৎপত্তি-বিধি নির্দ্দেশ করা এখন সম্ভবপর হইবে না। প্রত্যেক পূজা বা উৎসবের প্রচলনের হেতু স্বতন্ত্র, অন্য সকল পূজা বা উৎসবের প্রচলন-হেতুর সহিত উহার কোনও সামঞ্জস্য নাই। প্রত্যেক উৎসব এক একটা বিশিষ্ট কারণের জন্য প্রচলিত হইয়াছে। সকল উৎসবের উৎপত্তির কারণ এক নহে; সে সকল কাবণের মধ্যে আদৌ কোনও সামঞ্জস্যের ভাব নাই। ফলে এ বিষয়ে আমরা কোনও সাধারণ নিয়মের নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বিশেষতঃ এমনও অনুমান করিতে পারা যায় না যে, অধুনা প্রচলিত সকল উৎসবই হিন্দু-সমাজের আদিম অবস্থায় প্রচলিত হইয়াছে। তবে ইহা নিশ্চিত যে, অনেকগুলি উৎসব অতি পুরাতন, অবশিষ্ট অনেকগুলি অতিশয় আধুনিক।

ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন অনেক উৎসব আছে, যাহা দেবতা-বিশেষের পূজার আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইলেও, মূলে ঋতু-বিশেষের বা প্রাকৃত ঘটনা-বিশেষের সূচকরূপে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। আদৌ ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। উদাহরণস্বরূপ দোলযাত্রার উৎসবের কথা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে দোলযাত্রা এখন তিথি-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পূজামাত্র। পশ্চিম দেশে উহাকে হোলি বলে। এই শব্দটা ইংরাজীতে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না, লিখিতও হয় না। গোড়ায় এই হোলি বা হুলি বসন্ত ঋতুর সমাগমের উৎসব ছিল; উহাকে সংস্কৃতে বসন্তোৎসব বলিত। পরে এই বসন্তোৎসব মদনোৎসবে পরিণত হয়। তখনই উহাতে ধর্ম্মের ভাব অনুস্যূত হয়। মদনোৎসবের অর্থ, প্রেম,—প্রেমের উৎসব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, যে ঋতুতে প্রকৃতি নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, পবিত্র নিরাবিলরূপে ফুটিয়া উঠেন, বরং যে ঋতুতে মানবের মন উন্নত ও শান্তিপ্রদ চিন্তায় মগ্ন থাকিবে,—সেই ঋতুতে ভারতের কবিসকল

ও অধিবাসিবৃন্দ কামের ও প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন কেন! এইভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে বসন্ত ঋতু প্রেম ও কামের সহিত যেন অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। কেবলই কি তাই? যে প্রেম অতি উচ্চ, যাহা আত্মত্যাগের বা আত্ম-বিসর্জ্জনের তুল্য পবিত্র, যাহা মানুষ ও তাহার সঙ্গিনীতে বা অন্য কোনও বিষয়-বিশেষে নিবদ্ধ থাকিলেও মধুর, সে প্রেম বসন্ত ঋতুর বিষয়ীভূত নহে; পরন্তু যে প্রেমে বা কামে মানুষকে পশুতে পরিণত করে, সেই কামই বসন্তঋতুর আয়ত্তীকৃত ব্যাপার। এই ধারণাটা ভারতবাসীর হৃদয়ে এতই দৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, যখন কোনও হিন্দুকবি বসন্ত ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই উহাকে কামজ-প্রেমের ঋতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্য কোনও ভাবের উহাতে আরোপ করিতে পারেন নাই।

পৌরাণিক যুগে ভারতে যে সকল মনস্বী ও মনীষী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই বসন্ত ঋতু বিষয়ে এই ধারণা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এমন কি, ভারতের, কেবল ভারতেরই বা কেন বলি, প্রাচ্য জগতের বাক্যসাহিত্যের অতি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ অংশ, কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কবি সহসা যেন একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছেন—ঐ কামের কথাই বলিয়াছেন। অথচ ঐ কুমারসম্ভবের এক এক অংশে কবির বাক্য এত উচ্চে উঠিয়াছে, গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-ঐশ্বর্য্যে এতটাই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে যে, বুঝি বা ততটা উচ্চতায় জগতের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না, এমন সংশয়ও মনে উদিত হয়। সত্য বটে, বসন্ত-বর্ণনাতে কবি কোমলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, মাধুরী ছড়াইয়াছেন, তাঁহার ভাবকম্পিত অস্বাভাবিকাশক্তি প্রকৃতির নবোন্মেষের সর্ব্বাবয়বে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে—নবসঙ্গবিতা প্রকৃতির সহিত কবি যেন অনুকম্পার ভাবে বিভোর হইয়া আছেন, তথাপি কালিদাসের কুমারসম্ভবের বসন্ত-বর্ণনায় কাম ও প্রেমই প্রধান আসন অধিকার করিয়াছে। এই হেতু বসন্তের উৎসব মদনোৎসবেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রেমের দেবতা মদন; তাই মদন-উৎসবে সর্ব্বপ্রথমে মদনের পূজাই হইত। হলিখেলায় আবীর কুস্কুম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পিচকারীর সাহায্যে আবীরের লাল জল সকলের অঙ্গে দেওয়া হয়। পুরাকালের মদনোৎসবেও এই সকল ব্যবহৃত হইত; রত্নাবলী নাটিকায় মদনোৎসবের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, হুলি মদনোৎসবের আধুনিক পরিণতিমাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণ কবে মদনের স্থান অধিকার করিলেন, এবং হুলী বা মদনোৎসব কখন বঙ্গদেশে দোলযাত্রায় পরিণত হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। পরন্তু যে দেবতা পরে বাঙ্গালার বহুলোকের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, যাঁহার পূজা দেশের আপামর সাধারণের প্রেয় হইয়া উঠিল এবং যাহার ব্রজবিলাসকাহিনী শুনিয়া লোকে বুঝিল যে, মদন অপেক্ষা, তিনিই শিথিল প্রেমের ও উদ্দাম কামের যোগ্যতর দেবতা, তিনিই যে তখন মদন-উৎসব ব্যাপারে মদনকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহারই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

এইবার লক্ষ্মীপূজা ও উৎসবের বিচার করিয়া দেখা যাউক্। লক্ষ্মী বা শ্রী

ঐশ্বর্য্যের বা ধনধান্য-বিভব-বিষয়ের দেবী। পুরাকালে যখন কৃষিকার্য্যই ধনসম্পত্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিল, অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থাসকল লোকে অবগত হয় নাই, তখন লক্ষ্মী বলিলেই লোকে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র মনে করিত। এখন দেখ বৎসরে চারিটা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বৎসরের চারি ঋতুতে চারিটা ফসল হয়, এবং চারিবার লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। প্রথমে শরৎকালে দুর্গোৎসবের পরেই একটি লক্ষ্মীপূজা হয়; ইহার পরই হেমন্তিক ধান্য সুপক্ক হইতে থাকে। দ্বিতীয় লক্ষ্মীপূজা পৌষমাসে হইয়া থাকে; এই সময়ে হৈমন্তিক ধান কাটিয়া ঘরে তুলিতে হয়। তৃতীয় লক্ষ্মীপূজা হয় চৈত্রমাসে; এই সময়ে আশুধান্যের উপযোগী প্রথম বারিপাত হইয়া থাকে। চতুর্থ বা শেষ লক্ষ্মীপূজা ভাদ্রমাসে হয়; এই সময়ে আশু ধান্য কাটিয়া ঘরে তোলা হয়। ইহা হইতে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মীপূজা কৃষকের উৎসবমাত্র, গোড়ায় উহার সহিত ধর্ম্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

অন্য বহু উৎসব, সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্তে আয়নিক গতি ও আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি পরিণতির সহিত সংবদ্ধ—উহার অনেকগুলি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এক একটা ঘটনার স্মারকমাত্র। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে একটা সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। আমি এইবার তাঁহারই গোটাকয়েক সিদ্ধান্তের প্রতি ইঙ্গিত করিব। এ কারণ আমি তাঁহারই নিকট ঋণী। আমাদের সকল উৎসবের মধ্যে দুর্গোৎসবই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা এই ভাবে করা যাইতে পারে। ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ষের দ্বাদশ মাসকে সংক্রমণ অনুসারে আখ্যাত করা হয়। অর্থাৎ, সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে সংক্রমিত হন, সেই রাশি অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন বৈশাখ মাসে মেষরাশি, মেষরাশিস্থ ভাস্কর বলিলেই বৈশাখ মাস বুঝায়। তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি। তেমনই আবার আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয়, তখন ভাদ্রের সিংহ রাশির পর আশ্বিনের কন্যা রাশি। দুর্গা সিংহবাহিনী, কন্যা রাশি সিংহের পৃষ্ঠেই আসেন।* তবে দুর্গা কন্যা নহেন; পুরাণে তাঁহাকে বিবাহিতা দেবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; তিনি শিবানী ও গণেশজননী। কিন্তু কথা এই যে, বর্ত্তমান দুর্গোৎসবের দুর্গা-প্রতিমা কন্যার প্রতিমা না হইলেও, মূল উৎসবে যে কন্যার বা কুমারীর পূজা হইত, যুক্তির হিসাবে এটুকু বলা যাইতে পারে। এমন কি, গোড়ায় বোধ হয় কন্যা রাশিরই পূজা হইত। এ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ যে দুর্গার পূজা হইয়া থাকে, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ষোড়শী বলে। কন্যা, কুমারী, ষোড়শী এক ভাবের পরিচায়ক নহে কি? অথবা যেমন পুরাতন অপ্রচলিত মদন দেবতার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মদনোৎসবকে দোলযাত্রায় পরিণত করিয়াছেন, তেমনই ইহা সম্ভবপর যে, কন্যারাশির পূজার পরিবর্ত্তে লোকপূজ্যা দুর্গারই উৎসব এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

* আকাশে যাঁহারা সিংহ ও কন্যারাশি দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, হস্তপদবিস্তৃতা কন্যা সিংহ-পৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন।—শ

সম্ভবতঃ এইরূপে রথযাত্রা উৎসবের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই উৎসব কর্কট-সংক্রান্তির সময় হইয়া থাকে। ঠিক সংক্রান্তির দিন না হইলেও উহার কাছাকাছি একদিন হইয়া থাকে। সৌর গণনা অনুসারে ত হিন্দুর উৎসবাদির নির্দ্দেশ হয় না, উহা চান্দ্রমাসের তিথি নক্ষত্রের ব্যবস্থা অনুসারে হইয়া থাকে। এই হেতু বোধ হয় রথের তিথির একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তবে মনে হয়, গোড়ায় রথোৎসব সৌরগতি-গণনানুসারেই সংক্রান্তির দিন হইত; পরে সাধারণ নিয়ম চান্দ্রগণনা অনুসারেই উহার তিথি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। মকর রাশি ও কর্কট রাশির মধ্যে বিষুব রেখাকে দুই বার অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যে স্বীয় অয়নের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, তাহার একটু বিশিষ্টতা আছে। সূর্য্য কর্কট রাশিতে যাইয়া যেন কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তাহার পর আবার বিষুব রেখার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মকরসংক্রান্তির সময়েও ঠিক একই রকম গতি সূর্য্যের হয়। হিন্দুর পুরাণে গল্প আছে যে, সূর্য্য রথে চড়িয়া আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। এই পৌরাণিক গল্পের অনুসারে একটা রথ নির্ম্মিত হয়; সে রথকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; সেই স্থানে রথ অষ্টাহকাল অপেক্ষা করে; পরে যেখানকার রথ সেইখানেই ফিরিয়া আসে। ইহা কি সূর্য্যের গতির অভিনয় নহে? বলিতে পার, রথে ত সূর্য্য থাকেন না, জগন্নাথ বিরাজ করেন। তাহা হইলে উত্তরে বলিব, যেমন মদন ও কন্যাকে অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গা অন্য দুই উৎসবের প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তেমনই জগন্নাথ সূর্য্যকে সরাইয়া নিজেই রথে বিরাজ করিতেছেন।

এমন সংশয় করা যাইতে পারে যে, রথযাত্রার উৎপত্তির যে আনুমানিক কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা যুক্তিযুক্ত হইলে, শীতকালে মকর সংক্রান্তির সময়ে আর একটা রথযাত্রার উৎসব হইত। দ্বিতীয় রথযাত্রা না হউক, মকর-সংক্রান্তির সময় যে একটা উৎসব হয়, সে পক্ষে ত কোনও সন্দেহ নাই। এই উৎসব ঠিক সংক্রান্তির দিনই হইয়া থাকে, উহার নির্দ্দেশ সৌরগণনা-অনুসারে হয়, চান্দ্রপদ্ধতি অনুসৃত হয় না। মাসের শেষ দিনে মকর-সংক্রান্তির নির্দ্দেশ আছে বলিয়াই, বোধ হয়, উৎসবটা ঐ দিনেই নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে দিন সূর্য্য মকর-সংক্রান্তিতে আসিয়া স্পর্শ করেন, সেদিন ত পঞ্জিকার হিসাবে মকর সংক্রান্তি হয় না। হইবার কথাও নহে; কারণ, ক্রান্তিপাতে সূর্য্যের বিলোম বা পশ্চাৎ গতি আছে, সে জন্য পার্থক্য ঘটিবার কথা। পুরাকালে যখন এই উৎসব প্রচলিত হইয়াছিল, তখন হয়ত প্রকৃত সংক্রান্তি মাসের শেষ দিনেই হইত। এখন একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। প্রতি বৎসরে পৃথিবীর ৫০°/২″ বিলোম গতি হওয়াতে পনর শত শতাব্দীতে একুশ দিনের পার্থক্য হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মকর-সংক্রান্তির উৎসবটা খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। কর্কট-সংক্রান্তির সময়ে যেমন রথ প্রস্তুত হয়, মকর-সংক্রান্তির সময়ে তেমন রথ প্রস্তুত হয় না বটে, পরন্তু পরের দিনকে উত্তরায়ণের দিন বলাতে, ইহা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই উৎসব সৌর

অয়নগতি লক্ষ্য করিয়াই প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের বহুপ্রদেশে উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই উপাসনা হইয়া থাকে। মিঃ লঙ্‌ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে এক সন্দর্ভ পাঠ করেন ; উহাতে ভারতীয় নানা বিষয়ে পাঁচ শত প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্ন সকলের মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, উত্তরায়ণের দিনে কেবল সূর্য্যেরই পূজা হয় কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর কি আরও বিশদভাবে দিতে হইবে ? মকর-সংক্রান্তির উৎসব যে সৌর অয়নগতি লক্ষ্য করিয়া প্রচলিত, তাই উত্তরায়ণের দিনে সূর্য্যের পূজাই প্রশস্ত। আমার মনে হয়, এই উত্তর অন্য কোনও অনুমানের অপেক্ষা করে না।

আমি জানি যে, জেনারল কনিংহাম, তাঁহার ভিল্‌সা স্তূপের বিবরণপুস্তকে আধুনিক রথযাত্রার একটি সঙ্গত ও ইতিহাস-সম্মত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ছিল। বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনের প্রতিমা রথে বসাইযা রথ টানা হইত। বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার উৎসব ঐ কর্কট-সংক্রান্তির সম-সময়ে হইত। বোধ হয়, পরে বৌদ্ধদিগের অনুকরণে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের পরিবর্ত্তে, রথে বসাইয়া রথযাত্রার উৎসব আরম্ভ করা হয়। এমন কি, জগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আকারান্তরমাত্র, বৌদ্ধ আদর্শেই নির্ম্মিত। এই অনুমানের পোষক প্রমাণ, কনিংহাম সাহেবের পুস্তকে লিখিত আছে। তবে উহা যে অবিসংবাদিত প্রমাণ, তাহা আমি বলিতে পারি না। এমনও ত হইতে পারে যে, বৌদ্ধগণ অতি পুরাতন আদিম সৌর উৎসবকে, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ঘটনাপরিজ্ঞাপক উৎসবকে,—নিজেদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন।

এই হিসাবে রাস-যাত্রার উৎসবটা জ্যোতিষ-নির্ণায়ক উৎসব বলিয়া মনে হয়। হয় ত রাস শব্দটা 'রাশি' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, উহার অর্থ যে কি হইতে পারে তাহা আমি বলিতে পারিলাম না। তবে এই অনুমান কতকটা প্রকৃত বলিয়া মনে হয় যে, বসন্তোৎসবের—দোলযাত্রার অনুকরণে ইহা শারদোৎসব মাত্র। বসন্ত-উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয়, শরতের রাসযাত্রা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হয়। আবার বৈশাখের পূর্ণিমায় ফুলদোল, শ্রাবণের পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রা হয়। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, এই চারিটা উৎসবই প্রথমে ঋতুর উৎসবই ছিল, ধর্ম্মের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এখন কিন্তু এই চারিটিই ধর্ম্মোৎসব, এবং শ্রীকৃষ্ণই এই চারি উৎসবের অধিনেতা দেবতা। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, হিন্দুদিগের বৎসরের ছয় ঋতুর চারিটা ঋতুর চারি পূর্ণিমায় এই চারিটা উৎসব হইয়া থাকে। কেবল হেমন্ত ও শীতের দুইটা পূর্ণিমায় কোনও উৎসব নাই। ইহার হেতু বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরতের পূর্ণিমায় স্ফুটচন্দ্রিকাদীপ্ত নিশা বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম, উৎসবের ও উল্লাসের উপযোগী। এমন কি, বর্ষার গতঘনা যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রোদয় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু শীতকালে, ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের পূর্ণিমা যেন তমিস্রাসমাচ্ছন্না, যেন শীতজাড্য-

স্থবিরা, যেন হৈমস্পর্শে সদা বেপমানা, চন্দ্রের সে উল্লাস বিকাশ নাই, সে বিগলিত রজতধারাস্রাবের ন্যায় চন্দ্রিকাদীপ্তির হাস্যময়ী খেলা নাই। এমন পূর্ণিমার নিশায় উৎসব জমে না। হিন্দুগণ এই পূর্ণিমা পরিহার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-পূজাটাও, আমার মনে হয়, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ঘটনা হইতে সঞ্জাত। দেবতার নাম ও যে মাসে উহার পূজা হয়, তাহার নাম, কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে গল্প আছে যে, কার্ত্তিকেয়, উমা বা দুর্গার পুত্র বা দক্ষপুত্র। উমা বা দক্ষদুহিতা সাতাইশটা নক্ষত্রের ভগিনী। ইহা হইতে এমন অনুমান করা যায় না কি যে, অতিপূর্ব্বে—পৌরাণিক যুগেরও পূর্ব্বে—কার্ত্তিকেয় ঐ কৃত্তিকা নক্ষত্রের পুত্র ছিলেন; শেষে পৌরাণিক যুগে গল্পটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং কার্ত্তিকেয় পুরাণপ্রিয় দুর্গারই পুত্র বলিয়াই উক্ত হইলেন? এই অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথমে কার্ত্তিকোৎসব বলিলেই কৃত্তিকা নক্ষত্রের উৎসব বুঝাইত। পরে এই উৎসবে ধর্ম্মের ভাব আরোপিত হইল, উৎসবের অধিষ্ঠাতা এক দেবতা আসিলেন; কৃত্তিকাসম্বন্ধীয় দেবতা বলিয়া তাঁহার নাম হইল কার্ত্তিকেয়। ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিকেয়কে লোকে কৃত্তিকার পুত্র বলিয়া চিনিল। শেষে পুরাণের কল্যাণে কার্ত্তিকেয় উমার পুত্র হইলেন। উমা দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা সাতাইশ নক্ষত্রের ভগিনী হইলেন। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার সিদ্ধান্ত অনেকটা সুদূরপরাহত এবং এই হেতু উহা বিশেষ বিচারযোগ্য গুরুতর সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

উপরের উল্লিখিত অনুমান সকলে যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে, হিন্দুদিগের উৎসবসকলকে নিম্নোক্ত কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) সূর্য্যের আয়নিক উৎসব; যথা, রথযাত্রা ও মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি।

(২) নাক্ষত্রিক বা জ্যোতিষ্ক-ঘটনা-সঞ্জাত উৎসব, যথা, দুর্গাপূজা, কার্ত্তিকেয়-পূজা প্রভৃতি।

(৩) ঋতুজাত উৎসব; যথা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, ফুলদোল প্রভৃতি।

(৪) কৃষিকার্য্যগত উৎসব; যথা, চারিটি লক্ষ্মীপূজা। গ্রীকদিগের কীরিজ (Ceres) লক্ষ্মীর স্থানাভিষিক্ত দেবী।

(৫) পৌরাণিক উৎসব; যথা কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা প্রভৃতি। এ গুলি অতি আধুনিক।

(৬) বিভীষিকা-অপসারক উৎসব। লোকে যে সকল প্রাকৃত ঘটনায় ভীত হয়, বা আপদে সঙ্কুচিত হয়, সেই সকল আপদ বা বিভীষিকার দূরীকরণমানসে দেবতাবিশেষের পূজা করে। যথা মনসা-পূজা; ইহা সর্পভয়-নিবারণের উৎসব। শীতলা পূজা প্রভৃতি এই শ্রেণীর পূজা।

হিন্দুদিগের সকল উৎসবের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিক

ঘটনাবিশেষের স্মারক কোনও উৎসবই উহাদের নাই। যে জাতির মধ্যে ইতিহাসের চর্চ্চাই ছিল না, সে জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনামূলক উৎসবের অন্বেষণ ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র।

যাহা হউক, হিন্দুদিগের মধ্যে এমন উৎসবের প্রচলন আছে, যাহা আমার নির্দ্দিষ্ট কোনও শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যেমন দেওয়ালী উৎসব। দেওয়ালী যে ভাবে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে উহা যে একটা বিস্ময়জনক উৎসব, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। উহার বিশিষ্টতা এই যে, যে নিশায় দেওয়ালী উৎসব হয়, সেই নিশাকালে হিন্দুমাত্রই নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ্ত দীপাবলীতে সাজাইয়া থাকেন। ক্রমে নগর আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া উঠে। কেবল ইহাই নহে; এই দীপাবলীর সঙ্গে আরও একটু ব্যাপার আছে; তজ্জন্যই উহার বিশিষ্টতা, এবং তাই মনে হয় যে, কোনও এক বিশিষ্ট ঘটনা, বা উদ্দেশ্য, বা ভাব নির্দ্দেশ করিয়া এই উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব কার্ত্তিক মাসে হয়। এই মাসটা যেন আলোকমালা-বিভূষণেই উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সারা মাসটা প্রত্যেক হিন্দু-গৃহে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়; একটা উচ্চ বংশ দণ্ডের উপর আলো জ্বালাইয়া ঊর্দ্ধে ঝুলাইয়া রাখা হয়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশীতে এই মাসেই প্রত্যেক ঘাটে তীর্থে তীর্থে দীপাবলী জ্বালিয়া দেওয়া হয়। কুমারী সকল ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়; যেন মনে হয়, সংসার-প্রবাহে তাহাদের জীবন-প্রদীপ যে ভাবে ভাসিয়া যাইবে, তাহারা উহারই অভিনয় করে। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এবংবিধ আচার-ব্যবহারের মূল কোথায়, তাহার আলোচনায় আমার সমধিক আগ্রহ বোধ হয়; মনে হয়, ইহাদের মূলের অনুসন্ধিৎসা, উৎসবসকলের প্রচলনের অনুসন্ধিৎসা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক। তবে এই সকল ব্যাপারের দুই চারিটা পদ্ধতির অর্থ অনেকটা বুঝা যায়। লক্ষ্মী-পূজায় কেন ধান দিতে হয়; সরস্বতী পূজায় পুস্তক, দোয়াত, কলম, বাদ্যযন্ত্রাদি কেন রাখা হয়, তাহা আর বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। হুলীর সময়ে আবীর ব্যবহৃত হয়; বোধ হয় বসন্তের নবসঞ্জীবিত প্রকৃতির নবানুরাগপ্রফুল্ল লোহিতাভ নব কিশলয় আদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবীরের ব্যবহার হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের পর বিজয়াদশমীর দিন ভাঙ খাইতে হয়। ভাঙের অপর নাম সিদ্ধি। বিজয়াদশমীর দিনে সিদ্ধিপান করিলে সারা বছরটা সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু অন্য সকল ব্যবহার-পদ্ধতি এমনই বিস্ময়জনক যে উহাদের ব্যাখ্যা এত সহজে হয় না। কার্ত্তিক মাসে এত দীপাবলী কেন? গঙ্গা দশহরা পূজার দিনে কেন আদা কলা উচ্ছে (বীড়) না চিবাইয়া গলাধঃকৃত করিতে হয়? চুল্লীমুখে উনানের উপর মনসা-পূজা হয় কেন? পুরাণ এ সকল ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, লোকবুদ্ধিও ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে না। তাই মনে হয়, যে ভাব বা ঘটনা সম্পর্কে বা যাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সকল আচার-ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, সে ভাব, ঘটনা বা স্মরণীয় ব্যাপার

এখন পূর্ণভাবে বিস্মৃত-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

সে যাহা হউক্, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, হিন্দুদিগের অধিকাংশ উৎসব এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যবহাবপদ্ধতি, অন্ততঃ পুরাতন উৎসব সকল ও ব্যবহারপদ্ধতির মূলে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধই ছিল না। এখন যে ঐ সকল ধর্ম্মোৎসবে পরিণত হইয়াছে, সে কেবল পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগের প্রভাবেই হইয়াছে, অথবা পুরাণগত অন্ধবিশ্বাসেব হেতুই উহাদের আদিম আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিলাম। লোকসাধারণ আমার হেতুবাদ অনুসারে উৎসব সকলকে লক্ষ্য করিলে, আমার সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য হয় ত অনুধাবন করিতে পাবিবেন, এবং হয় ত তাঁহারাও আমার মতানুকূল হইতে পারেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দর্ভ পঠিত হইবার পর রেভারেণ্ড জে, লং উঠিয়া বলিলেন যে, সন্দর্ভ-লেখক অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় প্রদেশে (Tera incognita) বিচরণ করিয়াছেন। এখনও এ ব্যাপারের অনেক বিষয় আবিষ্কার করিবার আছে। তিনি যাহার ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা নুতন বিষয় এবং সম্যক্ আলোচনার যোগ্য। তবে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার বটে যে, এখন যাঁহাকে আমরা জগন্নাথ বলিয়া জানি, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উনিই বুদ্ধ ছিলেন, এবং জগন্নাথের মন্দির বৌদ্ধ-মন্দির ছিল।

মিঃ উড্‌রো (Mr. Woodrow) বলেন, আমার এই ধারণা যে, হিন্দুদিগের উৎসব সকলের ইতিহাস যদি আদিম কাল পর্যন্ত অনুসরণ করিযা দেখা যায়, তাহা হইলে, গ্রীক বা যবনদিগের উৎসব সকলের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় ত জানা যাইতে পারিবে।

মিঃ বিভার্লী (Mr. Beverley) লেখকের ভাবুকতার পর্য্যাপ্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন, লেখক দার্শনিকের সামঞ্জস্যবুদ্ধিসম্পন্ন হইযা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, হিন্দুদিগের উৎসব পূজা কেন, জাতিবিচারটাও যে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এমন বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক কারণবশতঃই এই সকল ব্যাপার উদ্ভূত; সামাজিক অভাব প্রভাবে উহাদের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে; বিশেষতঃ, জাতি-বিশেষের প্রকৃতি বা মনীষার বিশিষ্টতা হেতু সামাজিক আচার-ব্যবহার-উৎসবাদির বিশিষ্টতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধের মূল ইংরাজি যাঁহারা পড়িতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পাঠার্থে নিম্নে মূল প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল।

On the Origin of Hindu Festivals.

By

BABU BANKIM CHANDRA CHATARJI

[Read on the 20th January, 1869.]

Some attention has been paid to the subject of Hindu festi-

vals, and there is among the records of Transactions of this Assciation a paper on the nature of Hindu festivals. I wish to say a few words on their origin. It is my impression that most Hindu festivals were not in their origin at all similar to what they are now ; and if we could trace their origin in every case satisfactorily, we should have the key to interesting phenomena in the various phases of social existence which the nation has gone through. It is impossible to venture on any *general* theory regarding their origin. Particular festivals appear to have had each a particular origin, quite different in its principle from the origin of others. Again, it is by no means clear that every festival has had its origin in the earlier stages of Hindu society. Some are, doubless, very old, but others are extremely modern.

It is certain that many festivals which have now assumed the shape and adopted the symbols of the worship of particular gods, were in their origin nothing more than the celebration of the advent of particular seasons of the year or of other physical phenomena, and had *no religious element* in them at the beginning. Take the Dol Jatra, for instance. It is now in Bengal only a special mode of worshipping Krishna on a particular day. Up-country it is the *Huli*, as the word is mis-written and mis-pronounced. Originally, it was nothing but a festival in honour of spring, *Vasantotsaba*. From Vasantotsaba it degenerated into *Madanotsaba* or the festival of love, and then the religious element first crept in. It is strange that that season of the year when the fresh bursting forth of nature into new life, and into forms of pure and stainless beauty, is calculated to dispose the mind towards the highest and the calmest moods, should be set down by the poets and the people of India as peculiarly the season of love and desire. Being so set down, spring came to be indissolubly associated with love and desire, not that love which is high, holy as an abnegation of self, even when man or his companion is the object, but love which levels man to the brute. The association was so strong, that whenever a Hindu poet happens to touch on

spring, he speaks of it only in one aspect—as the season of love. Not even the highest and most cultivated minds which Puranic India ever produced were free trom this peculiarity. Even in the finest passage in all the poetical literature of India, perhaps of the East, the third canto of the Kumar Sambhava, where the poetry often rises into strains of loftiness and grandeur rarely attained, it sinks into the earth when the poet comes to describe spring. He is tender, he is touching, his exquisite and trembling sensibility reflects every shade of the new life of Nature; but the leading idea throughout the description is still that of the season of love and desire. It was natural, therefore, that the festival of spring should transform itself into the festival of love; and as love was the god Madana, the festival became one for the worship of Madana. The red powder and the squirt, which form the distinguishing features of the Huli, were also the ancient accompaniments of the Madanotsaba, and we find them all in the description of that festival given in the Ratnaboli, When Madana came to give place to Krishna, and the Madanotsaba came to be transformed into the Dol Jatra in Bengal, I am unable to say; but it was naturally to be expected that the god whose worship came to be the most popular in the country, and the memory of whose amorous achievements better fitted him to represent love and loose morals than Madana himself, should supplant the latter in popular festivals.

Take, again, the festivals in honour of Lakshmi. Lakshmi is the goddess of prosperity; but the word "Lakshmi," or "Sri," which is another name for the divinity, also means prosperity itself, or wealth. In early times, when agriculture was the only and the direct source of wealth, wealth differed little in popular idea from the produce of a good harvest. Now, we find that there are four festivals in honour of Lakshmi; or, in other words, there are four seasons during which she is worshipped. The first is in autumn, after the Durga Puja, just before the winter harvest commences. We find her next worshipped in Pous, just as the

winter crop has been, or has nearly been, gathered in. We find her again worshipped at the end of Choitra, just before the first rains are expected, and the early rice crop is about to be sown. Lastly, we find her worshipped again in Bhadra, just as the early crop has been gathered in. These facts are calculated to lead to the inference that the festivals in honour of Lakshmi were, in their origin, purely agricultural festival, and probably had then in them no religious character whatever.

Other festivals clearly have an astronomical origin, and are mere representative of celestial phenomena. I shall advert here to some ingenious hints, for which I am indebted to a paper by Babu Bhudeb Mukherjee. The most important of our festivals, that of Durga, is probably resolvable in this way. Indian astronomy or astrology gives to the twelve months of the year the names of the twelve signs of the Zodiac, and each month is named after the sign in which the sun is supposed to be during that month. Thus, Baisakh is Mesha, or the Ram ; and Jyastha is Brisha, or the Bull. Similarly, Aswin, in which this festival is held, is the Virgin *following on the back of Bhadra, the Lion.* Now the image worshipped in the Durga Puja is that of a virgin on the back of a lion. Durga is not indeed supposed to be a virgin, she is fabled as a married goddess ; the wife of Siva and the mother of Ganesa. But what may be contended for is not that the present worship is that of a virgin, but that at the original institution of the festival, the worship was that of a virgin ; in fact, of the constellation Virgo. The image actually worshipped even now is that of a *young* female, and Durga, as thereby represented, is popularly described as *sorasi*, or in her sixteenth year. Just as it is possible that the obsolete deity Madana gave place to the popular god Krishna, so it is possible that the constellation gave place to an almost equally popular deity Durga.

The origin of the festival of Rath is, perhaps, to be explained in the same way. This festival takes place about the time of

the summer solstice. It does not now fall exactly on the day on which the sun is on the solstitial point, or on any fixed solar date, but the variation must be owing to the substitution of lunar for solar dates, which is the general rule for regulating the recurrence of festivals. It is not improbable that originally the date of its celebration was regulated according to the solar calendar, though now it has been made to conform to the general rule. Now, the plain facts regarding the phenomenon of the solstice are that the sun, in its apparent annual motion, approaches a certain point in the heaven, seems stationary there for a short time, and then recedes again towards the equator. In Hindu mythology, the sun is represented as moving in the heaven in a car, or *rath*. And so his car, or *rath* is represented on earth, and made to conform to his motions in the heavens. At the same time that the sun moves in the heavens towards the solstice, stops there for a short time, and then recedes, his car on earth is in the same way made to move to a certain place, kept there for eight days, and then taken back in the same direction from which it was originally moved. It is true, Jagannath now rides the car, not the sun: But, like Madana and the Virgin, he has probably been made to give place to a more popular deity than himself.

It may be said that if there be any foundation for this theory of the origin of this festival, there ought to be found a corresponding festival in celebration of the winter solstice; and so there is the *Makar Sankranti*. This, unlike the other, is regulated by the solar, and not the lunar calendar. The reason why this festival escaped being made to conform to the general rule, probably is that it falls on the last day of a month, and is thus of a class which forms the only known exception to the general lunar rule. Even, however, with the unchanged date, it does not fall on the exact date which corresponds with the solstice. But my theory, that this is a solstitial festival, would be wrong if the two dates coincided. We must take into account the effect of

the precession of the equinoxes. If they coincided at the original institution of the festival, they cannot coincide now, for the Sankranti is a day fixed by the calendar. The difference at present is one of 21 days. At the rate of 50″, 1 for a year, nearly fifteen centuries must have elapsed since the institution of this festivals, to account for the difference. So that if you accept the supposition, this festival must have been instituted towards the latter end of the fourth century after Christ,—as probable a date as any other.

On the Makar Sankranti the sun's car is not represented on the earth, as in the festival of the summer solstice ; but one of the names given to the day succeeding the festival leaves no doubt that it is a solstitial festival. It is called the *Uttarayana Dina*, or the day on which the sun starts on his northern course. And in some places, though not in all, the sun is the only deity worshipped on the Makar Sankranti. Mr. Long, in the five hundred questions on Indian subjects, which he put in a paper read before the Royal Asiatic Society, asks "Why is the sun the only deity worshipped on that day ?" The answer is now clear ; it is because the festival is a solstitial festival. I do not think that the answer could have been given on any other supposition.

I am aware that another, and a very reasonable, account of the origin of the festival of Rath has been given by General Cunningham in his work on the Bhilsa Topes. He there traces it to a similar festival of the Buddhists, in which the three symbols of the Buddhist faith, Buddha, Dharmma, and Sangha, were drawn in a car in the same fashion, and I believe about the same season as the Rath. It is a fact greatly in support of the theory, that the images of Jagannath, Balaram, and Subhadra, which now figure in the Rath, are near copies of the representations of Buddha, Dharmma, and Sangha, and appear to have been modelled upon them. The details of the evidence in support of this supposition will be found in the work of General Cunningham, to which I have referred. That evidence is by no meams

conclusive, and it is possible that the Buddhists themselves may have transformed an astronomical commemoration into a religious one.

The name of the festival of the Rasjatra would also seem to point to an astronomical origin. The word is derived apparently from "Rasi", a sign of the Zodiac. As to what its precise meaning may be, I am unable to offer any opinion. This festival seems to be the autumnal counterpart of the vernal festival in honour of Spring, and may have had a similar origin. The vernal festival is celebrated on the day or night of the full moon of the season; the autumnal festival is also celebrated on a similar night in autumn. So there is a summer festival, the Phul-dol, celebrated on a full-moon night in summer; and there is a rainy season festival, the Jhulan, falling on a full-moon night in the rainy season. All these four festivals were probably in their origin festivals merely in honour of the respective seasons, and had no necessary connexion with religion. They are now all religious festivals in honour of Krishna. It is to be observed, also, that there are these full-moon festivals for only four of the six seasons into which Hindus divide the year. There are none for the two divisions of the cold season. The reason is obvious. A spring night, or a summer night, or an autumnal night, with a splendid full-moon lighting up the earth and heavens, is a very proper season for festivity, and such a night, even during the rainy season, may be so if the sky happens to be clear on the particular day. But a black night in December or January, with a full and chilly moon appearing to render the cold night colder, however agreeable to those accustomed to the climate of Europe, appears to have been thought by the children of the soil as little inviting to festive proceedings, and I for one should consider them wise in their opinion.

Another festival, that of Kartick, is, I am inclined to think also of astronomical origin. The name of the god, as well as the name of the month in which he is worshipped, is clearly

derived from that of a star. "Nakshatra Krittika". Kartick is fabled in the Purans as the son, born or adopted, of Uma or Durga, the sister of the twenty-seven Nakshatras. May it not be that he was probably originally fabled as the son, not of a sister of the stars, but of one of those stars themselves, that from which he derives his name ; and mythology, coming after astronomy, transferred the mothership to its favourite goddess ? If so, the process must have been something analogous to the following : Kartick must have originally signified nothing more than a festival in honour of Krittika ; then it probably led to the supposition of a god who represented Krittika in the festival as her son, and lastly Kartick came to be the son of Uma, the sister of Krittika. But I admit that the conjecture is too remote to be of any weight.

If there be any truth in the foregoing suppositions. Hindu festivals may, in regard to their origin, be classified as follows :—

1. Solstitial festivals, viz, the Rath and the Makar Sankranti.

2. Astral festivals, as the Durga Puja and the Kartick Puja.

3. Season festivals, as the Dol Jatra and the three other full-moon festivals.

4. Agricultural festivals, which are in honour of Lakhsmi, the Hindu Ceres.

5. Mythological festivals, like the Kali Puja and the Jagaddhatri, which appear to be the most modern of all.

6. Lastly, festivals which apperently owe their origin to the popular dread of some physical agent of mischief, as the *Manasa* festival, celebrated to propitiate snakes.

In the whole range of Hindu festivals, I have been unable to trace any to a historical origin. Indeed, historical festivals can scarcely be expected to be found among a nation devoid of historical associations.

There are, however, many festivals which cannot at present be attributed to any of the sources which I have enumerated—the Dewali, for instance. This festival indeed is, from its nature, one

of the most interesting. Its principal feature consists in the rows of lights with which houses are decorated on the night of its occurence; and what gives it its interest, is that accompanying circumstances seem to show that it must have had its rise in some peculiar and remarkable event or idea. Thus, we find it is celebrated in the month of Kartick, and this month is held peculiarly sacred to light. During the whole month, lights are hung up on a pole on the top of every house. During the same month, ghats are lighted up with splendid rows of lamps in Benares and other places up-country, During the same month young females light little lamps and send them floating down the stream of the river—an act which very often typifies their own journey down the stream of the world. I confess that the origin of these and other usages have for me a greater interest than the origin of the festivals themselves. Some of these usages are easily intelligible. It is easy to understand why grain should be worshipped with Lakshmi and books and musical instruments with Saraswati, the goddess of knowledge and of music. Purple powder is used in the Holi, probably because that may be supposed to be the colour of nature at the time, decorating herself with new leaves. Bhang is taken on the day after the Durga Puja, because that is supposed to be a very auspicious day, and the name of the drug—*siddhi*—signifies success, which is supposed to be imbibed with the drug for the whole year. But other usages are more curious and more difficult to understand. Why this profusion of lights in Kartick? Why are people obliged to swallow, without chewing, a bit of ginger with a bit of plantain, on the day of Dasahara? Why should Manasa be worshipped in *an oven*? Mythology throws no light on these questions; popular superstitions throw no light. They are clearly attributable to ideas and associations, which are now matter of the past.

Whatever that may be, it is my belief that most of the festivals and usages connected with them, at all events all the older festivals, had in their origin no necessary connection with

religion and their present religious character is owing to the later Pauranic superstition. I leave it to the public to estimate the effect which would be produced on their observance, if this truth, if such it is, could be clearly established to the conviction of those who observe them.

The Rev. J. Long ventured to believe that the writer (Bankim Babu) had entered what he might term a *terra incognita* and that much still remained to be explored in the same derection. The problem which he had attempted to solve was a new one, and was particularly interesting in regard to the worship of Jagannath, which was, only a few centuries back, a Buddhist temple.

Mr. Woodrow was of opinion that if the origin of Hindu festivals was traced sufficiently far back, they would possibly be found to be closely connected with the Greek festivals.

Mr. Beverley approved the philosophical spirit in which the writer had treated his subject. It was impossible to believe that either the Hindu festivals or the distinctions of caste were founded originally upon religious enactments. Such institutions, he believed, generally derived their origin from perfectly natural causes, arising out of the social economy and the genius of the particular people among whom they were found to exist.

The President expressed the thanks of the Association for the valuable material which the lecturer had placed before the meeting. He remarked that the religious customs of a people were characteristic anywhere, but in this country there were specialities attending the social life of the Hindus which could only be traced through their religious ceremonies. It was to be hoped that the writer would prosecute his investigations still further.